সাফল্যের চাবিকাঠি

কোয়ান্টাম মেথড

মহাজাতক

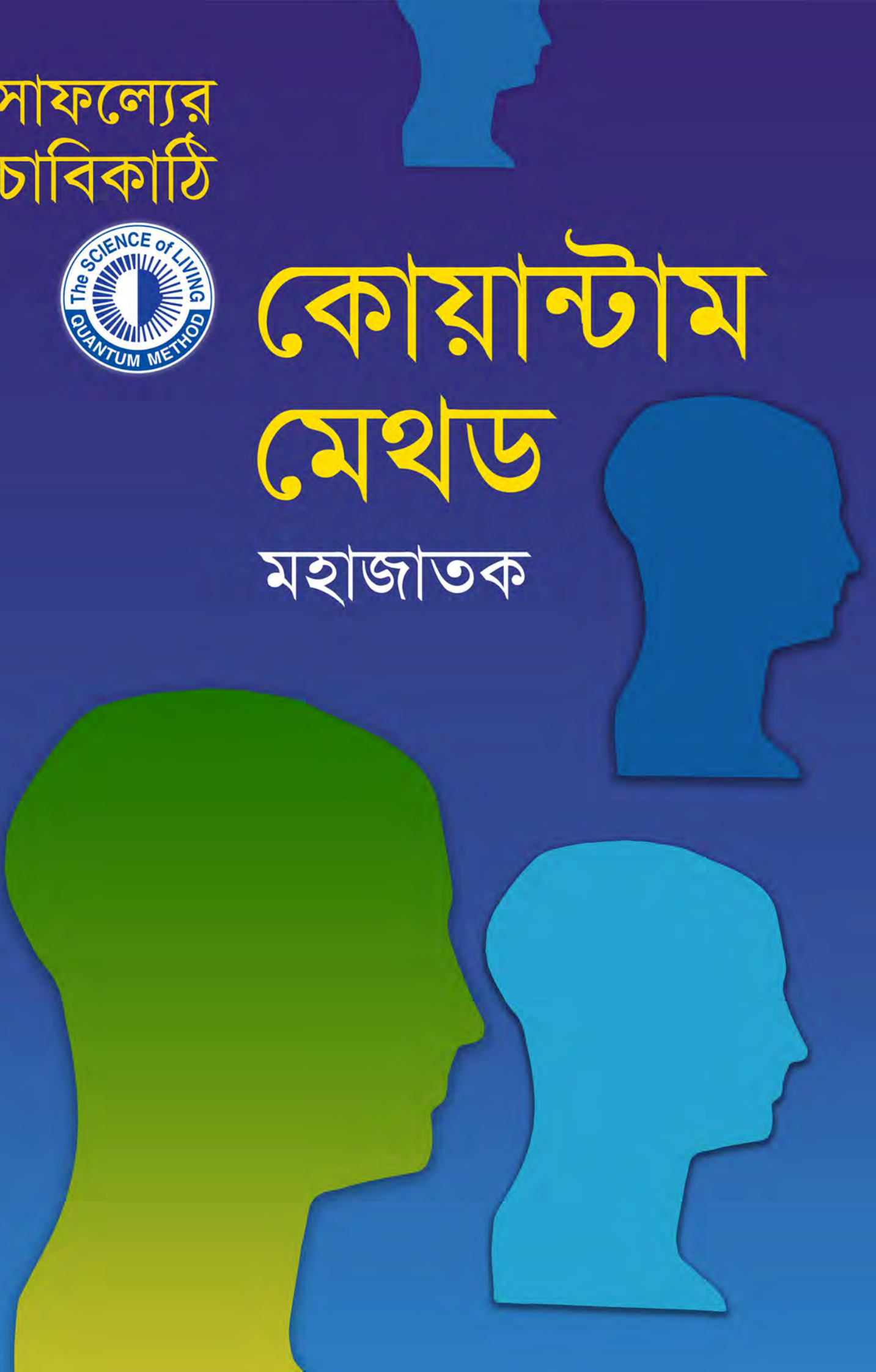

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

সাফল্যের চাবিকাঠি

কোয়ান্টাম মেথড

মহাজাতক

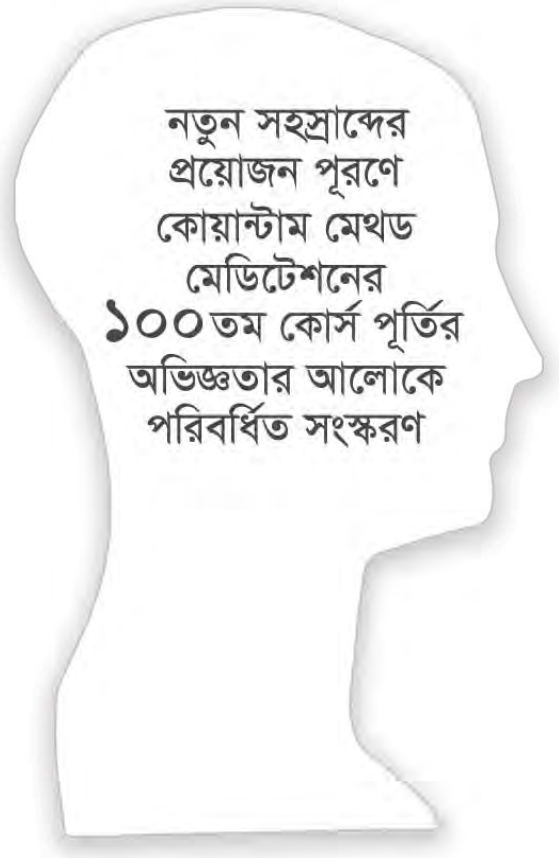

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/ ৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের
প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৩
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৩
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী : শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং : বি এম আসাদ
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/ ৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : +৮৮০-২-৮৩১৪১৮৪
মোবাইল : +৮৮০-১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochaonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/ ৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/ ১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : +৮৮০-১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/ ২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : +৮৮০-১৭১৮-১৯০২০৩
QUANTUM METHOD
By : Mahajataq
ISBN-984-462-907-1
মূল্য : তিনশত দশ টাকা

শ্রদ্ধেয় গুরু প্রফেসর এম ইউ আহমেদ

যিনি প্রথম আশ্রম ও খানকার

চৌহদ্দি থেকে বের করে ধ্যানকে গণমানুষের

আত্ম উন্নয়ন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রয়োগ

করেছেন

ও

মহাজাগতিক সফরসঙ্গী নাহার-কে

যার এক যুগের স্বপ্ন, ত্যাগ ও

অনুপ্রেরণার ফসল এ বই

সূচিপত্র

মেডিটেশন : শৃঙ্খল মুক্তির পথ -৫

যাত্রা হোক শুরু -৯

নতুন বিশ্বদৃষ্টি -১১

১. মন : শক্তি রহস্য -১৫

২. চাবিকাঠি : বিশ্বাস -২০

৩. ব্রেন : বিস্ময়কর জৈব কম্পিউটার -২৬

৪. নেপথ্যনায়ক -৪৭

৫. ধ্যানাবস্থা : প্রথম পদক্ষেপ -৬১

৬. শিথিলায়ন : মনের বাড়ি -৬৮

৭. আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম - ১ : মনের বিষ -৮১

৮. আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম - ২ : মনের বাঘ -৯৪

৯. আত্মবিকাশী প্রোগ্রাম - ১ : অটোসাজেশন ও প্রত্যয়ন -১১১

১০. আত্মবিকাশী প্রোগ্রাম - ২ : মনছবি -১২৭

১১. কল্পনা : মনের চালিকা শক্তি -১৪৩

১২. মনোযোগ : মনের বল -১৫২

১৩. মনে রাখার কৌশল -১৬৩

১৪. কোয়ান্টা সংকেত -১৭৭

১৫. জাগৃতি ও ঘুম -১৮৬

১৬. স্বপ্ন : সৃজনশীল প্রয়োগ -১৯৩

১৭. ছাত্র জীবনে সাফল্য লাভ -১৯৭

১৮. কোয়ান্টাম নিরাময় -২০৪

১৯. মেদ ভুঁড়ি : ওজন নিয়ন্ত্রন -২২৭

২০. ধূমপান ও ড্রাগ বর্জন -২৩১

২১. সুস্বাস্থ্যের কোয়ান্টাম ভিত্তি -২৩৫

২২. নতুন জীবনের পথে -২৩৯

অতিচেতনার পথে -২৪৩

২৩. ডান ও বাম বলয়ের সমন্বয় -২৪৪

২৪. প্রকৃতির সাথে একাত্ম হোন -২৫১

২৫. কমান্ড সেন্টার : কল্যাণ প্রক্রিয়া -২৫৭

২৬. অন্তর্গুরু -২৭২

২৭. প্রজ্ঞা -২৭৬

হে অনন্য মানুষ ! আপনাকে অভিনন্দন -২৮২

মেডিটেশন : শৃঙ্খল মুক্তির পথ

মানুষের অসীম শক্তি ও সম্ভাবনাকে সবসময় শৃঙ্খলিত ও পঙ্গু করে রাখে সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে প্রচলিত ধারণার শৃঙ্খলে সে ক্রমান্বয়ে বন্দি হয়ে পড়ে। পরিবেশ যা তাকে ভাবতে শেখায় সে তা-ই ভাবে, যা করতে বলে তা-ই করে। যে হতে পারত যুগস্রষ্টা বিজ্ঞানী, হতে পারত শতাব্দীর অভিযাত্রী, অমর কথাশিল্পী, হতে পারত মহান নেতা বা বিপ্লবী, হতে পারত আত্মজয়ী বীর বা ধর্মবেত্তা, সেই মানবশিশুই ভ্রান্ত ধারণার বন্দি হয়ে পরিণত হচ্ছে কর্মবিমুখ, হতাশ, ব্যর্থ কাপুরুষে। এ ব্যর্থতার কারণ মেধা বা সামর্থ্যের অভাব নয়, এ ব্যর্থতার কারণ বস্তুগত জিঞ্জির নয়, এ ব্যর্থতার কারণ মনোজাগতিক শিকল।

প্রতিটি মানবশিশু সুপ্ত মহামানবরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু কায়েমি স্বার্থ সৃষ্ট মনোজাগতিক জিঞ্জির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে তাকে পরিণত করে এক অসহায় নিরুপায় প্রাণিতে। সার্কাসের হাতির জীবনের দিকে তাকালে এই মনোজাগতিক দাসত্বের বিষয়টি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।

জঙ্গল থেকে দুরন্ত প্রাণচঞ্চল হস্তি শাবককে ধরে এনে ছয় ফুট লোহার শিকল দিয়ে শক্ত পাটাতনের সাথে বেঁধে রাখা হয়। প্রথমদিকে হস্তিশিশু শিকল ছেঁড়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। কিন্তু এত ছোট শরীর দিয়ে সে জিঞ্জির ভাঙতে পারে না। উল্টো তার পা-ই রক্তাক্ত হয়ে যায়। ফলে একসময় এই গণ্ডি ও বন্দিত্বের কাছে হস্তি শিশু আত্মসমর্পণ করে। এভাবে তার মধ্যে তৈরি হয় সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে এই গণ্ডি, এই জিঞ্জির থেকে তার মুক্তি নেই। এটাই তার নিয়তি।

হস্তিশিশু বিশালদেহী পূর্ণাঙ্গ হাতিতে পরিণত হওয়ার পরও শিকল দিয়ে তাকে ছাগল বাঁধার খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেও সে ছয় ফুট বৃত্তকেই তার পৃথিবী ধরে নেয়। যখনই শিকলে টান পড়ে তখনই সে তার বৃত্তের আরো ভেতরে প্রবেশ করে। ভ্রান্ত বিশ্বাস তাকে বলে এর চেয়ে আর এগুনোর সাধ্য তোমার নেই। এমনকি দেখা গেছে, সার্কাস মেলায় আগুন লাগলেও হাতি তার শিকল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে না। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কারণ ভ্রান্ত বিশ্বাস তাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে রাখে। যখন তার দেহের শক্তি দিয়ে এক টানে খুঁটিসহ সবকিছু উপড়ে ফেলতে পারে, তখনো সে ভাবে এই ছয় ফুট বৃত্তই আমার নিয়তি। তার এই শৃঙ্খল লোহার শিকলের নয়, খুঁটির নয়। এ শৃঙ্খল হচ্ছে মনের। আমাদের অবস্থাও এখন তা-ই। আমাদের প্রতিটি মানুষের প্রতিটি পরিবারের পুরো জাতির বিপুল সম্ভাবনা, শক্তি ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস, শোষক ও পরাভববাদীদের আরোপিত মিথ্যা ধারণার শৃঙ্খলে আমরা নিজেদেরকে গণ্ডিবদ্ধ ও বন্দি করে ফেলেছি। দুর্দশাগ্রস্ত ও গ্লানিকর জীবনকেই আমরা আমাদের নিয়তি ও

ভাগ্যরূপে মেনে নিচ্ছি। সার্কাসের হাতির মতোই পুড়ে মরে গেলেও শিকল ভাঙার কোনো চেষ্টা করছি না। কিন্তু শুধুমাত্র একবার এই সংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা ঝেড়ে ফেলে দিলে দেখতে পাব আমরা প্রত্যেকে এক বিপুল শক্তির আধার।

এই ভ্রান্ত ধারণার শিকল ভেঙে মুক্ত বিশ্বাসে উপনীত হওয়াটাই হচ্ছে মানুষের আসল স্বাধীনতা। কারণ মুক্ত বিশ্বাস হচ্ছে সকল সাফল্য, সকল অর্জনের ভিত্তি। বিশ্বাসই রোগ নিরাময় করে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে আর অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করে। বিশ্বাসই মেধাকে বিকশিত করে, যোগ্যতাকে কাজে লাগায়, দক্ষতা সৃষ্টি করে।

মুক্ত বিশ্বাস থেকেই শুরু হয় মানুষের মানবিকতার উত্থান পর্ব। তখনই সে বুঝতে পারে, সে সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মখলুকাত। নিজের অসীম শক্তি ও সম্ভাবনাকে বুঝতে পারে। লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি, কাপুরুষতা ও প্রবৃত্তির শৃঙ্খল যে অনন্য মানবসত্তাকে বন্দি করে রেখেছে, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার শক্তি তার মধ্যে জন্ম নেয়। সে মুক্তি পায় প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি থেকে। মুক্ত বিশ্বাস প্রতিটি কাজে চিত্তকে করে একাত্ম। আর কাজের সাথে একাত্ম হতে পারলে প্রতিটি কাজ হয়ে ওঠে আনন্দের উৎস।

দৈনন্দিন জীবন বেশিরভাগ চিন্তাশীল মানুষের জন্যেই যুগে যুগে ছিল এক ক্লান্তিকর বিড়ম্বনা। এ ক্লান্তিকর বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির পথ সচেতন মানুষ সবসময়ই খুঁজেছে। এক শিষ্য গুরুর কাছে বললেন, এই ভাত খাওয়া, গোসল করা, কাপড় পরা, সংসার করা, প্রার্থনা করা-এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি চাই।

গুরু বললেন, ভাত খাও, গোসল কর, কাপড় পর, সংসার কর, প্রার্থনা কর।
কিছুদিন পর শিষ্য আবার আর্তি জানালেন।
গুরুরও সেই একই জবাব। একই নির্দেশ।

গুরুবাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে শিষ্যের লেগেছিল একযুগ। একযুগ পরে তিনি বুঝেছিলেন, যান্ত্রিকতার স্বয়ংচালিত ক্রিয়ার মতো কাজ করে যাওয়ার ফলেই প্রাত্যহিক কাজে একঘেয়েমি চলে আসে। বেশিরভাগ সময়ই মন অতীতে বা ভবিষ্যতে বিচরণ করে বলেই আমরা বর্তমানকে পুরোপুরি উপভোগ করতে ব্যর্থ হই। বর্তমান হয়ে ওঠে একঘেয়ে। দিনের প্রতিটি কাজের সাথে চিত্তকে একাত্ম করতে পারলে, প্রতিটি কাজের মাঝে আত্মনিমগ্ন হতে পারলে, মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারলেই যান্ত্রিকতার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রতিটি কাজই হয়ে ওঠে আনন্দের উৎস। তখন প্রতিদিনের প্রতি লোকমা আহার, প্রতিবারের গোসল, প্রত্যেক কাপড়, স্ত্রীর সাথে আলাপন, দৈনন্দিন কর্তব্য ও দায়িত্ব- অর্থাৎ প্রতিটি কাজই মনে হবে এ এক নতুন জগৎ, এ এক নতুন জীবন, এ

এক নতুন আনন্দলোক। তখন প্রতিবারের প্রার্থনাতেই আপনি পুলকিত হবেন, চমকিত হবেন, স্রষ্টাকে উপলব্ধি

করবেন নিত্য নব মহিমায়। প্রতিটি চাওয়া পরিণত হবে পাওয়ায়। প্রতিটি সেজদা পরিণত হবে মেরাজে।

ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খল মুক্তির পথ হচ্ছে মেডিটেশন। দৈনন্দিন কাজের একঘেয়েমিকে নতুন আনন্দলোকে রূপান্তরিত করার পথও মেডিটেশন। কারণ মেডিটেশন আপনার মনকে বর্তমানে নিয়ে আসে। মেডিটেশন অতীতের ব্যর্থতার গ্লানি আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা থেকে মনকে মুক্ত করে। বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তে সংযোজন করে নব নব মহিমা। প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্লোকে মনকে প্রবেশ করায়। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ সচরাচর বিষয়কেও নতুন পর্যবেক্ষণী আলোয় নতুন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর করে তোলে। মেডিটেশন আপনাকে আত্মনিমগ্ন করে। অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করে নতুন জ্ঞান আর উপলব্ধিতে। মেডিটেশনের মাধ্যমেই আপনি সংযোগ সাধন করতে পারেন আপনার 'অন্তরের আমি'র সাথে, আপনার শক্তির মূল উৎসের সাথে। এই আত্মশক্তির আবিষ্কার ও আত্ম অনুভব এমন এক মুক্ত বিশ্বাস-যা আপনাকে সকল শিকল থেকে মুক্ত করবে, দৈনন্দিন একঘেয়েমি রূপান্তরিত হবে আনন্দে।

মেডিটেশনের পথ ধরেই আপনি অতিক্রম করবেন আপনার জৈবিক অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা। আপনার উত্তরণ ঘটবে অনন্য মানুষে। আপনি পাবেন আপনার প্রথম ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

নতুন সহস্রাব্দের প্রয়োজনকে সামনে রেখে কোয়ান্টাম মেথড বইয়ের পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে সক্ষম হওয়ায় আমরা পরম করুণাময়ের কাছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সের একশত ক্লাসে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, হাজার হাজার কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের অনুভূতি এবং অসংখ্য পাঠকের অজস্র প্রশ্নের প্রেক্ষিতে পুরো বইটিকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে, নতুন অধ্যায় যোগ করা হয়েছে, পুরনো অধ্যায়গুলোকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি কোয়ান্টাম মেথডের বর্তমান সংস্করণ থেকে নতুন প্রজন্ম আরো সহজে আত্মনির্মাণের প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে নিজের মেধা ও সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করতে পারবেন, তাদের জীবনে সাফল্য আসবে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়। কল্যাণ ও প্রশান্তিতে ভরে উঠুক সবার জীবন।

মহাজাতক

১ জানুয়ারি ২০০০ সাল

যাত্রা হোক শুরু

সবকিছুই পরিবর্তনশীল। আনন্দ-দুঃখ, হাসি-কান্না পার্থিব কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। আপনার আজকের সাফল্য বা ব্যর্থতা তা-ও স্থায়ী নয়। কারণ সময় এগিয়ে চলে। সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই পরিবর্তিত হয়। তবে এ পরিবর্তন ভালোর দিকে যাবে, না মন্দের দিকে যাবে, তা নির্ভর করবে আপনার ওপর। কারণ আপনি যদি বর্তমানে সমস্যা ভারাক্রান্ত বা ব্যর্থ বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তার কারণ হচ্ছে অতীতে আপনার মনের অবচেতনে প্রদত্ত ভুল প্রোগ্রামিং। এ প্রোগ্রামিং আপনার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে-কোনোভাবেই হতে পারে। অবশ্য এজন্যে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। দার্শনিক কনফুসিয়াস খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, 'ব্যর্থতার মাঝেই সুপ্ত থাকে সাফল্যের বীজ'। আপনি সাফল্যের এই বীজকে লালন করুন। মনের অবচেতনের তথ্যভাণ্ডারকে পুনর্বিন্যস্ত করুন। মন আলাদিনের জাদুর চেরাগের মতোই আপনাকে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে নিয়ে যাবে।

শুধু সাফল্যের পথে নয়, যে-কোনো পথেই যাত্রা শুরু হয় একটি ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে। হাজার মাইল ভ্রমণের সূচনাও হয় প্রথম পা ফেলার মধ্য দিয়ে। এ বই হাতে নিয়ে আপনি সাফল্যের পথে প্রথম পা দিয়েছেন। আপনি মনোযোগ দিয়ে এক থেকে ২২ অধ্যায় পর্যন্ত একবার পড়ে যান। বইয়ের বাকি পাঁচটি অধ্যায় পড়বেন প্রথম ২১টি অধ্যায়ের অনুশীলনী রপ্ত হওয়ার পর। বইটিকে আপনি দুভাগে ভাগ করে নিতে পারেন। একভাগ হচ্ছে তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর অপর ভাগ হচ্ছে অনুশীলনী। তাত্ত্বিক আলোচনা অবশ্যই আপনাকে আনন্দ দেবে। কিন্তু অনুশীলনীগুলো দেবে প্রত্যক্ষ ফল। তাই আলোচনা পড়ার চেয়ে, আলোচনা বোঝার চেয়ে অনুশীলনীর একাগ্র অনুশীলন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারো কাছে আলোচনা একটু জটিল মনে হলে, বোঝার প্রচেষ্টা পরবর্তী সময়ের জন্যে রেখে দিয়ে বর্তমানে অনুশীলনীর অনুশীলনে মনঃপ্রাণ সঁপে দিন। ফলাফল একই হবে। একটি ছোট্ট উদাহরণ এক্ষেত্রে আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্যে যথেষ্ট। যেমন বৈদ্যুতিক আলো। বাতি জ্বালিয়ে বৈদ্যুতিক আলো উপভোগের জন্যে বিদ্যুৎ কোন পাওয়ার হাউজে উৎপন্ন হচ্ছে, কোন ট্রান্সমিশন লাইন

আলোময় করে দেখতে পারেন, তেমনি যিনি এসব কিছুই জানেন না, শুধু সুইচ অন/ অফ করতে জানেন, তিনিও একইভাবে ঘর আলোকিত করতে পারেন। আলো অর্থাৎ ফল পাওয়ার জন্যে সুইচ অন/ অফ করতে জানা অর্থাৎ অনুশীলনীর অনুশীলনই যথেষ্ট।

প্রথম ২১ অধ্যায় একবার পড়ার পর আপনি ২২ নম্বর অধ্যায়ের নির্দেশাবলী ভালোভাবে পড়ুন। নির্দেশাবলী অনুধাবন করুন এবং তা অনুসরণ করতে সচেষ্ট হোন। শুরু করুন শিথিলায়ন চর্চা। নিয়মিত চর্চা অব্যাহত রাখুন। শিথিলায়ন পুরোপুরি আয়ত্ত হলেই আপনি মনের শক্তি বলয় নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হাতে পাবেন। এ চাবিকাঠির অপর নাম হচ্ছে মনের ধ্যানাবস্থা। ধ্যানাবস্থায় মন হয় ত্রিকালদর্শী, চেতনা অতিক্রম করে সকল বস্তুগত সীমা। মনের এই ধ্যানাবস্থার শক্তিকে প্রয়োগ করেই প্রাচ্যের সাধক-দরবেশ-ঋষিরা একদিন আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। ইচ্ছা করেছেন-ঘটনা ঘটেছে। ইচ্ছা করেছেন-মানুষ রোগমুক্ত হয়েছে। ইচ্ছা করেছেন-বিপদ কেটে গেছে। ইচ্ছা করেছেন-সুযোগ এসেছে, সাফল্য এসেছে। আপনিও এই চাবিকাঠিকে কাজে লাগিয়ে সকল স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতা ও স্বসৃষ্ট ব্যর্থতাকে (আপনার সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা মূলত স্ব-আরোপিত ও স্বসৃষ্ট) নিজেই অতিক্রম করবেন। ধাপে ধাপে একের পর এক অনুশীলনী অনুশীলন করে প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাবেন বৈষয়িক সাফল্যের পথে, সুস্বাস্থ্য ও রোগমুক্ত জীবনের পথে, আত্মোপলব্ধির পথে। অর্জন করবেন অতিচেতনা। নিজের ব্রেনের ডান ও বাম বলয়কে বেশি পরিমাণে এবং সমন্বিতভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। অচেতন ও অবচেতনের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগের মাধ্যমে লাভ করবেন প্রজ্ঞা। এই চাবিকাঠি দিয়েই দৃশ্যমান সবকিছুর পেছনে প্রকৃতির যে নেপথ্য স্পন্দন ও নিয়ম কাজ করছে তার সবটাকেই আপনি নিজের ও মানবতার কল্যাণে সক্রিয় করে তুলতে পারবেন।

এবার তাহলে সাফল্যের পথে, আত্ম অনুভবের পথে, মহামানবে উত্তরণের পথে আপনার যাত্রা শুরু করুন। ধাপে ধাপে পায়ে পায়ে এগিয়ে যান মহিমান্বিত জীবনের পথে।

নতুন বিশ্বদৃষ্টি

কোয়ান্টাম ফিজিক্স, নিউরো-সায়েন্স এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ শতকে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের বিশ্বদৃষ্টিকেই পাল্টে দিয়েছে। যে বিজ্ঞান ছিল দীর্ঘদিন বস্তু কেন্দ্রিক, নিউটনিয়ান মেকানিক্সের নিগড়ে বন্দি, সে বিজ্ঞানই এখন হয়ে পড়েছে চেতনা নির্ভর। পাশ্চাত্যের পদার্থবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এখন এসে একাত্ম হয়েছে প্রাচ্যের সাধকদের বিশ্বদৃষ্টির সাথে, মনকেন্দ্রিক বিশ্বদর্শনের সাথে।

বিজ্ঞানী নিউটন এবং ম্যাক্সওয়েলের সূত্র অনুসরণ করে পদার্থবিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক সুশৃঙ্খল বিশ্বদৃষ্টি উপস্থাপন করে। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সবকিছুই এক নিয়মের অধীন, সেখানে বিজ্ঞানীর কোনো ভূমিকা নেই। বিজ্ঞানী সেখানে একজন দর্শক মাত্র। আর পুরো প্রক্রিয়া হচ্ছে দর্শক-মন নিরপেক্ষ। এই বিশ্বদৃষ্টিতে প্রথম ফাটল ধরান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে তার বিখ্যাত 'থিউরি অব রিলেটিভিটি' উপস্থাপন করে। এই নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে বস্তুগত বাস্তবতা প্রতিষ্ঠায় দর্শকের আগমন ঘটে। বস্তুগত প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণকারী বিজ্ঞানীও এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারীতে পরিণত হন।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উদ্ভব ঘটার সাথে সাথে দর্শকের ভূমিকা বস্তুগত ঘটনা বা মতবাদের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তুগত মতবাদ কাঠামোয় বা যে-কোনো বিষয় ব্যাখ্যায় দর্শকের মন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এই আমূল পরিবর্তন কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানীদের বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে এবং তারা মানব-মন ও দর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়নে নিমগ্ন হন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনো যুগেই নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা এত বিপুল সংখ্যায় তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের দার্শনিক ও মানবিক মূল্যায়ন করে নিবন্ধ বা পুস্তক রচনা করেন নি।

কোয়ান্টাম ফিজিক্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ওয়ার্নার হেইজেনবার্গ তার 'Philosophical Problems of Quantum Physics'-এ লেখেন যে, প্রকৃতির নিয়ম সংক্রান্ত গবেষণা এখন আর শুধু মৌল কণাসমূহ নিয়ে আলোচনা করে না। এখন তা আলোচনা করে এই কণাসমূহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিয়ে অর্থাৎ আমাদের মনের বিষয়বস্তু নিয়ে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মূল সমীকরণ প্রস্তুতকারী বিজ্ঞানী এরউইন শ্রডিঙ্গার ১৯৫৮ সালে 'Mind and Matter' নামে এক অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিজ্ঞানের এই নতুন তত্ত্বের আলোকে দার্শনিক অলডাস হাক্সলির আত্মিক বিশ্বদর্শনের সাথে নিজেকে একাত্ম করেন। কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রডিঙ্গারই প্রথম প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে

সমমর্মিতা প্রকাশ করেন। এরপর থেকে আধুনিক বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে পাশ্চাত্যে দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ হচ্ছে, ফ্রিটজফ কাপরা-এর 'The Tao of Physics' এবং গ্যারি জুকাভ-এর 'The Dancing Wu Li Masters'.

ডারউইনের পর থেকে মানবীয় আচরণকে একটা জৈবিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রচুর চেষ্টা করা হয়েছে। আবার জৈবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে শুধুমাত্র শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম হিসেবে। এদের বক্তব্যকে কার্ল সেগান 'The Dragons of Eden'-এ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, 'আমরা যাকে কখনো কখনো মন বলি তা হচ্ছে ব্রেন। আর এই ব্রেনের কার্যক্রম এর অঙ্গ ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমের ফলাফল ছাড়া কিছুই নয়। এখানে মন বলে কিছু নেই।' আর মলিকুলার বায়োলজিস্ট ফ্রান্সিস ক্রিক তার বই 'Of Molecules and Men'-এ লিখেছেন, 'সকল প্রাণিবিদ্যাকে অবশ্যই পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন দিয়েই ব্যাখ্যা করতে হবে।'

জীবন, প্রাণ, মনকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, মন থেকে শুরু করে আবার মনেই ফিরে আসতে হয়। যেমন প্রথমত ধরুন, চিন্তা ও চেতনাসহ মানব-মনকে কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের তৎপরতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যাকে আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সকল স্তরের জৈবিক কর্মকাণ্ড পরমাণু বিজ্ঞানের আলোকে পুরোপুরি বোঝা যেতে পারে। কারণ প্রতিটি জৈবিক কার্যক্রম কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদির পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সর্বশেষে, পরমাণু বিজ্ঞানকে পুরোপুরি বুঝতে হলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর মাধ্যমে বুঝতে হবে। আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর সাথে মন হচ্ছে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দর্শক মনের ভিত্তি ছাড়া কোয়ান্টাম প্রক্রিয়াই হচ্ছে অসম্পূর্ণ।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. সৈয়দ সফিউল্লাহ তার 'অস্তিত্বের অতলান্তে' গ্রন্থে কোয়ান্টাম সূত্র প্রসঙ্গে সাব-এটমিক পার্টিকেলের স্পিন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'পারমাণবিক কিংবা অব-পারমাণবিক পর্যায় অবশ্য চক্ষুষ্মান জগতের স্পিনের সাথে তুলনা করলে বিপাকে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিশেষ করে নিজ অক্ষের চারপাশে আবর্তনের কথা উঠলেই দিক-নির্দেশনার কথা ওঠে। মনে আসে একটা রেফারেন্স অক্ষের। ইলেক্ট্রন স্পিনের দিক নির্ণয়ের জন্যে বিদ্যুৎ কিংবা চুম্বকীয় ফিল্ডকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই, রেফারেন্স ফিল্ডকে যেদিকেই

বসাই না কেন ইলেক্ট্রন স্পিন ঠিক ঠিক রেফারেন্স ফিল্ডের সাথে অ্যালাইন্ড হবে অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থান করবে। ব্যাপারটা যেন খানিকটা এমন যে, ইলেক্ট্রন যেন আগে থেকেই বুঝতে পারছে নিরীক্ষণকারী কীভাবে তার নিয়ম তৈরি করতে যাচ্ছেন। আরেকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, নিরীক্ষণকারীর মনই ঠিক করছে নিরীক্ষণের ফলাফল কী হবে। এক্ষেত্রে জড়বস্তুর ওপর মানব-মনের কর্তৃত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ তো গেল স্পিন সম্পর্কে বিশ্বজনীন অনিশ্চয়তার একটা গুরুত্বপূর্ণ গভীর দিক। আরেকদিকে দেখা যায় সাব-পারমাণবিক জগতে স্পিন একটি ধ্রুব বাস্তবতা। এই স্পিনের কারণেই পরমাণুদের মৌলগত ভিত্তিতে এত সমাহার, রাসায়নিক বন্ধনের অন্যতম উৎসের উদ্বোধন এবং তার থেকে জীবনের উৎসব।'

মনের বস্তুকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সম্পর্কে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নিউরোসায়েন্টিস্ট স্যার জন একলস-এর বক্তব্যও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। নিউরোসায়েন্স বিকশিত হয়েছে গত ৩০ বছরে। গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য মানব মস্তিষ্ক বা ব্রেন। ব্রেনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিজ্ঞান অনেক কিছুই জেনেছে। তারপরও ব্রেন সম্পর্কিত জ্ঞান এখনো রয়েছে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। বিজ্ঞানী একলস প্যারাসাইকোলজিস্টদের সম্মেলনে মন বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আমরা যখন চিন্তা করি, তখন প্রতিটি চিন্তার সাথে সাথে ব্রেন নিউরোনে অবস্থিত কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু স্থান পরিবর্তন করে। কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদির পরমাণু হচ্ছে বস্তু আর চিন্তা হচ্ছে বস্তুর অস্তিত্ব বিবর্জিত।'

বিশ্বদৃষ্টি পরিবর্তনে বিজ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এই বিজ্ঞানের মূলকথা হচ্ছে, জীবকোষের মূলকেন্দ্র ডিএনএ-আরএনএ। সেখানে সংরক্ষিত তথ্যভাণ্ডার দ্বারাই সকল প্রাণ বিকশিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আর এই তথ্যভাণ্ডারে পরিবর্তন আনয়ন করে প্রাণের বিকাশকে প্রভাবিত করা যায়। এই বাস্তবতা বস্তুর ওপর চেতনা ও তথ্যের কর্তৃত্বকেই নতুন সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

মন ও চেতনার ক্ষমতা সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির সার-সংক্ষেপ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ইউজিন উইগনার তার 'Remarks on the Mind-Body Question' নিবন্ধে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, অধিকাংশ পদার্থ বিজ্ঞানীই এই সত্যকে মেনে নিয়েছেন যে, চিন্তা অর্থাৎ মনই হচ্ছে মূল। 'চেতনার উল্লেখ ছাড়া কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর নিয়মকে পুরোপুরি

সঙ্গতিপূর্ণভাবে গঠন করা সম্ভব নয়।' (It is not possible to formulate the laws of Quantum mechanics in a fully consistent way without reference to the consciousness.) নিবন্ধের উপসংহারে বিজ্ঞানী উইগনার বলেছেন, 'বিশ্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণা শেষ পর্যন্ত চেতনাকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।' (Scientific study of the world led to the content of consciousness as an ultimate reality.) আর এভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ এসে একাত্ম হয়েছে প্রাচ্যের প্রাচীন সাধকদের মনকেন্দ্রিক বিশ্বদর্শনের সাথে। আর আধুনিক মানুষ নতুনভাবে ব্রতী হয়েছে চেতনার শক্তিকে, মনের অসীম ক্ষমতাকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারের। কোয়ান্টাম মেথড মনের এই অসীম শক্তিকে ব্যবহারের সবচেয়ে সহজ ও ফলপ্রসূ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

অধ্যায়-১

মন : শক্তিরহস্য

মন কী? মনের শক্তির উৎস কোথায়? এককথায় এর জবাব দেয়া মুশকিল। কারণ মনকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী মনকে ধরতে বা ছুঁতে পারেন নি বা কোনো ল্যাবরেটরিতে টেস্ট টিউবে ভরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারেন নি। তবে মনের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আদি যুগের সাধকরা যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরাও সচেতন। হাজার বছরের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হলো, মন মানুষের সকল শক্তির উৎস। মনের এই শক্তিরহস্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই এই শক্তিকে আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারব।

মনের শক্তিরহস্য উন্মোচনের আগে মানুষ সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা একবার পর্যালোচনা করা দরকার। একসময় বিজ্ঞান মনে করত মানুষ হচ্ছে বস্তুর সমষ্টি যা কোনো না কোনোভাবে চিন্তা করতে শিখেছে। আর এখন বিজ্ঞান মনে করে মানুষ চেতনা বা তথ্যের সমষ্টি যাকে কেন্দ্র করে দেহ গঠিত হয়েছে। মানুষ সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারণা পরিবর্তনের মূলে রয়েছে জেনেটিক গবেষণায় অভাবনীয় অগ্রগতি। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণীর বিকাশের মূল নিহিত রয়েছে জেনেটিক কোড তথা ডিএনএ-তে (ডিএনএ=ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)। প্রতিটি জীবকোষের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই ডিএনএ। প্রাণের বিকাশ কীভাবে ঘটবে তার সবটাই লিপিবদ্ধ আছে এই ডিএনএ-তে। গাছপালা, পশু-পাখি, ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস, সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ডিএনএ। মানবদেহের বিকাশের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, মাতৃগর্ভে একটি ডিম্ব এবং একটি শুক্রকীটের মিলনের পর ডিম্বের ডিএনএ ও শুক্রকীটের ডিএনএ মিলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ডিএনএ। এই ডিএনএ কোডেই লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে পর্যায়ক্রমে তা কীভাবে পূর্ণাঙ্গ মানব-শিশুতে পরিণত হবে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কীভাবে শরীরের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ভাবলে অবাক হতে হয়, এই ডিএনএ নিজে নিজে ভাগ হয়ে ক্রমাগত জীবকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি ব্রেনের মতো জটিল অঙ্গ তৈরি করছে। পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দেহ-মনকে সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত করে নিজে নিজেই নিজের সবকিছু পরিচালিত করছে। এককথায় ডিএনএ-কে বলা যায় প্রাণের ব্লু-প্রিন্ট।

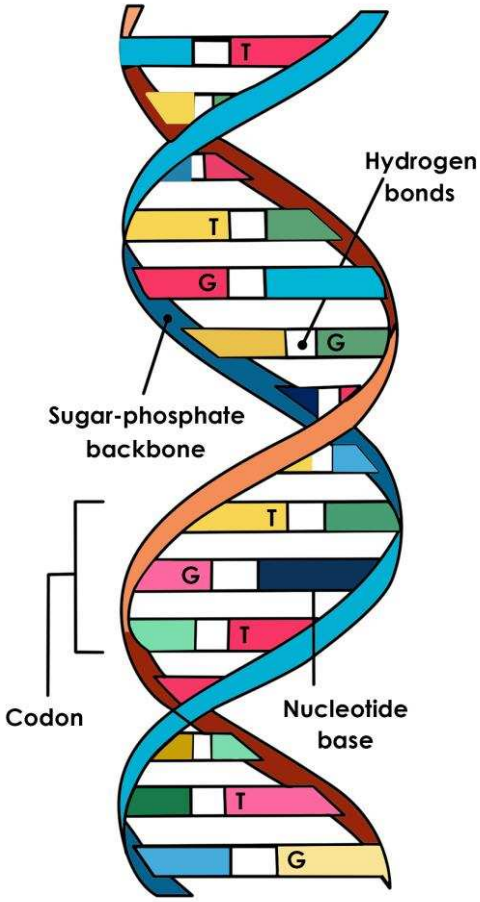

ডিএনএ-কে ব্যাখ্যা করার জন্যে আমরা একটি গাড়িকে উদাহরণ হিসেবে ধরতে পারি। ধরুন আপনি বাজার থেকে একটি গাড়ির ব্লু-প্রিন্ট কিনে এনে গ্যারেজে রেখে দিলেন। এবার কল্পনা করুন, ব্লু-প্রিন্টটি নিজে নিজে আস্তে আস্তে গাড়ির ইঞ্জিন তৈরি করল, গাড়ির বডি তৈরি করল, সিট ও সিট কভার তৈরি করল, ড্রাইভিং প্যানেল, চাকা, উইন্ডশিল্ড ইত্যাদি তৈরি করে গাড়িতে রঙ স্প্রে করে চকচকে ঝকঝকে করে ফেলল। তারপর পেট্রোল ট্যাঙ্কি তৈরি করে পেট্রোল ভরে নিজে নিজেই চলা শুরু করল। এই ধারণা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারলেই প্রাণের বিকাশে ডিএনএ-র ভূমিকা উপলব্ধি করা সম্ভব।

ডিএনএ-র গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, এটি পর্যবেক্ষণ করতে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ-এর প্রয়োজন। দেখতে প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ও ডিএনএ বিশেষজ্ঞ ড. জন কেনড্রু বলেছেন, 'এটি জীবকোষের নিউক্লিয়াসে টেপের মতো প্যাঁচানো থাকে। ডিএনএ টেপকে সোজা করা হলে তা এক মিটার লম্বা হবে। মানবদেহে এই ডিএনএ-র কাজের সংখ্যা সাত লক্ষ। একটি সেলের ডিএনএ-তে যে তথ্য রয়েছে তাকে ভাষান্তর করে লিপিবদ্ধ করতে এক হাজার খণ্ড বিশ্বকোষ লাগবে।

চেতনা অবিনশ্বর

মানবদেহের ৫০ থেকে ৭০ ট্রিলিয়ন সেলের প্রতিটিতেই রয়েছে তিন বিলিয়ন জেনেটিক বিট (Genetic Bits) এর পুরো সেট। প্রতিটি সেলের ডিএনএ-ই একটি অপরটির কার্বন কপি। ব্রেন নিউরোন এবং ত্বকের সেল জেনেটিকভাবে একই। একই ডিএনএ থেকে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাজ ও আয়ুষ্কাল ভিন্ন। একই ডিএনএ দুর্বোধ্য পন্থায় শরীরের সকল ধরনের সেল যথা হাড়, লিভার, কিডনি, হার্ট প্রভৃতির সেল নির্মাণ করছে। আর এ সেলগুলোর প্রতিটির নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল রয়েছে। শুধুমাত্র সেলের দিকে তাকিয়ে এর আয়ুষ্কাল বলা যায় না। যেমন ব্রেনের নিউরোন এবং নাকের ওলফ্যাক্টরি সেল দেখতে একই রকম। কিন্তু নিউরোনের আয়ু বহু বছর হলেও ওলফ্যাক্টরি সেল পরিবর্তিত হয় চার সপ্তাহে।

প্রতিটি সেল বিভিন্ন পরমাণু দ্বারা গঠিত, যা কার্যত উড়ে বেড়ায়। ফুসফুসে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বদল হতে লাগে এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের কয়েকভাগ সময়। ব্রেন নিউরোন থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৩০০ বার সোডিয়াম ও পটাশিয়াম আয়ন পাম্প করে ঢোকানো ও বের করা হয়। রক্ত থেকে অক্সিজেন শোষণ করতে হার্ট মাসলের সময় লাগে কয়েক সেকেন্ড মাত্র। নদীর মতো আপনার শরীরের সবকিছুই নিয়ত প্রবহমান। দেহের সবকিছুই বদলে যাচ্ছে। পাকস্থলীর আস্তর পরিবর্তিত হয় পাঁচ দিনে, ত্বক পাঁচ সপ্তাহে, রক্তের লোহিত কণিকা ৪ মাসে, হাড়ের সেল প্রতি তিন মাসে, লিভার সেলের বদলাতে কয়েক বছর লাগে, ব্রেন সেল বদলায় না।

আপনার শরীরের অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের প্রবাহ এত দ্রুত যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনি পুরোপুরি নতুন হয়ে যেতেন। শুধু লোহা, ম্যাগনেশিয়াম ও তামার মতো ভারী পদার্থ এই প্রক্রিয়াকে ধীর করেছে। তারপরও ক্যালিফোর্নিয়ার ওক রিজ ল্যাবরেটরিতে রেডিও আইসোটোপ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রতিবছর আমাদের শরীরের শতকরা ৯৮ ভাগ এটম বা পরমাণু পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই ক্রমাগত বস্তুগত পরিবর্তন সত্ত্বেও আপনার দেহের কোনো অঙ্গের আকার বা পরিচয় বা আপনার আকার বা পরিচয় কোনোভাবেই নষ্ট হয় নি। লিভার লিভারই রয়ে গেছে, পাকস্থলী পাকস্থলীই, কিডনি কিডনিই রয়ে গেছে। আর আপনি লক্ষ বছর ধরে সুস্পষ্ট মানব হিসেবেই রয়ে গেছেন। দেহের বস্তু বা পদার্থ আসছে, যাচ্ছে, কিন্তু জেনেটিক স্তরে আপনি স্থায়ী। আপনার ডিএনএ-র মূল তথ্য কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

এই ডিএনএ তৈরি করেছে জৈব ঘড়ি। আর এই জৈব ঘড়িই নিয়ন্ত্রণ করছে জাগরণ, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শরীরের তাপ, রক্তচাপ, যৌনতা ও বিভিন্ন হরমোনের প্রবাহে জোয়ারভাটায় প্রাণের সকল ছন্দ। হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত সুপ্রাচিয়াসমেটিক নিউক্লিয়াস নামে অভিহিত এক ক্ষুদ্র নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র চাকার ভেতরের চাকাকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের ২৮ দিনের মাসিক ঋতুচক্র থেকে শুরু করে তিন ঘণ্টা মেয়াদী প্রবৃদ্ধি

হরমোন প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় এই ক্ষুদ্র কেন্দ্র থেকে। এমনকি প্রতিটি জীবকোষ বা সেলের অভ্যন্তরে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার বার যে রাসায়নিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তা-ও শরীরের এই মূল ঘড়ির ছন্দ ও নির্দেশনা অনুসরণ করে।

ডিএনএ-কে আপনি আরেক অর্থে বলতে পারেন আপনার জেনেটিক স্মৃতিভাণ্ডার। আপনি এখন ঠান্ডা বা অন্য কোনো রোগ থেকে নিরাময় লাভ করতে পারছেন, কারণ লক্ষ বছর আগে থেকে যে এন্টিবডি ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস-এর সাথে যুদ্ধ করতে শিখেছে, সেই এন্টিবডির স্মৃতি ও তথ্য আপনার থাইমাস গ্ল্যান্ডে সংরক্ষিত আছে। আপনার ইমিউন সিস্টেম হচ্ছে, পূর্ব পুরুষরা যেসব রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তার প্রতিটির তথ্য সম্বলিত এক বিশ্বকোষ। জ্বর, প্রদাহ, প্লেগ ইত্যাদিতে হাজার হাজার প্রজন্মের মৃত্যুর ফলে লব্ধ তথ্যের বিশ্বকোষের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আপনার জীবন, আপনার প্রাণ।

প্রাণ রহস্য

প্রাণকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি? বস্তু কীভাবে প্রাণে রূপান্তরিত হচ্ছে? প্রাণের বিকাশ সম্পর্কিত জটিল আলোচনায় না গিয়েও আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকেই একটা খুব সাধারণ বিষয় তুলে আনতে পারি। আর তা হচ্ছে দম। আপনি আপনার চারপাশের বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত অক্সিজেনের কথা ভাবুন। অক্সিজেন পরমাণু বাতাসে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাতাসের এই অক্সিজেন পরমাণু হচ্ছে বস্তু। আর এই অক্সিজেন পরমাণুই দম নেয়ার সময় সেকেন্ডের হাজার ভাগের কম সময়ের মধ্যে ফুসফুসের প্রায় স্বচ্ছ পর্দা অতিক্রম করে রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই 'জীবন্ত' হয়ে ওঠে। হিমোগ্লোবিনের রঙ মুহূর্তে কালচে নীল থেকে উজ্জ্বল লাল রং-এ পরিবর্তিত হয়। বায়ুমণ্ডলের একটি বিক্ষিপ্ত অক্সিজেন পরমাণু রূপান্তরিত হয় 'আপনাতে', এই পরমাণু অতিক্রম করে প্রাণ ও নিষ্প্রাণ বস্তুর অদৃশ্য সীমানা।

একবার দম নেয়ার সাথে সাথে কী পরিমাণ অক্সিজেন পরমাণু শরীরে প্রবেশ করে? প্রতিবার দম নেয়ার সাথে সাথে শরীরের পাঁচ ট্রিলিয়ন লোহিত কণিকা বাতাসের মুখোমুখি হয়। প্রতিটি রক্ত কণিকায় রয়েছে ২৮০ মিলিয়ন হিমোগ্লোবিন অণু। প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু ৮টি করে অক্সিজেন পরমাণুকে ধরতে ও পরিবহন করতে পারে। প্রতিবার দমের সাথে ১১x১০^{২১}(১১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০)টি অক্সিজেন পরমাণু শরীরে প্রবেশ করছে। এই অক্সিজেন পরমাণুকে শরীরের 'ইট' মনে করলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা প্রতি দমের সাথে উপরিউক্ত সংখ্যক নতুন 'ইট' শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাগাচ্ছি। পুরাতন 'ইটের' বদলে একেবারে খাপে খাপে বসে যাচ্ছে নতুন 'ইট'। পুরাতন নতুনের জন্যে জায়গা করে দিচ্ছে সহজে-ঠিক নদীর প্রবাহের মতো।

শরীরের ভেতরে কত বিচিত্র তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ছে মুহূর্ত আগের প্রাণহীন বস্তু অক্সিজেন। সাধারণত ৬০

সেকেন্ডে আর ব্যায়ামকালে ১৫ সেকেন্ডে অক্সিজেন পরমাণু পুরো শরীর ঘুরে আসে একবার। এ সময়ের মধ্যে শরীরে প্রবেশকারী নতুন অক্সিজেনের অর্ধেক রক্ত থেকে বেরিয়ে কিডনি সেল, নিউরোন, পেশি সেল বা ত্বক সেলের অংশ পরিণত হচ্ছে। অক্সিজেন এটম সেল ভেদে কয়েক মিনিট থেকে একবছর পর্যন্ত আপনার দেহে অবস্থান করতে এবং আপনি যা করতে সক্ষম তাতে সে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারে। অক্সিজেন এটম একটি নিউরোট্রান্সমিটার-এর সাথে যুক্ত হয়ে আপনার একটি সুখকর চিন্তার অংশে পরিণত হতে পারে। আবার এড্রিনালিন অণুর অংশ হয়ে আপনার মধ্যে আতঙ্ক বিস্তার করতে পারে। গ্লুকোজের সাথে মিশে ব্রেন সেলের খাবারে পরিণত হতে পারে। আবার শ্বেত কণিকার অংশ হয়ে আক্রমণকারী ব্যাক্টেরিয়াকে প্রতিহত করতে গিয়ে আপনার জন্যে আত্মবিসর্জন দিতে পারে।

আর এসব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ডিএনএ-তে সংরক্ষিত তথ্যভাণ্ডার দ্বারা। আমরা যদি আরো গভীরে যাই, আমরা দেখব এই ডিএনএ-ও প্রাথমিকভাবে কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এটমের এক সূক্ষ্ম সমন্বয়। এক সূক্ষ্ম স্পন্দনের সুতোয় গাঁথা। এই সূক্ষ্ম স্পন্দনের সুতোই ডিএনএকে শক্তিশালী করেছে-এর যে-কোনো ব্যতিক্রম-এক মিলিমিটারের ১০ লক্ষ ভাগের একভাগ এদিক ওদিক হলেই এই সুতো ছিঁড়ে যাবে। আর জীবনের সব সূক্ষ্ম স্পন্দনের মূলে রয়েছে এক অন্তর্চেতনা।

জীবন ও প্রাণের এই প্রেক্ষাপটে আপনি যদি উপলব্ধি করতে পারেন চেতনা ও তথ্যের শক্তি কতখানি, তাহলে শক্তির আসল উৎসের সন্ধান পাবেন। মানুষের শক্তির আসল উৎস তার দেহ নয়, চেতনা। দেহ হচ্ছে এই চেতনার বাসস্থান। তাই এই চেতনার সঙ্গে যদি আমরা একাত্ম হতে পারি, চেতনাকে যদি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি তাহলে দুটি ডিএনএ থেকে আমরা যেমন পরিপূর্ণ মানবদেহ লাভ করেছি তেমনি জীবনে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারি। কারণ, মনের শক্তি এই চেতনারই একটা রূপ মাত্র। প্রতিভাবান আর সাধারণ মানুষের পার্থক্য এখানেই। প্রতিভাবানরা-সাধক, বিজ্ঞানী ও সফল মানুষেরা মনের এই শক্তিকে উপলব্ধি করেছেন, সৃজনশীলভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ফলে তারা স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছেন। আর সাধারণ মানুষ মনের এই শক্তিরহস্য সম্পর্কে সচেতন নয়; তাই তারা হতাশা নেতিচিন্তা ও রি-অ্যাকটিভ কাজকর্ম দ্বারা নিজেদের অনন্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে। এককথায় বলা যায়, প্রতিভাবানদের সাফল্যের মূল রহস্য নিহিত রয়েছে মনের শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা, মনের শক্তির ওপর অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা এবং একাগ্রচিত্তে ক্রমাগত এই শক্তির সৃজনশীল প্রয়োগের মধ্যে।

অধ্যায়-২

চাবিকাঠি : বিশ্বাস

সন্দেহ নেই, মনের শক্তি অসীম। তবে এ শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে প্রথমত প্রয়োজন এ শক্তির ওপর বিশ্বাস, অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস। 'আমি পারি, আমি পারব' এ বিশ্বাস যে সাফল্যের জন্যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ যুগে যুগে নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাসই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমি পারব, এই দৃঢ় বিশ্বাসই সকল সাফল্যের ভিত্তি। তারা মনে করেন, 'পারব বলে বিশ্বাস করলে আপনি অবশ্যই পারবেন।' এ ধারণা যে কত বাস্তব ভিত্তিক তা প্রমাণের জন্যে দুয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট।

হাজার বছর ধরে দৌড়বিদরা চার মিনিটে এক মাইল দৌড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এটা অসম্ভব। দৈহিক গঠনের কারণেই তা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের হাড়ের কাঠামো ও ফুসফুসের গঠন দুটোই এ সাফল্যের পথে অন্তরায় বলে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দুহাজার বছর পার হয়ে গেল এভাবেই। তারপরই এল এক শুভদিন। একজন মানুষ প্রমাণ করলেন যে, বিশেষজ্ঞদের এ ধারণা ভুল। তারপর ঘটল আরো অলৌকিক ঘটনা। রজার ব্যানিস্টার প্রথম চার মিনিটে এক মাইল দৌড়ের রেকর্ড স্থাপন করার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই জন ল্যান্ডি পুরো দুই সেকেন্ডের ব্যবধানে ব্যানিস্টারের রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। আর তারপর এ পর্যন্ত হাজারেরও বেশি দৌড়বিদ চার মিনিটের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। যখন অসম্ভব মনে করা হতো, তখন কেউই পারেন নি। আর একবার করা সম্ভব বিশ্বাস করার পর রেকর্ড ভাঙার হিড়িক পড়ে যায়।

শুধু দৌড় বা কোনো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে 'বিশ্বাস' শব্দটি মনের এমন এক শক্তির প্রতীক, যার কোনো যৌক্তিক সীমানা নেই। যেখানে সফলতা সেখানেই নিহিত রয়েছে গভীর বিশ্বাস। বিজ্ঞানী টমাস এডিসন বিশ্বাস করতেন যে, তিনি একটি সঠিক বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করতে পারবেন। এই বিশ্বাসই তাকে গবেষণার ক্ষেত্রে দশ হাজার বার ব্যর্থতার পরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি সক্ষম হয়েছিলেন সঠিক ধাতু প্রয়োগ করে যথার্থ বৈদ্যুতিক বাতি নির্মাণ করতে। বিমান আবিষ্কারক রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুসহ অসংখ্য বিজ্ঞানীর সাফল্য তাদের আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের ফলেই অর্জিত হয়েছে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ' মাত্র পাঁচ বছর স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। দারিদ্র্যের

কারণে মাত্র ১৫ বছর বয়সে মাসে আমাদের টাকায় ৪০ টাকা বেতনে কেরানির কাজ নেন। কিন্তু তিনি লেখক হতে চেয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন একদিন তিনি একজন বড় লেখক হবেন। তাই তিনি প্রতিদিন নিয়মিত লেখা শুরু করেন। লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে তার নয় বছর লেগেছিল। লেখক জীবনের প্রথম নয় বছরে তার লেখা থেকে আয় হয়েছিল আমাদের টাকার হিসেবে মাত্র ৩০০ টাকা। কিন্তু তার বিশ্বাসই তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। লেখক হিসেবেই পরবর্তী সময়ে উপার্জন করেছেন লাখ লাখ টাকা।

জাতীয় কবি নজরুলের সাফল্যও তার মনের প্রচণ্ড শক্তির বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এত দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল যে, ছেলেবেলায় পড়াশোনার পাট চুকিয়ে জীবনধারণের জন্যে রুটির দোকানে কাজ করতে হতো। পরে কিছু পড়াশোনার সুযোগ পেলেও এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি। চলে গেলেন যুদ্ধে। সেখান থেকে ফিরে কলকাতায় এসে পুরোদমে লেখা শুরু করলেন কবিতা। বেরুলো অগ্নিবীণা ও বিষের বাঁশি। রবীন্দ্র প্রতিভা তখন মধ্য গগনে। আর কলকাতার শিল্প-সাহিত্য সংবাদপত্র তখন উচ্চবর্ণের দখলে। কোনো বৈরী পরিবেশই নজরুলের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা আটকে রাখতে পারে নি।

শুধু কি সাহিত্য? যারা বিত্তবান হয়েছেন তাদের ক'জন সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন? এক এক করে আমাদের দেশের বিত্তবানদের দিকে তাকালে দেখব তাদের অধিকাংশই এসেছেন সাধারণ অবস্থা থেকে। মনের শক্তির ওপরে বিশ্বাস ও সেই শক্তির উদ্ভাবনী প্রয়োগই তাদের সফল করেছে।

এ প্রসঙ্গে ভারতেশ্বরী হোমসের প্রতিষ্ঠাতা আর পি সাহার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। নিতান্ত দীনহীন অবস্থা থেকে তিনি ধনকুবেরে পরিণত হয়েছিলেন। আর অতি উন্নতমানের সিরামিকস সামগ্রী উৎপাদনের জন্যে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত মুন্নু সিরামিকসের প্রতিষ্ঠাতা হারুনুর রশীদ খান মুন্নু মাত্র ৭৫ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ধৈর্য, অধ্যবসায় ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনিও পরিণত হয়েছেন ধনকুবেরে। বর্তমানে তার অ্যাসেটের পরিমাণ শত কোটি টাকা। তাছাড়া অভিজাত আবাসিক এলাকায় যারা এখন বাস করছেন খোঁজ নিয়ে দেখুন তাদের ৯০%-ই প্রথম প্রজন্মের বাসিন্দা।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও যারা ধনকুবের হিসেবে পরিচিত তাদের শতকরা ৯০ জনই খুবই সাধারণ অবস্থা থেকে এসেছেন। মার্কিন ধনকুবের এন্ড্রু কার্নেগির কথা ধরুন। তিনি তার সময়ের সবচেয়ে বড় ধনকুবের ছিলেন। তিনি ছিলেন বস্তির ছেলে। ১২ বছর যখন তার বয়স তখন তার পোশাক এত মলিন ও নোংরা ছিল যে, দারোয়ান তাকে পাবলিক পার্কে প্রবেশ করতে দেয় নি। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যেদিন তার টাকা হবে সেদিন তিনি এই পার্কটি কিনে ফেলবেন। ৩০ বছর পর তিনি তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছিলেন। তিনি সেই পার্কটি কিনেছিলেন। পার্কে নতুন একটি সাইনবোর্ড লাগিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'আজ থেকে দিনে বা রাতে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো মানুষ যে-কোনো পোশাকে এই পার্কে প্রবেশ করতে পারবে।'

মৃত্যুর আগে তিনি তার সকল সম্পদ জনহিতকর কাজে দান করে যান।

দক্ষিণ কোরিয়ার এখনকার সবচেয়ে বড় ধনকুবের হুন্দাই কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা চুং জু জুং কৃষি শ্রমিক ছিলেন। অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করতেন। দীর্ঘ শ্রম, অধ্যবসায় ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ করে তিনি পরিণত হয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সবচেয়ে বড় ধনকুবেরে। দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি নির্মাণে এই দিনমজুরের ভূমিকা যে কত ব্যাপক তা বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে। ১৯৯৫ সালে চুং জু জুং কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে তিনি কোম্পানির ৫০ মিলিয়ন ডলার অপব্যয় করে ফেলেন। চুং জুং-এর বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলায় বিচারক তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন। পরে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি নির্মাণে তার অবদানের প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বিচারক এই কারাদণ্ড মওকুফ করে দেন।

বিশ্বাসের অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকলে জোয়ান অব আর্কের জীবন এ সন্দেহ দূর করার জন্যে যথেষ্ট। জোয়ান অব আর্ক ছিলেন এক দরিদ্র মেষপালক পরিবারের কন্যা। বারো বছর বয়স পর্যন্ত তার মধ্যে অসাধারণ কোনোকিছুই দেখা যায় নি। এ সময় হঠাৎ তার মনে হলো ইংল্যান্ডের সাথে শতবর্ষের যুদ্ধে ফ্রান্সের বিজয়ের জন্যে সেনাপতিত্ব করার জন্যে তিনি স্রষ্টার দ্বারা মনোনীত হয়েছেন। এই বিশ্বাস তাকে ভূতে পাওয়ার মতোই পেয়ে বসল। ১৭ বছর বয়সে তিনি শুধুমাত্র বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে হতবল ফরাসিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত অরলিন্স দুর্গ জয় করেন। জোয়ান অব আর্ক যেমন গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, আমরা যদি সেভাবে সাফল্য লাভে আমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি, তাহলে আমরা যা করতে চাই না কেন তাতেই সফল হবো । কোনোকিছুই আমাদের থামাতে পারবে না, যেমন দুর্গের ৩০ ফুট উঁচু দেয়াল থামাতে পারে নি জোয়ান অব আর্ককে।

শুধু সাফল্য নয়, দেহের ওপরও বিশ্বাসের শক্তি অপরিসীম। বিশ্বাস আপাতদৃষ্টিতে দুরারোগ্য ব্যাধিকেও নিরাময় করে দিতে পারে। হেলেন কেলার বিশ্বাস করতেন যে, তিনি কথা বলতে শিখতে পারবেন। যদিও তার দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাকশক্তি বিনষ্ট হয়েছিল। তার বিশ্বাস ও প্রচেষ্টাই তার বাকশক্তি পুনরুদ্ধার করে। তিনি কথা বলতে শেখেন। কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করেন। লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সফল বক্তা হিসেবে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ান। শ্রবণ ও দৃষ্টিক্ষমতাহীনতা তার সাফল্যের পথে অন্তরায় হয় নি। দৈহিক ত্রুটির কারণে যারা হতাশ হয়ে পড়েন, তাদের সামনে হেলেন কেলার আজও প্রেরণার আলোকবর্তিকা।

শুধু হেলেন কেলার কেন অসংখ্য মানুষ একমাত্র বিশ্বাসের বলে দৈহিক ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক সাফল্যের অধিকারী হয়েছেন। বিশিষ্ট ব্যালে নর্তকী আলেকজান্দ্রা আট বছর বয়সে মারাত্মক পোলিওতে

আক্রান্ত হয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেও পঙ্গু হয়ে যান। ডাক্তাররা বলে দিয়েছিলেন, এ মেয়ে কোনোদিন হাঁটা-বসা তো দূরের কথা ঘাড় সোজা করতে পারবে না। কিন্তু তার বাবা বিশ্বাস করতেন যে, মেয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। বাবা মেয়ের মনে সে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বলেই যে মেয়ে ঘাড় তুলতে পারত না, সে মেয়েই ক্রমাগত ব্যায়াম ও চর্চার মাধ্যমে ব্যালে নাচে খ্যাতি লাভ করেন।

বিখ্যাত লেখক ও মনস্তাত্ত্বিক নেপোলিয়ন হিল মনের বলের আরো চমৎকার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তার ছেলে জন্মগ্রহণ করে কানের পর্দা ছাড়া। ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ডাক্তাররা তাকে জানায়, সারাজীবন সে বধির থাকবে। হিল লিখেছেন, আমি বিশ্বাস করতাম তার শোনার একটা বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে প্রকৃতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আমার রয়েছে। আমি তার অবচেতন মনের মাধ্যমে কাজ শুরু করি। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে স্বাভাবিক শ্রবণক্ষমতার ৬৫ ভাগই পুনরুদ্ধারে সক্ষম হই। অবচেতন মন ইন্দ্রিয়ের অভাবও পূরণ করতে পারে বিকল্প মাধ্যমে।

মনের শক্তি দিয়ে মানুষ যে রোগ ও দৈহিক পঙ্গুত্বকেও উপহাস করতে পারে তার প্রমাণ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। লিখতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, দুরারোগ্য মোটর নিউরোন ব্যাধিতে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে যেতেও তিনি বিশেষভাবে তৈরি কম্পিউটারের সহযোগিতায় রচনা করেছেন বর্তমান যুগের বিজ্ঞান জগতের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'। হুইল চেয়ার থেকে তুলে যাকে বিছানায় নিতে হয়, তিনি অবলীলায় মহাবিশ্ব পরিভ্রমণ করে উপহার দিয়েছেন বিশ্ব সৃষ্টির নতুন তত্ত্ব। আইনস্টাইনের পর তাকেই মনে করা হচ্ছে বিশ্বের প্রধান বিজ্ঞানী।

শুধু পঙ্গুত্ব নয়, শুধু রোগ থেকে মুক্তি নয়, মনের শক্তি ও বিশ্বাস মানুষকে ক্লিনিক্যালি ডেড বা মৃত অবস্থা থেকেও জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে। এজন্যে প্রয়োজন শুধু নিজের ওপর বিশ্বাস। এর জ্বলন্ত প্রমাণ বাংলাদেশে ফলিত মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ এবং আত্মউন্নয়নে ধ্যানপদ্ধতি প্রয়োগের প্রবর্তক প্রফেসর এম ইউ আহমেদ। তিনি 'ক্লিনিক্যালি মৃত্যুবরণ' করার পরও পুনরায় জীবন লাভ করেছিলেন ১৯৭৩ সালের ২৬ মার্চ ৬৪ বছর বয়সে। তিনি আগের দিন ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে আক্রান্ত হন। সারারাত অচেতন থাকার পর ডাক্তারের পরামর্শে শেষ রাতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

সকাল আটটায় জ্ঞান ফিরে আসার পর হাসপাতালে নিজেকে দেখে তার মনে পড়ল দুদিন আগে এ ওয়ার্ডেই তার বড় শ্যালক মারা গেছেন। আর মৃত্যুর আগে তার খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ তিনি নিজের নাড়ি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন কোনো সাড়া নেই। তার বড় মেয়ে মেরীও তাই দেখল। এর পরবর্তী ঘটনা প্রফেসর এম ইউ আহমেদের ভাষাতেই শুনুন-

'একটু পরেই ডাক্তার সাহেব এলেন এবং ঠিক তখন ভীত অবস্থায় আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। সাথে সাথে

আমার শরীরটাও যেন ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ মনে হলো এটাই আমার মৃত্যুর সময়। আমি তাই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তখন মৃত্যু কামনা করলাম।

আর আমিও যেন ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর প্রশান্তিপূর্ণ আবরণে সমাহিত হতে থাকলাম। আমি চিৎকার করছিলাম যে, আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাই ডাক্তার সাহেব ডান নাকে অক্সিজেন সিলিন্ডারের পাইপ ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও কষ্ট হচ্ছিল। তাই আমি ঠিক সেই মুহূর্তে মৃত্যু কামনা করলাম। সাথে সাথে আমার মাথাটা একটু উঁচু হয়ে তৎক্ষণাৎ বালিশের ওপর পড়ে গেল। এ সময় আমার গায়ের গেঞ্জিটা যেন ডাক্তার ব্লেড দিয়ে কেটে ছাড়িয়ে আনছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম। প্রত্যেকের কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছিলাম, যদিও শারীরিকভাবে মৃত্যু হতে থাকায় নিজে সাড়া দিতে পারছিলাম না।

এ সময় প্রথমে আমার হার্টবিট, পরে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং এরপরে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। শরীর হয়ে ওঠে বরফের মতো ঠান্ডা। ডাক্তার সাহেব আমার পায়ের নিচের দিকের রিফ্লেক্স অ্যাকশন পরীক্ষা করে কিছুটা সাড়া পাওয়ায় আমাকে ক্লিনিক্যালি মৃত জেনেও চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

তখন আমার অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম এবং কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। নিজেকে মরণের কোলে এলিয়ে দিয়েছিলাম বলে খুবই আনন্দ লাগছিল, শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল না। এ পর্যায়ে আমি ক্লিনিক্যালি মৃত হলেও জৈবিকভাবে জীবিতই ছিলাম। তাই দেহ মরে গেলেও স্মৃতি, চিন্তা ও কোনো কোনো অনুভূতি সক্রিয় ছিল। তখন আমার চারপাশে নিকটজনেরা কান্নাকাটি করছে।

এমন অবস্থায় আমার মেয়ে মেরী হঠাৎ গুরুগম্ভীর ও মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিতে শুরু করে 'আব্বা তোমাকে বাঁচতেই হবে, বাঁচতেই হবে।' তখন আমি আশ্চর্য শান্তির মধ্য দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় মেরীর মিনতিপূর্ণ গুরুগম্ভীর নির্দেশ আমাকে স্থবির করে ফেলল। ভাবতে লাগলাম, কেন বাঁচতে হবে? এবং একসময় দৈহিক অবস্থায় মৃত থেকেই জোরেশোরেই প্রশ্নটা করলাম, 'কেন আমাকে বাঁচতে হবে?'

এ ঘটনায় ডাক্তাররা আশ্চর্য হয়ে গেল। মেরীর নির্দেশ তখনো চলছে অবিশ্রান্ত। আমি তাই চিন্তা করতে বাধ্য হলাম যে কেন আমাকে বাঁচতে হবে। আমার অন্তরাত্মা বেঁচে থাকার জন্যে যেন একটা গ্রহণযোগ্য সূত্র আবিষ্কার করতে চাইল। আমি ভেবে দেখলাম যে, পরিবারের লোকদের জন্যে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল অসহায় মানসিক রোগীদের কথা। আমি ছাড়া এদেশে নির্ভরযোগ্য মনোচিকিৎসক নেই। এছাড়া আরেকটা দায়িত্বের কথা মনে পড়ল। ভেবে দেখলাম মানসিক রোগীদের স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত সাইকোলজিক্যাল ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার জন্যে আমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। হঠাৎ বেশ কিছুটা জোরেশোরেই বলে ফেললাম, 'আমাকে বাঁচতে হবে। ডাক্তার সাহেব আপনারা চেষ্টা করুন।' জানি না মৃত অবস্থায় কীভাবে কথাগুলো বললাম। ডাক্তাররা এটা শুনে দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে

সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন। সাথে সাথে আমি সেই অভ্যস্ত অটোসাজেশন প্রয়োগ করতে লাগলাম-

Live long

Happy strong

'ডাক্তার সাহেব এবং আমার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আস্তে আস্তে আমার অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম সক্রিয় হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার হার্টবিট, শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন ও রক্ত সঞ্চালন শুরু হলো। প্রায় ছ'ঘণ্টা মৃত অবস্থায় থাকার পর দুপুর দুটোয় আমি পুনরায় জীবন লাভ করলাম।'

প্রফেসর এম ইউ আহমেদের এই পুনরায় জীবন লাভের ঘটনার বিবরণ রয়েছে তার 'যৌন রোগ চিকিৎসায় 'মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি' এবং 'লার্ন টু হিপনোটাইজ এন্ড কিউর' গ্রন্থে। এরপর তিনি আরো প্রায় ১৬ বছর বেঁচে ছিলেন।

আপনি যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হলে এদের মতো আপনাকেও মন-শক্তিতে বিশ্বাসী হতে হবে। এদের মতো আপনারও সম্ভাবনা অনন্ত। আপনিও এদের মতো অমূল্য সম্পদের মালিক। কিন্তু সে সম্পর্কে আপনি পুরো সচেতন নন। আর আপনার এই অমূল্য সম্পদ হচ্ছে আপনার ব্রেন-আপনার মস্তিষ্ক।

নিউরোসায়েন্টিস্টরা বলেন, মানব মস্তিষ্ক সর্বাধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে দশ লক্ষ গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই দামের হিসেব করলে একটি কম্পিউটারের দাম যদি ৫০ হাজার টাকা হয় তাহলে আপনার ব্রেনের দাম দাঁড়াচ্ছে কমপক্ষে পাঁচ হাজার কোটি টাকা।

আপনি সবসময় কমপক্ষে পাঁচ হাজার কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ আপনারই ঘাড়ের ওপর বয়ে বেড়াচ্ছেন। এরপরও যদি আপনি গরিব থাকেন তাহলে আপনার দারিদ্র্যের কারণ অভাব নয়, আপনার স্বভাব। কারণ, আপনি ব্রেনের মাত্র চার থেকে পাঁচ শতাংশ ক্ষমতা ব্যবহার করছেন। আর প্রতিভাবানরা–সফল ব্যক্তিরা এই ব্রেনের ক্ষমতার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ব্যবহার করছেন। আপনিও যদি ব্রেনের এই ক্ষমতাকে এদের মতো ব্যবহার করতে পারেন তাহলে নিঃসন্দেহে সফল ও খ্যাতিমান হতে পারবেন।

অধ্যায়-৩

ব্রেন : বিস্ময়কর জৈব কম্পিউটার

মানবদেহের সবচেয়ে জটিল, রহস্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে ব্রেন বা মস্তিষ্ক। মানব অস্তিত্বের সবকিছু ব্রেন দ্বারা পরিচালিত হলেও ব্রেন সম্পর্কিত মানুষের ধারণা এখনো প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে। মহাকাশ জয়ের কারিগরি নৈপুণ্য, সুপার কম্পিউটারের মতো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করলেও মাথার খুলির অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্রেন সম্পর্কিত জ্ঞান এখনো একদমই ভাসা ভাসা। ব্রেন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান এবং মানুষের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে এক মহাসমুদ্রের। এই মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ব্রেন সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান লাভ করতে পারলেই মানুষ দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অঙ্গকে ব্যবহার করতে পারবে পরিপূর্ণভাবে। এখনকার অনেক সীমাবদ্ধতা ও মনোদৈহিক অসুবিধাকে অতিক্রম করতে পারবে। নিজের জন্যে সৃষ্টি করতে পারবে সাফল্য ও সম্ভাবনার নতুন মাত্রা। এমআইটি-র নিউরোসায়েন্টিস্ট প্রফেসর ফ্রান্সিস স্মিথের ভাষায়, মানুষ যদি আবিষ্কার করতে পারে কেন সে অনন্য, তাহলে হয়তো সে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে না। বরং এখনকার চেয়ে নিজেকে বেশি শ্রদ্ধা করবে।

বিশ্বে প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ বা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে ব্রেনের কারণেই। আগেই বলেছি, দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ব্রেন। হার্টকে বলা যেতে পারে একটা পাম্প মেশিন। ফুসফুসকে বলা যেতে পারে অক্সিজেন সমৃদ্ধকরণ যন্ত্র। কিন্তু মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে নিয়ন্ত্রক শক্তি হচ্ছে ব্রেন। মানুষের সকল চিন্তা ও সচেতনতার কেন্দ্র হচ্ছে ব্রেন। মানুষের সকল উদ্ভাবনী দক্ষতার উৎস হচ্ছে ব্রেন। ব্রেনের এই দক্ষতার কারণে মানবজাতির পূর্বপুরুষরা দৈহিকভাবে তার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে শুধু টিকেই থাকে নি, বরং প্রাণিকুলের মাঝে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্রেনই মানুষকে প্রথম পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে শিখিয়েছে। আর সেই ব্রেনের জেনেটিক উত্তরসূরিরাই বানিয়েছে মহাশূন্য যান। মানুষ অতীতে যা করেছে, ভবিষ্যতে যা করবে তা এই ব্রেনেরই ফসল। ব্রেনই মানুষকে 'মানুষ' বানিয়েছে।

প্রাচ্যের সাধকরা হাজার হাজার বছর ধরে মস্তিষ্কের শক্তির গুরুত্ব দিলেও পাশ্চাত্য বর্তমান শতাব্দিতে এসেই মাথার খুলির ভেতর অবস্থিত দুর্জ্ঞেয় ও অত্যাশ্চর্য যন্ত্র ব্রেন সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেছে। দার্শনিক এরিস্টটল তার ছাত্রদের শিখিয়েছেন হার্টই হচ্ছে চিন্তা ও চেতনার কেন্দ্র, ব্রেন হচ্ছে রেডিয়েটর বা রক্ত ঠান্ডা করার যন্ত্র মাত্র। দার্শনিক প্লিনি প্রথম ব্রেনকে বুদ্ধি ও উপলব্ধির কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু তিনি বা তার পরবর্তী বিজ্ঞানীদের ব্রেন নিয়ে গবেষণা করার জ্ঞান বা কারিগরি দক্ষতা কোনোটাই ছিল না।

মানবজাতি ব্রেন সম্পর্কে পুরোদমে গবেষণা শুরু করেছে ৬০-এর দশক থেকে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কয়েক ডজন ল্যাবরেটরিতে মনোবিজ্ঞানী, প্রাণিবিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (MIT) আহূত নিউরোসায়েন্স রিসার্চ প্রোগ্রাম (NRP)।

১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এনআরপির ব্রেন সম্পর্কিত গবেষণায় ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, মার্কিন ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট, জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটসহ বহু দেশের বিজ্ঞানীরা সহযোগিতা করে আসছেন। ড. ফ্রান্সিস অটো স্মিথের নেতৃত্বাধীন এই প্রোগ্রামের সাথে জড়িত কয়েক ডজন বিজ্ঞানীর মধ্যে আধ ডজন বিজ্ঞানীই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ব্রেনের কার্যক্রম বোঝার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে, ব্রেনের ভেতরে যা ঘটছে তা থেকে ব্রেনের বাইরে যা ঘটছে তাকে আলাদা করা যায় না। তাই প্রতিবছরই বেশি সংখ্যক বিজ্ঞানী ব্রেনের কার্যক্রম নিয়ে গবেষণায় জড়িয়ে পড়ছেন। যত জানছেন, তত বেশি করে তাদের সামনে ধরা পড়ছে এ জানার সীমাবদ্ধতা। মানুষ পরমাণুকে চূর্ণ করেছে, জেনেটিক কোডকে ভাঙতে সক্ষম হয়েছে। চাঁদে পা রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখনো স্মৃতি, শিক্ষা, সচেতনতার রহস্য রহস্যই রয়ে গেছে। তাই এখনো সে নিজেকে বুঝতে পারে নি। ড. স্মিথ তাই বলেছেন, 'মানুষকে বুঝতে হলে প্রথম ব্রেনকে বুঝতে হবে।'

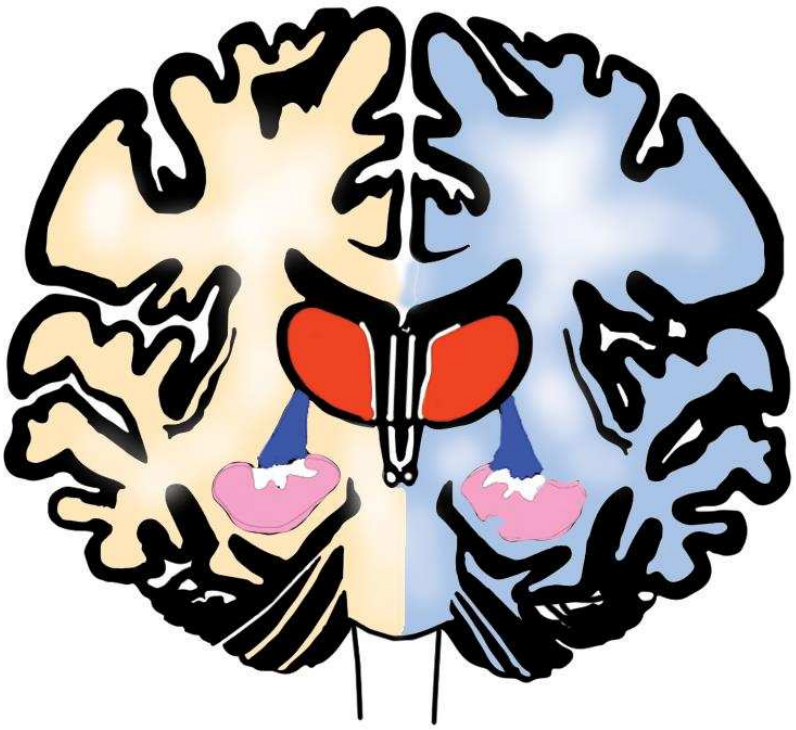

ব্রেন : সামনে থেকে যেমন দেখায়

কিন্তু ব্রেনকে বোঝা এত সহজ নয়। তাই ব্রেনকে বোঝার এই নতুন বিজ্ঞান নিউরোসায়েন্সের সাথে জড়িত বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা কার্যক্রমে সাফল্যের পথের বাধাগুলোকে কিছুতেই ছোট করে দেখছেন না। কারণ ব্রেন এক অতি জটিল অঙ্গ। কম্পিউটারের সাথে এর তুলনা করা হলেও একটি আধুনিক কম্পিউটার ১০০ বিলিয়ন 'বিট' তথ্য জমা ও মনে করতে পারে। সেখানে ব্রেনের সামর্থ্য অসীম।

কম্পিউটার অবশ্য ব্রেনের চেয়ে দ্রুত বেতন তালিকা, হিসাব তালিকা, মহাশূন্য যানের গতিপথ নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু কম্পিউটার শুধুমাত্র সে কাজগুলোই করতে পারে যা তার নির্মাতা মানুষ তাকে করার জন্যে প্রোগ্রাম করেছে। অপরদিকে ব্রেন অনেক অনেক সূক্ষ্ম কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করে। মানুষের হার্ট ও দম মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেন, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেন, গরম কিছুতে ছ্যাকা লাগার সাথে সাথে হাত সরিয়ে নেয় ব্রেন। আর এ নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হচ্ছে মানুষের সচেতনতার অজ্ঞাতে। আর তাছাড়া ব্রেন নিজেকে নিজে মেরামত করতে পারে। ব্রেন নষ্ট হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রেনের কোনো কোনো অংশ অপর অংশের কাজ রপ্ত করতে ও পরিচালিত করতে শিখতে পারে, যা কম্পিউটার পারে না। কম্পিউটারকে সুইচ অফ করে বন্ধ করে দেয়া যায়, কিন্তু ব্রেনকে বন্ধ করার উপায় নেই। আপনি কাজ করুন বা ঘুমিয়ে থাকুন ব্রেন সবসময়ই সক্রিয় থাকে। শিশমহল বা আয়নার মহলে যেমন একের পর এক নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি ব্রেন পারে নিজেকে নিয়েও ক্রমাগত চিন্তা করতে।

কম্পিউটার ও ব্রেনের তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যায়, মানুষ কী বিশাল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। বিশ্বের একটি সুপার কম্পিউটার হচ্ছে ক্রে-১ কম্পিউটার। এর ওজন ৭ টন। আর মস্তিষ্কের ওজন দেড় কেজি। ক্রে-১ প্রতি সেকেন্ডে চার শত মিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে পারে। মস্তিষ্ক পারে ২০ হাজার বিলিয়ন। ক্রে-১ কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে ৪০০ মিলিয়ন ক্যালকুলেশন হিসেবে ১০০ বছর কাজ করলে মস্তিষ্কের মাত্র ১ মিনিটের কার্যক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে।

ব্রেনের নিউরোনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে তুলনা করলে মস্তিষ্কের সামনে এটির তুলনামূলক অবস্থান হবে একটি চীনা বাদামের সমান। দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা মাত্র বুঝতে শুরু করেছেন যে, মস্তিষ্ক হচ্ছে এক বিস্ময়কর জৈব কম্পিউটার। যার অসীম সম্ভাবনা এখনো প্রায় পুরোটাই অব্যবহৃত রয়ে গেছে।

	ক্রে-১ কম্পিউটার	মানব মস্তিষ্ক
ওজন	৭ টন	১.৫ কিলোগ্রাম
তার	৬০ হাজার মাইল	২ লক্ষ মাইল
ক্যালকুলেশন	৪০০ মিলিয়ন/সেকেন্ড	২০,০০০ বিলিয়ন/সেকেন্ড
সম্ভাবনা	সীমিত	অসীম
চিন্তা প্রণালি	LINEAR	MULTIORDINAL GEODESIC

কম্পিউটার ও ব্রেনের তুলনামূলক চিত্র

সকল প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক

মানুষকে তার পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংযুক্ত রাখছে ব্রেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রেরিত তথ্যের সমন্বয় ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ব্রেনই মানুষকে সক্ষম করছে নতুন তথ্যের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণে। এইভাবে সে মানুষকে ক্ষতি বা বিপদ থেকে বাঁচাচ্ছে। আর শরীরের সবকিছু যাতে যথাযথভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করছে। আর এ কাজ করার জন্যে প্রতিনিয়ত শরীরের ভেতরে কী ঘটছে, শরীরের বাইরে কী হচ্ছে, পারিপার্শ্বিকতায় কী ঘটছে- তার সবকিছুই মনিটর করছে ব্রেন।

দেহের সব যোগাযোগের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ব্রেন। দেহের ভেতরের সকল তথ্য সে পাচ্ছে হরমোন ও রিসিপ্টরের মাধ্যমে। দেহের বাইরের সকল তথ্য পাচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, কখনো কখনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। এই সকল তথ্য সে জমা রাখছে স্মৃতিতে। ব্রেন পুরনো তথ্যের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেহের সকল অঙ্গের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের নির্দেশ পাঠিয়ে দেহাভ্যন্তরের সুষম অবস্থা বজায় রাখছে আর পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কেও ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ব্রেনের তথ্য ধারণক্ষমতা অসীম। সচেতন বা অবচেতনভাবে দৈহিক বা মানসিকভাবে আপনি এখন যা করছেন বা যে পদক্ষেপ নেবেন তা সাধারণত নির্ভর করে আপনার অতীত অভিজ্ঞতার ওপর। অর্থাৎ অতীতে যখন এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখনকার ঘটনার ওপর। এটি হচ্ছে 'স্মৃতি'। এই 'স্মৃতি'ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার দৈহিক আচরণকে প্রভাবিত করে। আপনি সচেতন থাকুন আর না-ই থাকুন এই স্মৃতিই প্রতিটি দক্ষ সিদ্ধান্ত ও কাজের সংক্ষিপ্ত পথ।

ব্রেন সেলগুলো যে বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় এবং একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে যে কত সংখ্যক নিউরোন সেলের পারস্পরিক যোগাযোগ প্রয়োজন হয় তা কল্পনা করতে গেলেও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

জার্মানির বিখ্যাত ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ম্যানফ্রেড ইগান নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ব্রেনের কোনো কোনো কেমিক্যাল রি-অ্যাকশন সংঘটিত হতে সময় লাগে মাত্র এক সেকেন্ডের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়। তিনি বলেছেন, একটি দ্রুতগামী গাড়ির নিচে পড়া থেকে বাঁচার জন্যে এক পা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়া ও তা কার্যকর করার জন্যে এক লক্ষ নিউরোনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় এবং পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে।

পরিবেশের সাথে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার ওপরই নির্ভর করে আপনার অস্তিত্ব। আপনার প্রাণ-প্রক্রিয়ার সুস্থতা নির্ভর করে বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর । এর সাথে যদি দেহ খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষম হয় তবে তার বিনাশ অনিবার্য। যেমন- বাইরের তাপমাত্রা যা-ই হোক দেহের তাপমাত্রা যদি ঠিক না থাকে তাহলে বেশিক্ষণ জীবিত থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য ব্রেন বাইরের তাপমাত্রার যে-কোনো পরিবর্তনকে সাথে সাথে ধরতে পারে এবং দেহের তাপমাত্রা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় কাজের নির্দেশনা প্রদান করে।

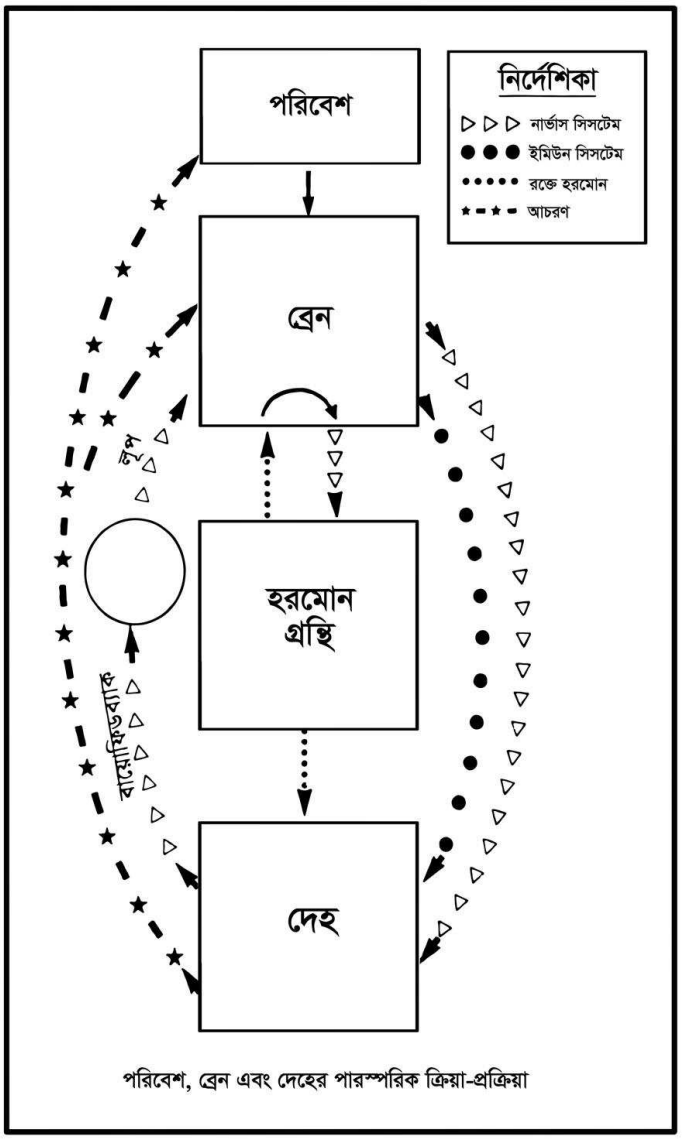

পরিবেশ, ব্রেন এবং দেহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া

আপনার জীবনধারণের জন্যে অত্যাবশ্যক প্রাণ-রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালু রাখার পুরো কাজই করে ব্রেন। এ প্রক্রিয়া যেমন জটিল তেমনি একটির সাথে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং নির্ভরশীল। এর যে-কোনো পর্যায়ে সমন্বয়ের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি পুরো প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। যেমন- রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া না থাকলে আপনি খাদ্য হজম এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে দেহের সর্বত্র প্রেরণ করতে পারতেন না। আবার আপনি যদি খাবার শনাক্ত করতে ব্যর্থ হতেন অথবা শনাক্ত করতে পারলেও যদি সঠিকভাবে হাত ব্যবহার করে তা ধরে ঠিকমতো দুই ঠোঁটের মাঝখানে মুখে প্রবেশ করাতে না পারতেন তাহলে আপনার হজম প্রক্রিয়াও কোনো কাজে আসত না।

কিন্তু আপনি কোনোরকম চিন্তা না করেই অবলীলায় সামনের খাবার তুলে মুখে দিয়ে চিবানোর সাথে সাথে মুখের গ্রন্থিগুলো লালা নিঃসরণ শুরু করে দেয় আর আপনি কোনো সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়া তা গলাধঃকরণ করে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দেন।

এনজাইম তৈরি হয়ে শুরু হচ্ছে পাকস্থলীর খাবার হজমের প্রক্রিয়া। হজম প্রক্রিয়ায় শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগৃহীত হচ্ছে। আর রেচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় অংশ শরীর থেকে নির্গত হচ্ছে। ব্রেন দেহের এই পুরো প্রক্রিয়াকে এমনভাবে পরিচালিত করে যাতে করে প্রতিটি কাজ ঠিক সময়ে শুরু হয় এবং ঠিক সময়ে শেষ হয়। একে একটি সুসমন্বিত রিলে রেসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি প্রতিটি প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়ের কোনো অভাব হতো, তাহলে দেখা যেত মুখে খাবার প্রবেশ করার পরও লালা নিঃসরণ হচ্ছে না অথবা খাবার হজম না হয়েই পাকস্থলী, অন্ত্র পার হয়ে রেচন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমরা আগেই দেখেছি- ব্রেন এই কাজগুলো সুচারুরূপে করতে পারছে দেহের অভ্যন্তরে প্রতিটি অংশের সাথে সংযোগ এবং বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ থাকার ফলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, কখনো কখনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ব্রেন পায় বাইরের তথ্য। আর ভেতরের তথ্য সংগৃহীত হয় রিসিপ্টর (Internal receptors)-এর মাধ্যমে। তথ্য পাওয়ার পর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কার্যকর করার জন্যেও ব্রেন ও শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গের রয়েছে সংযোগ।

ব্রেন এই তথ্য সংগ্রহ ও কর্ম নির্দেশনা প্রদান করে দুই পদ্ধতিতে। প্রথমত, অতিদ্রুত পদ্ধতি নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের মাধ্যমে (হরমোন দ্বারা) শ্লথ গতিতে। ব্রেন, নার্ভাস সিস্টেম, এন্ডোক্রাইন সিস্টেম, দেহ, পরিবেশ ও বায়ো-ফিডব্যাক কীভাবে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে ওপরের চিত্র থেকে তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

মন, দেহ ও পারিপার্শ্বিকতা পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। চিত্রে দেখুন- ব্রেন কোনো হুমকি দেখা দেয়ার সাথে সাথেই দেহকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হওয়ার জন্যে কেমিকেল ম্যাসেঞ্জার পাঠাচ্ছে। এই কেমিকেল

ম্যাসেঞ্জার আবার ব্রেনকে আরো সতর্ক করার কারণ হতে পারে। পরিণামে ব্রেন মূল বিপদ কেটে যাওয়ার পরও সতর্কসংকেত পাঠানো অব্যাহত রাখতে পারে। এই ফিডব্যাক লুপকে কোনো না কোনোভাবে সংশোধন করতে না পারলে (যেমন মেডিটেশন, শিথিলায়ন বা পায়চারি) দেহে ক্ষতিকর টেনশন সৃষ্টি হয়, যা দেহের জন্যে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ব্রেনের সার্কিটও জ্যাম করে দেয়। আসলে দেহের ভেতরের এবং বাইরের পরিবেশের মধ্যে যোগাযোগ সমন্বয়ে ব্রেনের কার্যক্রম ফিডব্যাক দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়।

বিস্ময়কর অঙ্গ

ব্রেন-এর ওজন প্রায় দেড় কেজি। এটি গঠিত দুই ধরনের সেল দিয়ে। নিউরোন সেল এবং গ্লিয়াল (Glial) সেল। নিউরোন সেলের তুলনায় গ্লিয়াল সেলের অনুপাত হচ্ছে ১:১০। অর্থাৎ একটি নিউরোন সেলের বিপরীতে রয়েছে ১০টি গ্লিয়াল সেল। আর এই নিউরোন সেলের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১০০ বিলিয়ন। একটি নিউরোন অপর নিউরোনের সাথে সংযুক্ত হয় সূক্ষ্ম তন্তু ডেনড্রাইট ও এক্সনের মাধ্যমে। এমনিভাবে একটি নিউরোন কমপক্ষে ১০ হাজার নিউরোনের সাথে সংযুক্ত। কোনো কোনো নিউরোন সংযুক্ত থাকে দুই লক্ষ নিউরোনের সাথে। একটি নিউরোনের সাথে অপর নিউরোনের সংযুক্তি সার্কিটে একটা ফাঁক থাকে। একে বলা হয় সিন্যাপস (Synapse)। এ ধরনের সিন্যাপস-এর সংখ্যা কমপক্ষে ১০০ ট্রিলিয়ন। ব্রেনের কাজ কর্ম পরিচালিত হয় ইলেকট্রোকেমিক্যাল পদ্ধতিতে। ব্রেন পরিচালনায় প্রয়োজন হয় ২০ থেকে ২৫ ওয়াট বিদ্যুৎ। প্রতি সেকেন্ডে এক থেকে দশ লক্ষ কেমিকেল রি-অ্যাকশন ঘটে ব্রেনের মধ্যে। গভীর মনোযোগে ভারী ব্যায়ামের সমান ক্যালরি খরচ হয়। ব্রেন কখনো ক্লান্ত হয় না। ২৪ ঘণ্টা কাজ করে। গভীর ঘুমের সময়ও ব্রেন সক্রিয় থাকে।

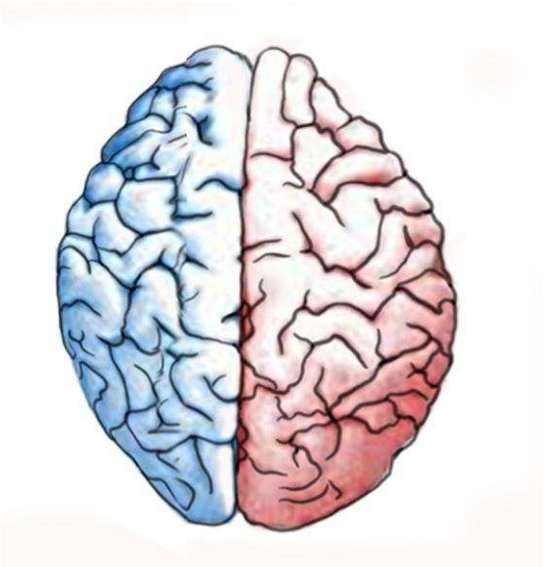

ব্রেনের সেরিব্রাল বলয়

ব্রেনের সেরিব্রাল বলয় (Cerebral hemispheres) বাদামের মাঝখান দিয়ে বিভক্ত দুই অংশের মতো সমানভাবে বিভক্ত। এক অংশকে বলা হয় ডান বলয়, অপর অংশকে বলা হয় বাম বলয়। কিন্তু এই দুটোর আড়াআড়ি সংযুক্তি (Cross-wired) থাকায় ডান বলয় নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের বাম অংশকে আর বাম বলয় নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের ডান অংশকে। দুই বলয়ের মধ্যে বাম বলয় (বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে বাম বলয়) বেশি সক্রিয় থাকে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করে কথা, শ্রুতি, অঙ্ক, যুক্তি, ভাষা, ক্ষুধা, হজম ও বৈষয়িক ভাবনা। আর ডান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে কল্পনা, আবেগ, বিশ্বাস, ঘুম, স্বপ্ন, সংগীত, সৃজনশীলতা, অতিচেতনা, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনা ইত্যাদি। সাধারণত এই দুই বলয় সংযুক্ত থাকে কর্পাস কলোসাম (Corpus callosum) নামে স্নায়ুতন্তুর গোছা দ্বারা। কিন্তু এই সংযোগ যদি কোনো কারণে ছিন্ন হয়, তাহলে দুই বলয়ের স্বায়ত্তশাসনের রূপ পরিষ্কার বোঝা যায়। বিভক্ত ব্রেন (Split brain) রোগীরা দুই হাতে যে সব কাজ আগে করতে শিখেছিল, তা ক্রমান্বয়ে ভুলে যেতে থাকে। আর যে কাজ করতে দু'হাতের প্রয়োজন হয়, তা শেখা তাদের জন্যে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

ব্রেনের ১০০ বিলিয়ন নিউরোন আবার তিনটি গ্রুপে যথা সেনসরি, মটর ও এসোসিয়েশন সেন্টারে বিভক্ত। বাইরের আঘাত থেকে ব্রেন শক্ত খুলি দ্বারা রক্ষিত। এরপরও রয়েছে তিন স্তর বিশিষ্ট ঝিল্লির রক্ষা আবরণ। ঝিল্লির আবরণের ফাঁকে রয়েছে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড নামক তরল পদার্থ যা শক-অ্যাবসরবার হিসেবে কাজ করে। আবার বর্জ্য পদার্থ ধুয়ে নিয়ে যায়। এই ফ্লুইডের মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন ও স্নায়ুর জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি। এই ফ্লুইডই স্পাইনাল কর্ডকে পুষ্টি সরবরাহ ও রক্ষা করে। আর এই স্পাইনাল কর্ড ও ব্রেনের সমন্বয়েই গঠিত হয়েছে আপনার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম।

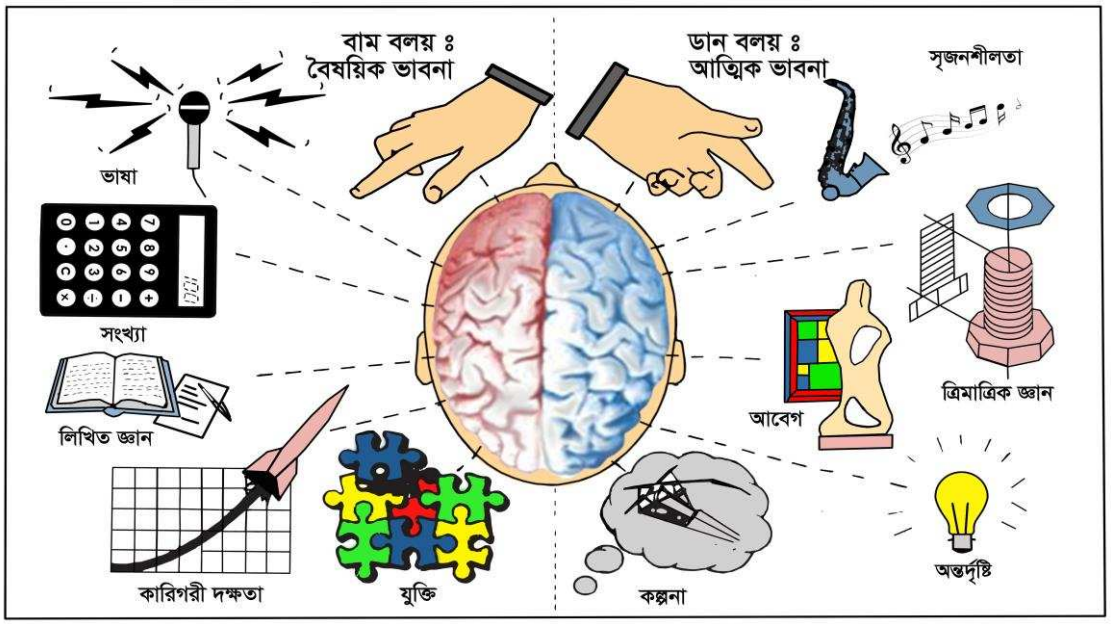

সেরিব্রাম

ব্রেনের সবচেয়ে বড় অংশ সেরিব্রাম। মাথার খুলির বেশিরভাগ জায়গাই দখল করে রয়েছে এটি।

সেরিব্রাম দুই ভাগে বিভক্ত। ডান ও বাম। এই দুই বলয় সাদা স্নায়ুর গোছা দ্বারা সংযুক্ত। সেরিব্রামের ভেতরের অংশ সাদা পদার্থ (White matter) দ্বারা গঠিত। এর ওপর রয়েছে ধূসর পদার্থের (Gray matter) আচ্ছাদন। একে বলা হয় সেরিব্রাল করটেক্স (Cerebral cortex)। পুরো সেরিব্রামই বিভিন্ন লোবে (Lobe) বিভক্ত। এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে খুলির হাড়ের নাম অনুসারে। সেরিব্রাল বলয়ের সাদা পদার্থের মাঝে রয়েছে ধূসর পদার্থের পিণ্ড। একে বলা হয় সেরিব্রাল নিউক্লি।

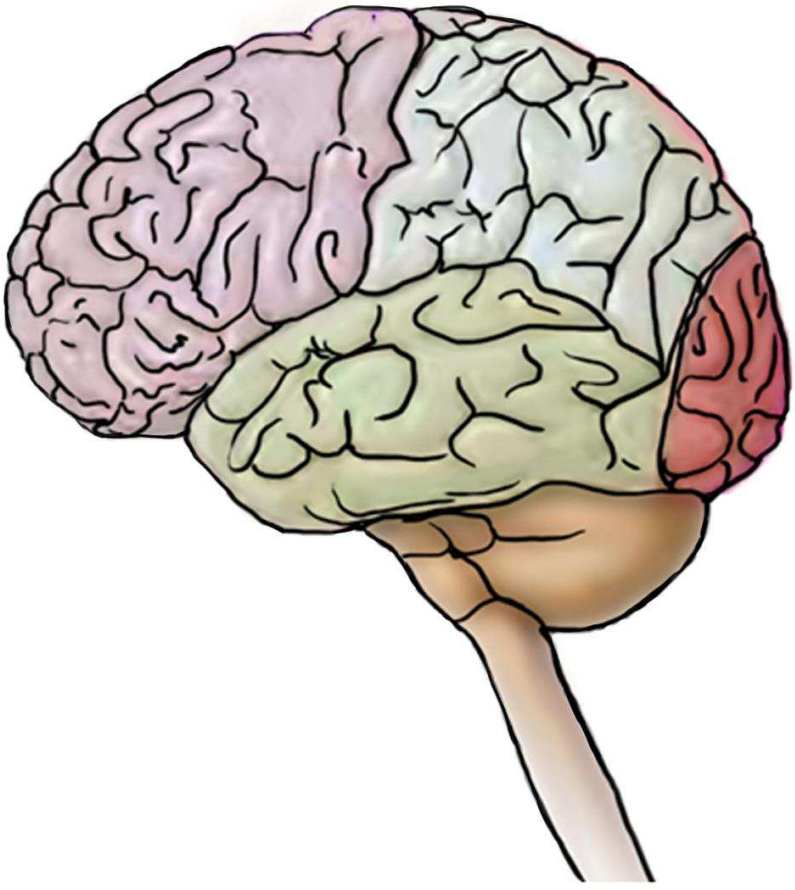

সেরিব্রাম

সেরিব্রামের দুই বলয় একে অপরের প্রতিবিম্ব নয়। বিভিন্ন বিষয় এরা পৃথক পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এরা পরস্পর সংযুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক। এক বলয়ে রক্ষিত 'স্মৃতি' অন্য বলয়ও প্রয়োজনে পেতে পারে। তাই সেরিব্রামের কোনো বলয়ের কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেই যে আপনার জীবন থেকে সে অংশের বিশেষ কার্যক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটবে, এমন কোনো কথা নেই।

সেরিব্রাম শরীরের বহু জটিল কাজ সম্পাদন করে। এই সব কাজ নিয়ন্ত্রণকারী সেরিব্রামের অংশগুলোকেও শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। মটর তৎপরতা (Motor activities) যেমন পেশি পরিচালন নিয়ন্ত্রিত হয় সেরিব্রামের সম্মুখ ভাগের নিকটে অবস্থিত করটেক্সের অভ্যন্তরস্থ নার্ভ সেন্টারসমূহ দ্বারা। সেরিব্রাল করটেক্সের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পেশিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এই মটর এলাকায় কোনো ক্ষতি হলে এর সাথে সংযুক্ত পেশি নিশ্চল হয়ে যাবে।

সেরিব্রাল করটেক্স-এর সেনসরি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ তথা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত তথ্যাবলি। সেরিব্রামের এই সেনসরি এলাকা না থাকলে একটা বস্তু কেমন তা দেখতে পেতেন না। ঠান্ডা না গরম তা-ও বুঝতে পারতেন না। কোনো আওয়াজ বা সুর শুনতে পেতেন না। আপনার সেরিব্রামের দুটো বলয়েই মটর ও সেনসরি এলাকা রয়েছে।

স্মৃতি, আবেগ ও বিচার বিশ্লেষণ সংযুক্ত রয়েছে পুরো সেরিব্রাল করটেক্স ও তৎসন্নিহিত এলাকায়। বলা হয়, স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে পুরো এলাকায়। তাই করটেক্সের অর্ধেক অপসারণ করা হলে মনে রাখার ক্ষমতা আনুপাতিক হারে কমে যেতে পারে, কিন্তু এটি কোনো সুনির্দিষ্ট স্মৃতিকে ধ্বংস করে দেয় না। কারণ করটেক্স স্মৃতিকে ধারণ করলেও এটি কম্পিউটারের মেমোরি ব্যাংকের মতো নয়। কম্পিউটারের মেমোরি ব্যাংকে একটি ইলেকট্রনিক সেলে পৃথক তথ্য জমা থাকে। আর করটেক্সে মেমোরি থাকে সর্বত্র ছড়িয়ে।

সেরিব্রাল করটেক্সে স্মৃতি বা মেমোরির স্থায়িত্ব গবেষকদের কাছেও বিস্ময়কর। দীর্ঘদিন মনে পড়ে নি এমন স্মৃতিও হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। 'রিমেম্ব্রেন্স অব থিংস পাস্ট'-এ মার্সেল প্রুস্ত চায়ে ভেজানো বিস্কুটের স্বাদ গ্রহণ করার সাথে সাথে স্মৃতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন।

অনেকেই কোনো সুগন্ধির গন্ধ নেয়া, কোনো কথা শোনা বা কোনো গানের কলি মনে আসার সাথে সাথে বহু বছর আগে ঘটা ঘটনা হুবহু স্মরণ করতে ও বর্ণনা করতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে বিখ্যাত কানাডিয়ান নিউরোসার্জন ড. ওয়াইল্ডার পেনফিল্ডের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে- স্মৃতিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়েও জীবন্ত করে তোলা যায়। ড. পেনফিল্ড এক মহিলা রোগীর ব্রেনে ইলেক্ট্রয়েড স্থাপন করে রোগীর স্নায়ুরোগের উৎস সন্ধান করছিলেন। ড. পেনফিল্ড এসময় অবাক হয়ে যান, রোগীর মুখে ছোটবেলার একটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনে। তিনি বিভিন্ন রোগীর ওপর তার গবেষণা চালিয়ে যান। তিনি দেখেন যে, ইলেক্ট্রয়েড দিয়ে সেরিব্রাল করটেক্সের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করার সাথে সাথে তারা দীর্ঘদিন ধরে ভুলে গিয়েছিল এমন গান হুবহু মনে করতে পেরেছে এবং এমন অভিজ্ঞতার হুবহু বিবরণ দিয়েছে, যা বহু আগেই বিস্মৃতির অতলে অপসৃত হয়েছিল।

সেরিব্রাল করটেক্সের এসোসিয়েশন এলাকায় রয়েছে মটর ও সেনসরি এলাকার স্নায়ুতন্তুর সংযোগকারী

তন্তুসমূহ। এই এসোসিয়েশন এলাকার কারণেই আপনি বর্তমান তথ্য ও অনুভূতির প্রেক্ষিতে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। সেরিব্রাল করটেক্সই অতীত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির আলোকে বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে উপযুক্ত ও কার্যকরী পদক্ষেপের নির্দেশ প্রদান করে। কল্পনার অবস্থানও এখানেই বলে অনুমান করা হয়। সেরিব্রামই মানুষকে আলাদা করেছে অন্য প্রাণী থেকে। এখানেই রয়েছে চিন্তাকেন্দ্র। যা অতীতকে মনে রাখে, বর্তমানকে উপলব্ধি করে, ভবিষ্যতকে বরণের প্রস্তুতি নেয়।

সেরিবেলাম

ব্রেনের এ অংশকে বলা হয় লঘু মস্তিষ্ক। এটি সেরিব্রামের অক্সিপিটাল লোব (Occipital lobe)-এর নিচে অবস্থিত। সেরিব্রামের মতো সেরিবেলামও ধূসর পদার্থের বেষ্টনীর মধ্যে সাদা পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত। সাদা পদার্থের অভ্যন্তরে আবার রয়েছে ধুসর পদার্থ এলাকা। একে বলা হয় সেরিবেলাম নিউক্লি। এখানে রয়েছে দুটি বলয়। এই দুই বলয় সংযুক্ত হয়েছে ভেরমিস (Vermis) দ্বারা।

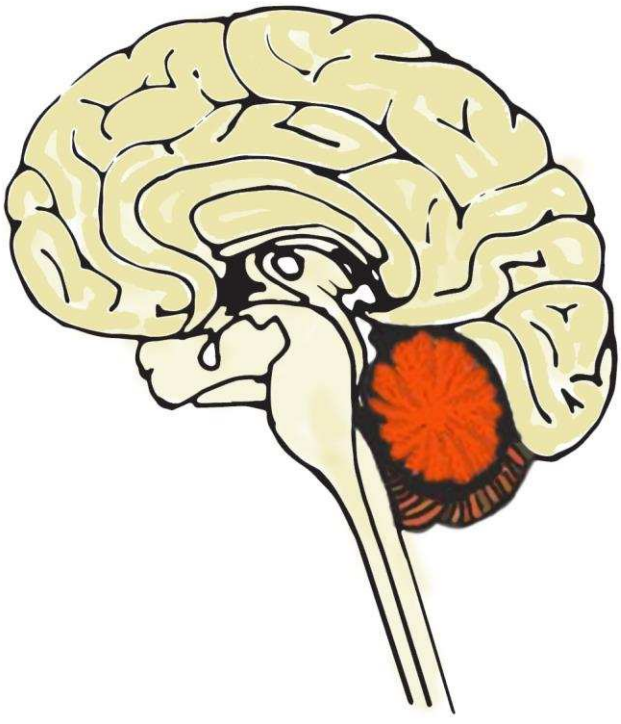

সেরিবেলাম

সেরিবেলাম পেশির গতি নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করে। এর ফলে সমন্বয় সাধিত হয় প্রতিটি ভঙ্গির মাঝে। আপনি অনায়াসে নাকে চাপ দিয়ে সর্দি রুমালে মোছার মতো কাজগুলো করতে পারেন। সেরিবেলামের সাদা

পদার্থের মধ্যে রয়েছে স্নায়ুতন্তুর গোছা। এই স্নায়ুগুলো পেশি ও কানে অবস্থিত ভারসাম্যস্থাপক অঙ্গ থেকে সেনসরি বার্তা সেরিবেলামে পৌঁছায়। তবে বহির্মুখী স্নায়ুতন্তুগুলো এখান থেকে সরাসরি সাড়া প্রদানকারী অঙ্গে যায় না, বরং এগুলোও এসোসিয়েশন সেন্টার ঘুরে যায়। ফলে আপনার তৎপরতা সচেতন হস্তক্ষেপ ছাড়াই সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত হয়। সেরিবেলাম না থাকলে আপনার গতি ও তৎপরতা সুষম ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে হতো ঝুঁকিপূর্ণ হঠাৎ হঠাৎ। সেরিবেলাম ক্ষতিগ্রস্ত হলে পেশি তৎপরতায় ঘটে সমন্বয়ের অভাব।

ব্রেন স্টেম

ব্রেন স্টেম (Brain stem) ব্রেনের উচ্চতর কেন্দ্রগুলোকে সংযুক্ত করেছে স্পাইনাল কর্ডের সাথে। এর প্রধান অঙ্গগুলো হচ্ছে মেডুলা অবলঙ্গাটা (Medula oblongata), পনস (Pons), মিড-ব্রেন (Mid-Brain), থ্যালামাস (Thalamus) এবং হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus)।

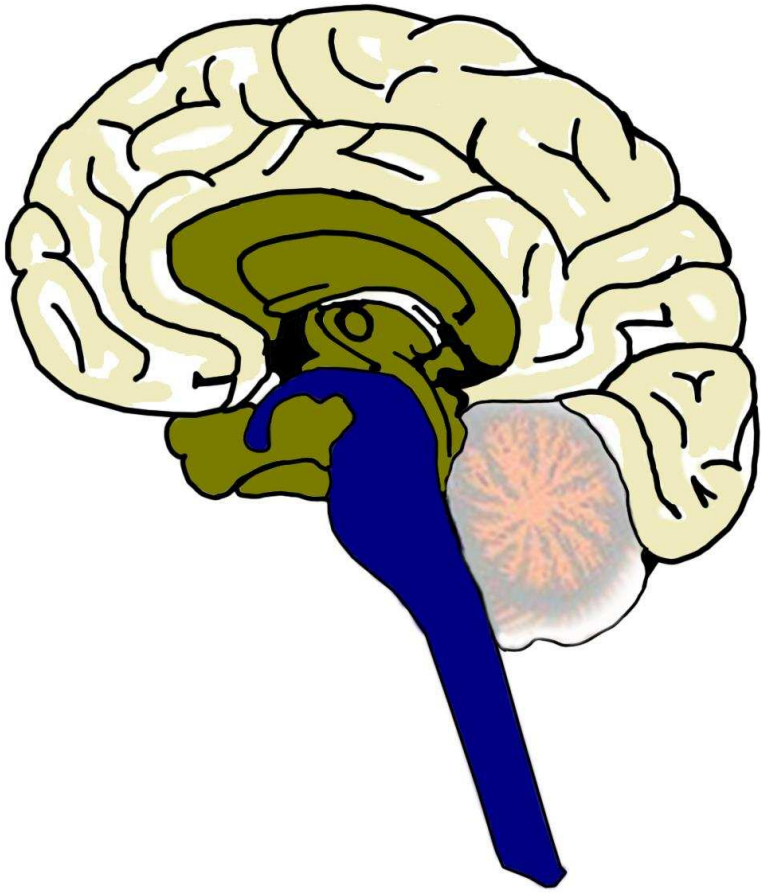

ব্রেন স্টেম

মেডুলা অবলঙ্গাটা

মেডুলার সাদা পদার্থের অভ্যন্তরে রয়েছে ধূসর পদার্থ। মাথা, গলা ও কাঁধের সকল সচেতন তৎপরতা নিয়ন্ত্রণকারী চারটি ক্রানিয়াল নার্ভকেন্দ্র এখানে অবস্থিত। মেডুলার অভ্যন্তরে রয়েছে আরো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহ। কার্ডিয়াক কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করে হার্ট বিট। ভাসো কনস্ট্রিকটর কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করে রক্তবাহী নালীর পরিধি। শ্বাসকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করে দমের হার ও দমের গভীরতা। আরো বিভিন্ন কেন্দ্র রয়েছে যা গলাধঃকরণ, বমি, পাকস্থলীর তৎপরতা এবং হজমকারী জারক নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সব ধরণের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়ার (Involuntary reflex action) উৎস হচ্ছে মেডুলা।

মিড-ব্রেন

মিড-ব্রেন ওপরের সেরিব্রামের সাথে নিচের সেরিবেলাম ও পনসের (Pons) সাথে সংযোগ সাধন করেছে। দেখতে এটাও মেডুলা ও পনসের মতোই। এখানেও রয়েছে স্নায়ুতন্তুর গোছা, যা ব্রেন থেকে নিচের স্পাইনাল কর্ডে নেমে গেছে এবং ওপরে সেরিব্রাল করটেক্সে উঠে গেছে। দুটি ক্রানিয়াল নার্ভের উৎস এখানে। এখানে অবস্থিত কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনায় (Corpora quadrigemina) রয়েছে দর্শন ও শ্রবণ সমন্বয়কেন্দ্র। ব্রেনের এই অংশ কোন দিক থেকে একটা বিশেষ শব্দ আসছে তা নিরূপণ করে দেয়।

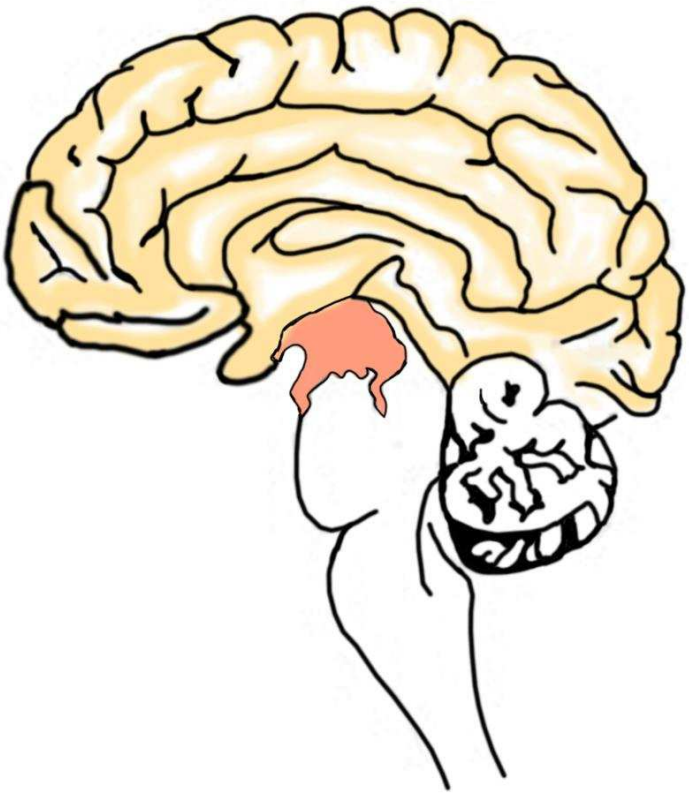

মিড ব্রেন

থ্যালামাস

থ্যালামাস মিড-ব্রেনের একটু ওপরে সাদা পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত ধূসর পদার্থ। এটি হচ্ছে একটি প্রধান রিলে কেন্দ্র। ব্রেনের নিম্ন এলাকা এবং স্পাইনাল কর্ড থেকে আসা প্রতিটি মেসেজ এখানে প্রক্রিয়াজাত হয়ে সেরিব্রাল করটেক্সে প্রেরিত হয়।

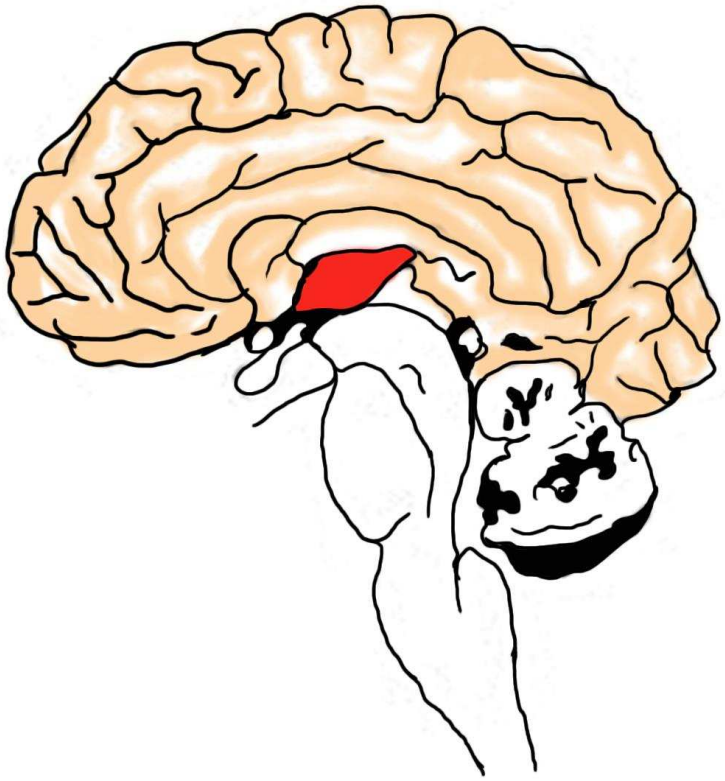

থ্যালামাস

হাইপোথ্যালামাস

থ্যালামাসের নিচেই হাইপোথ্যালামাস অবস্থিত। হাইপোথ্যালামাস ব্রেনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটি পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের সাথে মিলিতভাবে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত বেঁচে থাকার উপযোগী প্রাণরাসায়নিক পরিবেশের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। হাইপোথ্যালামাস দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকা নিশ্চিত করে। কারণ হাইপোথ্যালামাস তাপমাত্রার যে-কোনো ওঠানামার ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। ক্ষুধার ব্যথা ও তাড়নার ব্যাপারে সংবেদনশীল হওয়ার কারণে এটি খাবার গ্রহণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এতে অবস্থিত তৃষ্ণাকেন্দ্র রক্তে পানির পরিমাণ নিরূপণে বেশ সংবেদনশীল। তাই শরীরে পানির প্রয়োজন হলেই তৃষ্ণা অনুভূত হয়। ঘুম ও জাগৃতির প্যাটার্ন এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। হার্ট বিট, অন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণ ও মূত্রথলি শূন্যকরণ প্রক্রিয়া

এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়।

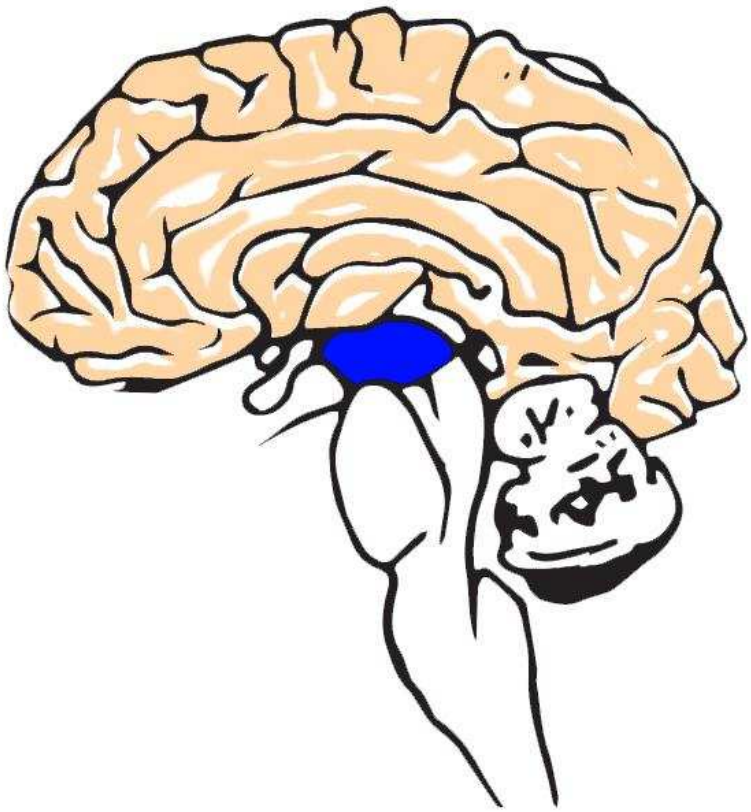

হাইপোথ্যালামাস

নার্ভাস সিস্টেম ও এন্ডোক্রাইন সিস্টেম অর্থাৎ শরীরের স্নায়ুভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও হরমোনভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস। কোনো দৈহিক প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ হলেই হাইপোথ্যালামাস রাসায়নিক নিঃসরণের মাধ্যমে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে সক্রিয় করে তোলে। পস্টেরিয়র পিটুইটারি রক্তে দুটি হরমোন ছাড়ে, যা আসলে তৈরি হয় হাইপোথ্যালামাসে। অক্সিটসিন (Oxytocin) গর্ভবতীর রক্তে প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ হলেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা করে। স্তনে দুধ উৎপাদনের পেছনেও এই হরমোনের ভূমিকাই মুখ্য। এন্টিডায়োরেটিক (Antidiuretic) হরমোন শরীর থেকে কিডনির মাধ্যমে যাতে অতিরিক্ত পানি নিঃসরণ না হয় তা নিশ্চিত করে। দুটি হরমোনই তৈরি হয় হাইপোথ্যালামাসে।

হাইপোথ্যালামাসের নির্দেশে এন্টিরিয়র পিটুইটারি ছয়টি পৃথক হরমোন নিঃসরণ করে। এগুলোর বেশিরভাগই অন্যান্য গ্ল্যান্ডকে তাদের নিজস্ব হরমোন উৎপাদন বা উৎপাদন বন্ধের নির্দেশ দেয়। প্রোল্যাকটিন দুধের ক্ষরণ ঘটায় এবং গ্রোথ হরমোন সেল বিভক্তি, হাড় বৃদ্ধি ও প্রোটিন সিনথেসিস ঘটায়। এ দুটি হরমোন সরাসরি শরীরের টিস্যুতে ক্রিয়া করে।

আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী লিমবিক সিস্টেম (Limbic system) এর অংশও হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস। থ্যালামাসের অংশ বিশেষ, হিপ্পোক্যাম্পাস (Hippocampus) ও ব্রেন স্টেমের সাথে সংযুক্ত এলাকার সাহায্যে হাইপোথ্যালামাস আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। বলা যেতে পারে- মন ও দেহের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে হাইপোথ্যালামাস। এখানেই আবেগের যে-কোনো পরিবর্তন লিপিবদ্ধ হয় এবং তা দৈহিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। যেমন আপনি সামনে দেখলেন একটি গোখরা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। সাথে সাথে আপনি যে অনুভূতি লিপিবদ্ধ করলেন তা হচ্ছে ভয়। আর এই ভয়ের প্রকাশ ঘটতে পারে হার্ট বিট বৃদ্ধি, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে শরীর ঘেমে গিয়ে আর্তচিৎকারের মাধ্যমে। হাইপোথ্যালামাসের মাধ্যমেই আবেগ দেহের ওপর ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

সেনসরি অর্গান

ব্রেনের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। বাইরের কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে ইন্দ্রিয় আপনাকে অবহিত করলেই আপনি তা অনুভব করেন। ইন্দ্রিয় আপনাকে যা অনুভূত করাচ্ছে, তা হচ্ছে পরিবর্তন। আপনি যদি বিশেষ কোনো অনুভূতিতে অভ্যস্ত হয়ে যান, যেমন গায়ে কাপড় বা মাথায় টুপির অবস্থিতির ওজন। তাহলে তা আপনি কখনো সচেতনভাবে অনুভব করেন না। তখন আপনার অনুভূতি এর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু এই অবস্থায় কোনো পরিবর্তন হলে দেহের প্রাণরাসায়নিক ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে দেহকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হয়।

দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে ব্রেনে প্রেরণ করে। আপনি আপনার ইন্দ্রিয়ে কিছুই অনুভব করেন না। ইন্দ্রিয় শুধু স্নায়ুর মাধ্যমে তরঙ্গাকারে ব্রেনে তথ্য প্রেরণ করে। ব্রেন এই তথ্যের প্রকৃতি নিরূপণ করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ চোখের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ব্যাখ্যা করে দেখা যেতে পারে। যখন আলো চোখে প্রবেশ করে তখন তা রেটিনাতে অবস্থিত রড ও কোণগুলোয় আঘাত করে। আলো আঘাত করলে রড ও কোণে অবস্থিত রঞ্জক পদার্থ রাসায়নিকভাবে ভেঙে যায়। এই ভাঙনের ফলে স্নায়ুতরঙ্গ সৃষ্টি হয়, যা অপটিক নার্ভের মাধ্যমে সেরিব্রাল করটেক্সে দৃষ্টিনির্ভর তথ্য পৌঁছে দেয়। আপনি যা দেখছেন তা হচ্ছে অপটিক নার্ভের মাধ্যমে পাওয়া স্নায়ুতরঙ্গ সম্পর্কে ব্রেনের ব্যাখ্যা- আপনার দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোনো বস্তুর ওপর আলোর প্রতিফলন থেকে পাওয়া তথ্যের সাজানো রূপ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে ১২ জোড়া ক্র্যানিয়াল নার্ভ রয়েছে। এর মধ্যে ১০ জোড়ার উৎপত্তি হচ্ছে ব্রেন স্টেম থেকে। মটর নার্ভ গিয়েছে ব্রেন থেকে পেশি বা গ্ল্যান্ডে। সেনসরি নার্ভ তথ্য ব্রেনে নিয়ে যায়। আর মিশ্রিত নার্ভে রয়েছে সেনসরি ও মোটর তন্তু। ক্র্যানিয়াল নার্ভ যেহেতু সচেতন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে তাই এর কোনো ক্ষতি দেহের কিছু নির্দিষ্ট পেশি ব্যবহারে আপনার সামর্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত

করবে।

ব্রেন ও দেহের মধ্যে যোগাযোগ

দেহের সবগুলো ইন্দ্রিয় হয় ব্রেন বা স্পাইনাল কর্ডের সাথে স্নায়ুতন্তু দ্বারা সংযুক্ত। যখন কোনো ইন্দ্রিয় কোনো তথ্য পায় তখন স্নায়ুতন্তুতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করে। স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে এই তরঙ্গ গন্তব্যে যাত্রা করে। কখনো তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ইচ্ছানিরপেক্ষ ক্রিয়ার (Reflex action) মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করে আবার কখনো সচেতনভাবে ব্রেন তা অনুভব করে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ব্রেনে প্রতিনিয়ত এত বিপুল পরিমাণ তথ্য যাচ্ছে যে, সে সম্পর্কে সচেতন থাকাও সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও পড়ে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা পরিবর্তিত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সচেতনভাবে কিছু করার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের তথ্য কখনো সচেতন স্তরে পৌঁছায় না। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

নার্ভাস সিস্টেম

নার্ভাস সিস্টেম বলে পরিচিত দেহাভ্যন্তরের যোগাযোগ পদ্ধতি আসলে একাধিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সংযুক্ত রূপ।

১. সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (Central nervous system) ব্রেন ও স্পাইনাল কর্ডের সমন্বয়ে গঠিত।

২. পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম (Peripheral nervous systym) সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ও দেহের অঙ্গ ও পেশির সাথে যোগাযোগ স্থাপনকারী স্নায়ুসমূহ নিয়ে গঠিত।

৩. অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের একটা অংশ। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম আপনার সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের কার্যাবলি মনিটর ও নিয়ন্ত্রণ করে। এটি আবার দুইভাগে বিভক্ত- প্যারাসিম্পেথেটিক ব্রাঞ্চ এবং সিম্পেথেটিক ব্রাঞ্চ (Parasympathetic branch and Sympathetic branch)। প্যারাসিম্পেথেটিক ব্রাঞ্চ সাধারণ বিশ্রাম ও দেহের পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। আর সিম্পেথেটিক ব্রাঞ্চ জরুরি- যেমন মারো অথবা পালাও (Fight or Flight) কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। উভয় কাজই পরিচালিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার সচেতনতার অজ্ঞাতসারে।

এন্ডোক্রাইন সিস্টেম

যে-কোনো অবস্থায় দ্রুত সাড়া দিতে পারাটাই নার্ভাস সিস্টেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম (Endocrine system) ধীরে ও সময় নিয়ে সম্পন্ন করতে হয় এমন কাজই করে। এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলো হরমোন উৎপাদন করে এবং রক্তে ছেড়ে দেয় এবং রক্তের মাধ্যমেই তা শরীরের সর্বত্র প্রেরণ

করে। যখনই এই হরমোন তার গন্তব্যে পৌঁছায় তখন তা সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের কারণ হয়। স্নায়ুতরঙ্গ দ্বারা প্রেরিত বার্তার চেয়ে হরমোনের ক্রিয়া হয় ধীরে। দৈহিক বৃদ্ধি, সাবালকত্ব অর্জন ও প্রজনন প্রক্রিয়ার মতো দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় হরমোন দ্বারা।

হরমোন উৎপাদন সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণের জন্যে রয়েছে চমৎকার ফিডব্যাক প্রক্রিয়া। যা পরিচিত বায়োফিডব্যাক লুপ (Biofeedback loop) নামে। এর কার্যকারিতা গড়ে উঠেছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ও হাইপোথ্যালামাসের মাঝে স্থাপিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড অন্যান্য গ্ল্যান্ডগুলোকে প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপাদনের নির্দেশ পাঠালেও এটি সক্রিয় হয়ে ওঠে হাইপোথ্যালামাস প্রেরিত স্নায়ুসংকেত দ্বারা।

নিউরোন

ব্রেন ও নার্ভাস সিস্টেম গঠিত হয়েছে কোটি কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউরোন সেল দ্বারা। নিউরোনই হচ্ছে ব্রেনের ক্ষুদ্রতম একক। এর আকার আকৃতি নির্ভর করে এর অবস্থান ও দায়িত্বের ওপর। তবে প্রত্যেক নিউরোনেরই রয়েছে একটি নিউক্লিয়াস ও তার চারপাশে বেষ্টিত সেল দেহ। আর এ নিউরোন সেল থেকে তারের মতো চারদিকে চলে গিয়েছে অসংখ্য স্নায়ুতন্তু যা পরিচিত এক্সন (Axon) ও ডেনড্রাইট (Dendrite) নামে। নিউরোন মূলত তিন ভাগে বিভক্ত।

নিউরোন

১. সেনসরি নিউরোন: এটি ইন্দ্রিয় থেকে বা রিসিপ্টর থেকে ব্রেন বা স্পাইনাল কর্ডে তথ্য বয়ে নিয়ে আসে।

২. মটর নিউরোন: এটি ব্রেন ও স্পাইনাল কর্ড থেকে তথ্য ও নির্দেশ নিয়ে গ্ল্যান্ড ও পেশিতে পৌঁছে দেয়। এরা পেশি ও অঙ্গগুলোকে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. এসোসিয়েশন নিউরোন: এটি ব্রেন ও স্পাইনাল কর্ডে অবস্থান করে সেনসরি ও মটর নিউরোনের মাঝে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে।

বেশিরভাগ নিউরোনই পাওয়া গেছে ব্রেন ও স্পাইনাল কর্ডে। কিন্তু এদের তন্তুগুলো হতে পারে অনেক লম্বা। যেমন স্পাইনাল কর্ড থেকে পায়ের আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে তন্তু। প্রতিটি অঙ্গ ও পেশিতে গিয়ে পৌঁছেছে এই তন্তু। শত শত তন্তু একত্রে গোছার আকার ধারণ করে স্নায়ু বা নার্ভ গঠন করে।

তথ্যপ্রেরণ

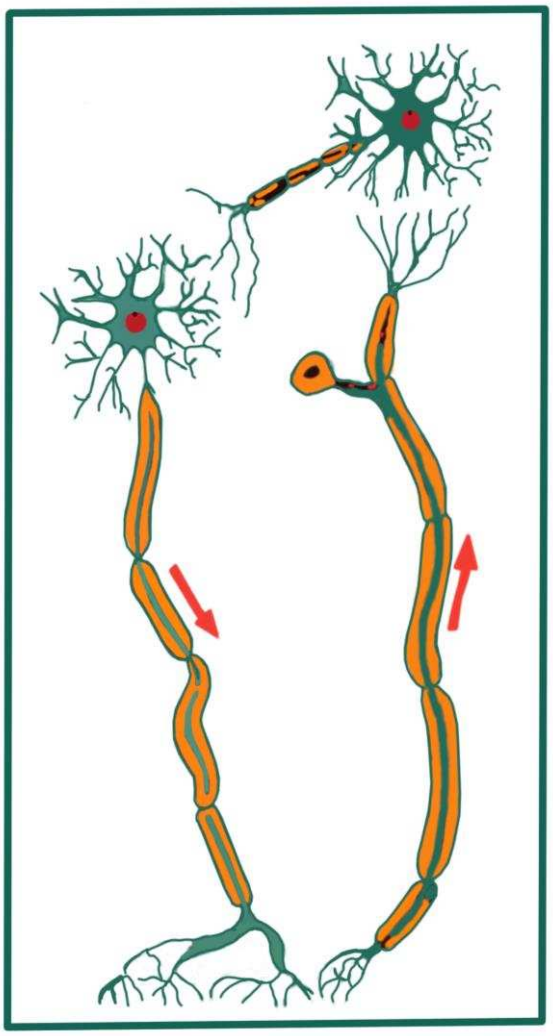

তথ্য প্রেরণ

স্নায়ুতন্তু ব্রেনের সাথে, পেশির সাথে, গ্ল্যান্ডের সাথে এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু তারা একে অপরকে স্পর্শ করে না। নিউরোনের এক্সন (যে তন্তু নিউরোন থেকে তথ্য প্রেরণ করে, তাকে এক্সন বলে) এবং অন্য নিউরোনের ডেনড্রাইট (যে তন্তু তথ্য গ্রহণ করে, তাকে ডেনড্রাইট বলে)-এর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ফাঁক থাকে। একে বলে সিন্যাপস। যখন স্নায়ুতে বৈদ্যুতিক চার্জ গঠিত হয় তখন এক নিউরোন থেকে অপর নিউরোনে অথবা পেশিতে তথ্য প্রেরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। একটা বৈদ্যুতিক স্নায়ুসংকেত নিউরোনের এক্সন দিয়ে যাত্রা শুরু করে সিন্যাপস পর্যন্ত পৌঁছায়। সিন্যাপস নবে পৌঁছানোর সাথে সাথে সেখান থেকে একটি নিউরোট্রান্সমিটার নামে রাসায়নিক অণু ছুটে যায়। এই নিউরোট্রান্সমিটার পরবর্তী নিউরোনের ডেনড্রাইট বা পেশিতে পৌঁছে তথ্য প্রদান অব্যাহত রাখে। এভাবেই চলে দেহাভ্যন্তরে তথ্য আদান-প্রদানের রিলে। স্নায়ুতন্তু দিয়ে তথ্য প্রতিঘণ্টায় ২২৫ মাইল গতিতে ভ্রমণ করে। একটি সংকেত ব্রেন থেকে পায়ে পৌঁছুতে লাগে সেকেন্ডের ৫০ ভাগের ১ ভাগ সময়। তথ্য ইন্দ্রিয় থেকে ব্রেনে যাক, ব্রেনের এক সেল থেকে অন্য সেলে যাক বা নার্ভাস সিস্টেম থেকে পেশিতে যাক, তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের প্রক্রিয়া একই রকম।

নিউরোট্রান্সমিটার : অদম্য রানার

ব্রেন সংক্রান্ত এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা শেষ করতে পারি একটি গল্প দিয়ে। ইনকাদের গল্প। ইনকাদের দুর্গ শহর মাচু পিচ্চু-তে পৌঁছানো ছিল এক দুঃসাধ্য কাজ। আন্দিজ পর্বতমালার ১৬ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত গিরিপথ অতিক্রম করতে হতো প্রথমে। অক্সিজেনের স্বল্পতা সেখানে যে-কারো মাথা ঝিমঝিম করা বা মাথা ঘোরার জন্যে যথেষ্ট, আবার মেঘের ওপরে শহর দেখা যাওয়ার পরও পাথরের তৈরি তিন হাজারটি ধাপ অতিক্রম করেই পৌঁছা সম্ভব হতো শহরের গেটে।

ভাবলে অবাক হতে হয় এই রাজধানীর সাথে দুই হাজার মাইলব্যাপী ইনকা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রামের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত রানাররা (Runner)। এরা খালি পায়েই দৌড়াতে পারত দীর্ঘ পথ। কখনো কখনো এরা প্রতিদিন দৌড়াতো ৫০ থেকে ৭৫ মাইল পর্যন্ত-ম্যারাথন দৌড়ের ২/৩ গুণ। কখনো কখনো তাদের পথ শুরু হতো পর্বত চূড়া থেকে। উঠতে হতো মাইলখানেক ওপরে। এদের কষ্ট সহ্য ক্ষমতা ও গতি এককথায় বলা যেতে পারে অতিমানবিক। এরাই ছিল সম্রাট আতাহুলপার চোখ এবং কান। স্প্যানিশ লুটেরাদের আক্রমণ অভিযানে আগমনের কথা এই পরিশ্রমী ও অতি কষ্টসহিষ্ণু রানাররা এসে সম্রাটকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু আক্রমণ মোকাবেলায় সম্রাটের কোনো সুসংহত প্রস্তুতি ছিল না। তাই ১৫৩২ সালে ইনকাদের এই রাজধানীর পতন ঘটে। বিশ্বাসঘাতকতার পন্থা অবলম্বন করে স্প্যানিশ লুণ্ঠনকারীদের নেতা পিজারো সম্রাট আতাহুয়ালপাকে অপহরণ করে বিপুল ধনরত্ন মুক্তিপণ আদায় করার পর হত্যা করে। ইনকা সভ্যতার পতন ঘটে।

আপনি যদি ব্রেনকে আন্দিজ পর্বতমালার শীর্ষে অবস্থিত মাচু পিচ্চু দুর্গ ভাবেন, তাহলে দেখবেন যে, এরও রয়েছে অসংখ্য পরিশ্রমী রানার। যারা নিরলসভাবে দেহ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দূরবর্তী প্রান্ত থেকে বাণী বহন করে ব্রেনে পৌঁছাচ্ছে এবং ব্রেন থেকে কমান্ড পৌঁছে দিচ্ছে পায়ের আঙুলের মতো দূরবর্তী প্রান্তে। এই রানাররা হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিটার অণু। এই নিউরোট্রান্সমিটার অণুগুলো প্রতিটি দেহকোষের জীবনকে প্রভাবিত করছে। ব্রেনের সকল চিন্তা, আশা, স্বপ্ন, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, করণীয়, বর্জনীয় সকল নির্দেশ প্রতিটি সেলে পৌঁছে দিচ্ছে এই নিউরোট্রান্সমিটার। আবার দেহাভ্যন্তরের ও পারিপার্শ্বিকতার সকল তথ্য ব্রেনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এই নিউরোট্রান্সমিটার। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ৫০ ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার শনাক্ত করেছেন।

এত চমৎকার ব্যবস্থা থাকতেও দেহ কখনো কখনো কেন রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়, কেন পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ বা সাফল্য অব্যাহত রাখতে পারে না?

এ প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করা যেতে পারে-ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপা এত নিবেদিতপ্রাণ রানারদের আগাম সতর্কবাণীর পরও কেন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন? জবাব একটাই-সুসংহত মানসিক প্রস্তুতির অভাব। আমরা জানি মনের শক্তির অসীমতা। আমরা জানি বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তথ্য অবিনাশী। দেহকোষ মরে যায়। কিন্তু এর অভ্যন্তরের তথ্য ডিএনএ বেঁচে থাকে নতুন দেহকোষে। চিন্তা সর্বত্রগামী। আবার চিন্তার রয়েছে বস্তুগত ভিত্তি। (কারণ প্রতিটি নিউরোট্রান্সমিটার এক একটি বিশেষ ধরনের চিন্তা বা তথ্যকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। আর নিউরোট্রান্সমিটার একটি বিশেষ ধরনের রাসায়নিক অণু।) তাই মন ও চিন্তার শক্তি সবকিছুকেই প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। যদি আমরা মন ও চিন্তার শক্তিকে সৃজনশীল ও ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করতে পারি, সুসংহত মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি, তাহলে চিন্তা যেমন বস্তু সৃষ্টি করছে, চিন্তা তেমনি সুখ ও সাফল্য সৃষ্টি করবে।

অধ্যায়-৪

দৃষ্টিভঙ্গি : নেপথ্যনায়ক

মস্তিষ্করূপী বিস্ময়কর জৈব কম্পিউটার যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্যে প্রয়োজন সুসংহত মানসিক প্রস্তুতি। আর মানসিক প্রস্তুতির ভিত্তি হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়ত বা অভিপ্রায়। কারণ মন পরিচালিত হয় দৃষ্টিভঙ্গি বা নিয়ত দ্বারা। আর মস্তিষ্ককে চালায় মন। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা করেছেন মন ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক নিয়ে। ড. অ্যালেন গোল্ডস্টেইন, ড. জন মটিল, ড. ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড ও ড. ই রয় জন দীর্ঘ গবেষণার পর বলেছেন, একজন প্রোগ্রামার যেভাবে কম্পিউটারকে পরিচালিত করে, তেমনি মন মস্তিষ্ককে পরিচালিত করে। মস্তিষ্ক হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর মন হচ্ছে সফটওয়্যার। নতুন তথ্য ও নতুন বিশ্বাস মস্তিষ্কের নিউরোনে নতুন ডেনড্রাইট সৃষ্টি করে। নতুন সিন্যাপসের মাধ্যমে তৈরি হয় সংযোগের নতুন রাস্তা। বদলে যায় মস্তিষ্কের কর্মপ্রবাহের প্যাটার্ন। মস্তিষ্ক তখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নতুন বাস্তবতা উপহার দেয়। নতুন বাস্তবতা ভালো হবে না খারাপ হবে, কল্যাণকর হবে না ক্ষতিকর তা নির্ভর করে মস্তিষ্কে দেয়া তথ্য বা প্রোগ্রামের ভালো-মন্দের ওপর। কল্যাণকর তথ্য ও বিশ্বাস কল্যাণকর বাস্তবতা সৃষ্টি করে আর ক্ষতিকর তথ্য বা বিশ্বাস ক্ষতিকর বাস্তবতা উপহার দেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, জীবনের নতুন বাস্তবতার চাবিকাঠি হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি বা নিয়ত।

বিজ্ঞানীরা বলেন দৃষ্টিভঙ্গি দুধরনের। এক. প্রো-অ্যাকটিভ। দুই. রি-অ্যাকটিভ। প্রো-অ্যাকটিভ অর্থ হচ্ছে যে-কোনো পরিস্থিতিতে উত্তেজিত বা আবেগপ্রবণ না হয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রো-অ্যাকটিভ অর্থ হচ্ছে অন্যের কাজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কোনো কাজ বা আচরণ না করা। সর্বাবস্থায় নিজের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আচরণ ও কর্মপন্থা অবলম্বন করা। প্রো-অ্যাকটিভ অর্থ হচ্ছে, কী কী নেই তা নিয়ে হা-হুতাশ না করে যা আছে তা নিয়েই সুপরিকল্পিতভাবে কাজ শুরু করা। প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় সাফল্য ও বিজয় ছিনিয়ে আনে।

অপরদিকে রি-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় ব্যর্থতা, হতাশা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। রি-অ্যাকটিভ হলে নিয়ন্ত্রণ তখন নিজের হাতে থাকে না। নিয়ন্ত্রণ চলে যায় অন্যের হাতে। আপনি যখন অন্যের কথায় কষ্ট পান, অন্যের কথায় রেগে যান, অন্যের আচরণে ক্রোধে ফেটে পড়েন, অন্যের তোষামোদিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, অন্যের চাটুকারিতায় গলে যান, অন্যের কথায় নাচেন, তখন নিয়ন্ত্রণ আর আপনার হাতে থাকে না। নিয়ন্ত্রণ চলে যায় অন্যের হাতে। রি-অ্যাকটিভ হলে, নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে চলে গেলে পরিণতি কী হয়, তা দুইটি অতি প্রচলিত গল্প থেকে আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারি।

বাবা, ছেলে ও গাধার গল্প

বাবা ও ছেলে বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ির পোষা গাধাটিকে বিক্রি করার জন্যে হাটের পথে যাত্রা শুরু করল। বাবা, ছেলে ও গাধা তিনজনই হেঁটে যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর তাদেরকে দেখে একজন বলল, লোক দুটি কী বোকা! গাধা থাকতে হেঁটে যাচ্ছে। একজন তো গাধার পিঠে উঠে আরাম করে যেতে পারে। বাবা ছেলেকে গাধার পিঠে উঠিয়ে দিলেন। ছেলে গাধার পিঠে আর বাবা হেঁটে চলছেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আরেকজন বলল, কী বেয়াদব ছেলে! নিজে গাধার পিঠে আরাম করে যাচ্ছে আর বুড়ো বাপকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এ মন্তব্য শোনার পর বাবা ও ছেলে স্থান পরিবর্তন করল। বাবা গাধার পিঠে আর ছেলে হেঁটে। আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আরেক ব্যক্তি মন্তব্য করল, কী নিষ্ঠুর পিতা! নিজে গাধার পিঠে আরাম করছে আর মাসুম বাচ্চাটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ মন্তব্য শোনার পর বাবা ও ছেলে দুজনই গাধার পিঠে উঠল। গাধা চলতে শুরু করল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একজন পশু প্রেমিকের নজরে পড়ল তারা। পশু প্রেমিক তাদের দেখে আক্ষেপ করে বলতে শুরু করল, কী অত্যাচার! কী অবিচার! একটি গাধা তার ওপর দুটি লোক!

বাবা ও ছেলে পড়ল মহা সমস্যায়। কী মুশকিল! গাধার সাথে হেঁটে গেলে দোষ। ছেলে উঠলে দোষ! বাবা উঠলে দোষ! দুজন উঠলে দোষ! এখন কী করা যায়? বাবা-ছেলে দুজন মিলে এক নতুন বুদ্ধি বের করল। বাঁশ ও রশি জোগাড় করল। গাধার চার পা ভালো করে বাঁধল। তারপর পায়ের ফাঁক দিয়ে বাঁশ ঢুকিয়ে দিল। বাবা সামনে আর ছেলে পেছনে বাঁশ কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। গাধা রইল ঝুলে।

গাধাকে কাঁধে নিয়ে পুল পার হওয়ার সময় গাধা ভয় পেয়ে চিৎকার করে নড়ে উঠল। বাবা, ছেলে ও গাধা পড়ে গেল খালে। গাধার মেরুদণ্ড ভাঙল। বাবা ও ছেলের ভাঙল পা। গাধা আর বেচা হলো না। বাবা ও ছেলে আহত অবস্থায় ফিরে এল ঘরে।

পণ্ডিত মশাই ও পাঁঠার গল্প

সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত মশাইয়ের ইচ্ছে হলো পাঁঠার মাংস খাবেন। পাঁজি পুঁথি দেখে দিনক্ষণ গণনা শেষে শুভ মুহূর্ত নিরূপণ করে যাত্রা করলেন হাটে। হাটে গিয়ে নাদুসনুদুস পাঁঠা পেয়ে গেলেন একটা। পণ্ডিত মশাই খাবেন তাই বিক্রেতা দামও একটু কমিয়ে রাখল। কম দামে নাদুসনুদুস পাঁঠা পেয়ে মনের আনন্দে পণ্ডিত মশাই পাঁঠাটিকে কাঁধে উঠিয়ে বাড়ির পথে ফিরছেন। পণ্ডিত মশাইয়ের কাঁধে নাদুসনুদুস পাঁঠা দেখে রাস্তায় প্রতারণার উদ্দেশ্যে অপেক্ষমাণ পাঁচ ঠগ মুহূর্তে বুদ্ধি স্থির করে ফেলল। বেশ খানিকটা দূরত্ব নিয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করতে লাগল।

পণ্ডিত মশাই প্রথম ঠগের কাছাকাছি যেতেই ঠগ এগিয়ে এসে পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম করে বলল, ঠাকুর!

আপনার মতো সজ্জন ব্রাহ্মণ এই গ্রামে কেউ নেই। কিন্তু আপনার কাঁধে কুকুর কেন! পণ্ডিত মশাই রেগে গেলেন তার কথায়। বললেন, কুকুর কোথায়, এটা তো পাঁঠা।

প্রথম ঠগকে ফেলে পণ্ডিত মশাই এগিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় ঠগের কাছে আসতেই সে এগিয়ে প্রণাম করে বলল, ঠাকুর! আপনার মতো সজ্জন ব্রাহ্মণ এই ইউনিয়নে নেই। কিন্তু আপনি কুকুর কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন কেন!

পণ্ডিত মশাই তার প্রতিও আগের মতো বিরক্তি প্রকাশ করে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তৃতীয় ঠগ এগিয়ে এসে পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম করে বলল, ঠাকুর আপনার মতো ব্রাহ্মণ এই পুরো থানায় নেই। কিন্তু আপনার কাঁধে কুকুর কেন। পণ্ডিত মশাইর তখনো নিজের বিবেচনার ওপর আস্থা প্রবল। তিনি আগের মতোই বিরক্তি প্রকাশ করে এগিয়ে চললেন।

এবার চতুর্থ ঠগ এগিয়ে এসে ভক্তি গদগদভাবে প্রণাম করে বলল, আপনার মতো ব্রাহ্মণ পুরো জেলায় নেই। কিন্তু ঠাকুর আপনার আজ কী হলো, অস্পৃশ্য কুকুরকে আপনি কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন? [সনাতন হিন্দু ধর্ম অনুসারে কুকুর এক নিকৃষ্ট প্রাণী। কোনো ব্রাহ্মণ এটি স্পর্শ করতে পারেন না।]

পণ্ডিত মশাই এবার একটু ভাবলেন। আমি তো দেখে শুনে নাদুসনুদুস পাঁঠা কিনলাম। কিন্তু এর আগেও তিনজন এটাকে বলছে কুকুর। এ-ও বলল কুকুর। ঠিক আছে একটু কাঁধ থেকে নামিয়ে দেখি। পণ্ডিত মশাই পাঁঠাটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে লেজ নেড়েচেড়ে ভালো করে দেখলেন। দেখে আবার নিশ্চিত হলেন এটি কুকুর নয় পাঁঠা। আবার পাঁঠাটিকে কাঁধে চড়ালেন। কিন্তু কাঁধে চড়ালে কী হবে-আসলে পণ্ডিত মশাইয়ের নিজের ওপর বিশ্বাসের ভিত তখন নড়বড়ে হয়ে গেছে। তা না হলে দেখেশুনে কেনা পাঁঠাকে আবার পরীক্ষা করতে যেতেন না।

এরপর পঞ্চম ঠগ যখন প্রণাম শেষে বলল ঠাকুর! আপনার কাঁধে কেন কুকুর? তখন পণ্ডিত মশাইর নিজের ওপর বিশ্বাস পুরোটাই ভেস্তে গেল। জলজ্যান্ত পাঁঠাটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে জোরে এক লাথি মারলেন। আক্ষেপ করে বললেন, কার মুখ দেখে যে আজ যাত্রা করেছিলাম! কিনলাম পাঁঠা হয়ে গেল কুকুর! আর ওদিকে পণ্ডিত মশাই দৃষ্টির আড়ালে যেতেই পাঁঠাটাকে ধরে মজা করে খাওয়ার জন্যে নিয়ে গেল ঠগেরা নিজেদের আস্তানায়।

রি-অ্যাকটিভ হওয়ার কারণে, অন্যের কথার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পদক্ষেপ নেয়ার ফলে বাবা ও ছেলে গাধাকে বিক্রি করতে পারল না, নিজেরা আহত হলো। পণ্ডিত মশাইয়ের পাঁঠা ঠগেরা খেলো।

আসলে আপনি যখন নিজস্ব বিচার বিবেচনার পরিবর্তে অন্যের উস্কানিতে বা অন্যের প্ররোচনায় বা অন্যের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বা উত্তেজিত হয়ে পদক্ষেপ নেন, তখন তা 'ক্রিয়া' নয়, তখন তা হয় 'প্রতিক্রিয়া'। আর

'প্রতিক্রিয়া' কখনো 'ক্রিয়া'র মতো ফলপ্রসূ হয় না। 'প্রতিক্রিয়া' সবসময় ব্যর্থতা ডেকে আনে।

প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজিত সিদ্ধান্ত কীভাবে ব্যর্থতা ডেকে আনে মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর প্রতিপক্ষরাই তার প্রমাণ। মোহাম্মদ আলী সবসময়ই দৈহিক দিক থেকে তার চেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছেন। মোহাম্মদ আলীর বক্সিং-এর কৌশল ছিল অভিনব। তিনি রিং-এ নেমেই লাফাতে শুরু করতেন, হাত চালানোর চেয়ে লাফাতেন বেশি। আর সেইসাথে শুরু করতেন প্রতিপক্ষকে বকাবকি, গালিগালাজ।

তার গালিগালাজে প্রতিপক্ষ বেশিরভাগ সময়ই প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠত এবং এক ঘুষিতে নক আউট করার জন্যে প্রবল বেগে ঘুষি মারত। আর মোহাম্মদ আলী সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন পুরোপুরি। বিদ্যুৎ গতিতে একটু সরে গিয়েই লেফট হুক বসিয়ে দিতেন। ভারসাম্যহীন প্রতিপক্ষ ধরাশায়ী হয়ে যেত সহজে। (কারণ প্রবল বেগে কোথাও আঘাত করতে চাইলে, আঘাত সেখানে না লাগলে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়)।

আসলে রি-অ্যাকটিভ হয়ে, উত্তেজিত হয়ে, রেগে গিয়ে কিছু করলে সাধারণভাবে পরাজয়ই কপালে জোটে।

রেগে গেলেন, হেরে গেলেন

রেগে গেলে মানুষ কীভাবে হেরে যায় তার একটি চমৎকার আমেরিকান গল্প আছে। এক মার্কিন ধনকুবেরের একমাত্র সুন্দরী কন্যা। কন্যার ছেলে-বন্ধুর কোনো অভাব নেই। অভাব থাকার কথাও নয়। একে তো সুন্দরী! তারপর ধনকুবেরের মেয়ে।

মেয়ের যখন বিয়ের বয়স হলো বাবা তাকে বললেন, এখন তো তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বলো তোমার কাকে পছন্দ। যাকে পছন্দ তার সাথেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব।

মেয়ে পছন্দ প্রকাশে অপারগতার কথা জানাল। বলল, আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কারণ সবাই বলে তারা আমাকে ভালবাসে। আমার জন্যে প্রয়োজনে জান দিয়ে দেবে।

বাবা চিন্তায় পড়ে গেলেন। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে বুদ্ধি বেরিয়ে এল। মেয়ের সাথে আলাপ করে বাবা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন-প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হবে তাকেই মেয়ে বিয়ে করবে।

প্রতিযোগিতার দিন দেখা গেল শতাধিক যুবক সুন্দর পোশাকে পরিপাটি অবস্থায় ধনকুবেরের বাড়িতে এসে উপস্থিত। ধনকুবের সবাইকে বাড়ির সুইমিং পুলে নিয়ে গেলেন। সুইমিংপুলের পাশে সবাইকে দাঁড় করিয়ে বললেন, দেখ, প্রতিযোগিতা খুব সহজ। সাঁতার প্রতিযোগিতা হবে। সাঁতারে যে প্রথম হবে তার সাথেই আমার মেয়ের বিয়ে দেবো । তবে সুইমিং পুলে ঝাঁপ দেয়ার আগে ভালো করে খেয়াল করো। পানির নিচে বহু কুমির

অপেক্ষা করছে। আর এই কুমিরগুলোকে একমাস ধরে কোনো খাবার দেয়া হয় নি।

ধনকুবেরের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল যে, এক যুবক পানিতে পড়ে চোখ বন্ধ করে দুই হাত-পা নাড়ছে। কুমিররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই যুবক ভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণের মধ্যেই সুইমিংপুলের ওপারে গিয়ে উঠেছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতবাক। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই ধনকুবেরের মেয়ে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল যুবককে। বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলল, তোমার মতো বীরকেই আমি চাচ্ছিলাম। তুমিই আমার স্বামী হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত।

এদিকে যুবকের রাগ তখনো থামে নি। উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে। এক ঝটকায় মেয়েটিকে দূরে ঠেলে দিয়ে যুবক চিৎকার করে উঠল, 'কোন... জাদা আমাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিয়েছিল, তাকে আগে দেখে নিই।'

সুন্দরী স্ত্রী ও ধনকুবেরের সম্পদ ওই যুবকের হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল। ধাক্কা যে-ই দিক, সে সুইমিং পুল অতিক্রম করে সবার চোখে বিজয়ী বীর বলে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় সৌভাগ্য এসেও তা হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল। অথচ রাগ দমন করতে পারলে, ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে সে অনায়াসে মুচকি হেসে বলতে পারত, 'পুরুষ তো আমি একাই, ওরা আবার পুরুষ নাকি!'

নিজের জীবন অনুসন্ধান করলেও আপনি হয়তো দেখতে পাবেন অনেক সুযোগ নষ্টের পেছনে রয়েছে আপনার রাগ, ক্ষোভ ও অভিমান। তাই সবসময় স্মরণ রাখুন 'রেগে গেলেন, হেরে গেলেন'।

জীবনে জয়ী হওয়ার জন্যে তাই আপনাকে প্রো-অ্যাকটিভ হতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রো-অ্যাকটিভ হওয়ার সুফল আপনি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারবেন। আপনি হয়তো বলবেন, সবসময় কি প্রো-অ্যাকটিভ থাকা যায়? একজন অহেতুক গালিগালাজ করল, মা-বাবা তুলে গালি দিল, তখনো কি প্রো-অ্যাকটিভ থাকা যায়? অনায়াসে থাকা যায়। মহামতি বুদ্ধের জীবনের একটি ঘটনা এক্ষেত্রে আমাদের জন্যে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

মহামতি বুদ্ধ তখন বৃদ্ধ। এক চালবাজ লোক জুটে গেল। সে ভাবল বুদ্ধ আর বেশিদিন বাঁচবেন না। এখন তার সাথে কিছুদিন থেকে যদি কিছু কায়দা-কানুন টেকনিক শিখে নেয়া যায় তাহলে বুদ্ধ মারা যাওয়ার সাথে সাথে নিজেকে বুদ্ধের অবতার ঘোষণা করে দেবো । তখন আর পরিশ্রম করতে হবে না। বসে বসে দান-দক্ষিণা গ্রহণ করেই জীবনটা সুখে কাটিয়ে দেয়া যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। ভণ্ড একেবারে নিবেদিতপ্রাণ শিষ্যের

মতো ভান করে বুদ্ধের সেবা-যত্ন করতে লাগল। মহামতি বুদ্ধ তার মতলব বুঝলেও কিছুই বললেন না। বছর দুই পার হওয়ার পর ভণ্ড শিষ্য বুঝতে পারল যে, সে ধ্যানের ক্ষমতা বা আধ্যাত্মিক শক্তি কিছুই লাভ করে নি। কারণ নিয়ত পরিষ্কার না থাকলে ধ্যানের ক্ষমতা বা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যায় না। ভণ্ড শিষ্য এর ফলে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মনে মনে ঠিক করল এর উপযুক্ত প্রতিশোধ সে নেবে।

একদিন ভোরবেলা মহামতি বুদ্ধ একা বসে আছেন। ভণ্ড ভাবল এই সুযোগ। সে কাছে গিয়ে বুদ্ধকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে লাগল। বুদ্ধ চুপচাপ শুনছেন। কিছুই বলছেন না।

অনেকক্ষণ গালিগালাজ করার পর ভণ্ড শিষ্য যখন একটু থামল বুদ্ধ তখন মুখ খুললেন। শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারি? ভণ্ড শিষ্যের মেজাজ তখনো ঠান্ডা হয় নি। সে ঝাঁঝাল স্বরে বলল, জিজ্ঞেস করেন, কী জিজ্ঞেস করবেন? বুদ্ধ বললেন, ধরো তোমার কিছু জিনিস তুমি কাউকে দিতে চাচ্ছ। কিন্তু সে যদি তা না নেয়, তাহলে জিনিসগুলো কার কাছে থাকবে? উত্তেজিত শিষ্য জবাব দিল, 'এ তো সহজ বিষয়। এটাও আপনি বোঝেন না? আমার জিনিস আমি যাকে দিতে চাচ্ছি সে যদি না নেয় তাহলে আমারই থাকবে।

বুদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার জিনিস তুমি যাকে দিতে চাচ্ছ সে না নিলে তোমার থাকবে?' ভণ্ড শিষ্যের উত্তর, 'হাঁ আমার থাকবে।' এবার মহামতি বুদ্ধ বললেন, তাহলে এতক্ষণ তুমি আমাকে যা (গালিগালাজ) উপহার দিলে, আমি তার কিছুই নিলাম না।'

আপনিও আপনার জীবনে ব্যক্তিগত গালিগালাজ ও অপমানসূচক কথাবার্তার জবাবে মহামতি বুদ্ধের এই কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। আসলে একজন মানুষ যখন অযৌক্তিক আচরণ করে, গালিগালাজ করে, মা-বাবা তুলে গাল দেয় তখন এর জবাবে আপনিও তার মা-বাবা তুলে গাল দিতে পারেন। কিন্তু তার মা-বাবাকে গালি দিয়ে আপনি নিজেকেই অপমানিত করলেন। সে গালিগালাজ করে আপনার শান্তি নষ্ট করতে এসেছিল, আপনি গালির জবাব দেয়ার অর্থই হচ্ছে তার উদ্দেশ্যকে সফল করা। তার চেয়ে কিছুক্ষণ তার গালিগালাজ শোনার পরে আপনি যদি বিনয়ের সাথে বলেন, 'ভাই/আপা আপনি অনেক মেহেরবান। অনেক কিছু আমাকে দিলেন। কিন্তু এগুলো রাখার কোনো জায়গা আমার কাছে নেই। আমি কিছুই নিলাম না। এগুলো আপনারই থাক।' এ কথা বলার পর দেখবেন, অপরপক্ষ দাঁত কামড়ে চলে যাচ্ছে। তার গালিগালাজ যে আপনার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, এটাই তার পরাজয়। আর এ পরাজয়ের যন্ত্রণা হয়তো অনেক দিন সে বয়ে বেড়াবে। সে এসেছিল আপনার শান্তি নষ্ট করতে, কিন্তু শান্ত থেকে আপনি তাকে পরাভূত করলেন।

আপনি আপনার চারপাশে তাকালে দেখবেন, যে ক্ষেপে তাকেই ক্ষেপানো হয়। ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব এদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন, যে একটু বেশি সংবেদনশীল, সহজেই ক্ষেপে যায়, অন্যরা তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে

খোঁচা দিয়ে, কটাক্ষ করে, মন্তব্য করে, উপাধি দিয়ে, ক্ষেপিয়ে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পায়। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর একটাই পথ, শান্ত থাকা। কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করা।

বরং তাদের এই কটাক্ষকে আপনি যে কোনো পরোয়া করছেন না, সেজন্যে অবস্থাভেদে একটু মুচকি মুচকি হাসুন। দেখবেন অপরপক্ষ রণেভঙ্গ দেবে। আপনি যদি ক্রমাগত কিছুদিন না ক্ষেপে থাকতে পারেন, দেখবেন এরপর কেউ আপনাকে ক্ষেপাতে আসছে না।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, পারিবারিক জীবনে কি সব পরিস্থিতিতে প্রো-অ্যাকটিভ থাকা সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। যত প্রো-অ্যাকটিভ থাকবেন তত পারিবারিক প্রশান্তি বাড়বে। গ্রিক দার্শনিক ডায়াজোনাসের জীবন দেখুন। একদিনের ঘটনা।

তত্ত্ব আলোচনায় ডায়াজোনাস এত মশগুল ছিলেন যে, রাত পার হয়ে গেল কিন্তু বাড়ির কথা তার মনে পড়ল না। পরদিন সন্ধ্যায় তার খেয়াল হলো, গতকাল তিনি বাসায় যান নি। মনে মনে অনুশোচনা করলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন বাসায় গিয়ে তিনি একদম প্রো-অ্যাকটিভ থাকবেন। এদিকে ডায়াজোনাসের স্ত্রী টেনশন ও দুশ্চিন্তায় অস্থির। স্বামী রাতে বাসায় ফেরেন নি, স্বামীর কোনো খবরই পান নি। অতএব স্ত্রী হিসেবে তার টেনশন সহজেই বোঝা যায়। পরদিন সন্ধ্যায় ডায়াজোনাস যখন বাসায় ফিরলেন স্ত্রী তাকে দেখে প্রথমে নিশ্চিত হলেন- যাক স্বামী সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। তারপরই রাগ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল। এমন কোনো কথা বা বাক্য নেই যা তিনি উচ্চারণ করেন নি। কারণ ক্ষোভের সময় মানুষ অনেক কটু কথাই বলে, যার জন্যে পরে সে নিজেই অনুতপ্ত হয়। স্ত্রী এক নাগাড়ে বলেই চলছেন, কিন্তু ডায়াজোনাস শুধু চুপচাপ শুনছেন। একটি কথারও জবাব দিচ্ছেন না।

একা আসলে ঝগড়া করা যায় না। স্ত্রী কোনো কথারই জবাব না পেয়ে আরো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। কী! একেবারে মৌনি সাধু! আমার একটা প্রশ্নেরও জবাব নেই! ঠিক আছে মজা দেখাচ্ছি! এই বলে সেই ডিসেম্বরের শীতের সন্ধ্যায় বালতিতে রাখা ঠান্ডা পানি এনে পুরোটাই ডায়াজোনাস-এর মাথায় ঢেলে দিলেন। এবার ডায়াজোনাস একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, 'এত তর্জন-গর্জন। তারপর একটু বর্ষণ না হলে তো তর্জন গর্জন একেবারে বৃথাই যেত।'

শীতের রাতে এত ঠান্ডা পানি মাথায় পড়ার পরও যদি কোনো স্বামী মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন, তাহলে কোন স্ত্রীর পক্ষে রাগ করে থাকা সম্ভব? স্ত্রীও হেসে ফেললেন। মুহূর্তে মিটমাট হয়ে গেল সব।

পারিবারিক জীবনে যে-কোনো ঝগড়া, ক্ষোভ, রাগারাগি নিরসনে এই প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করতে পারেন। আপনার স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। অযৌক্তিক কথা বলছেন। আপনি চুপচাপ থাকুন। আপনার স্ত্রী আপনাকে বলছে। অন্যের স্ত্রী তো আপনাকে বলছে না। আপনি একটু চুপ থাকুন। মনে মনে হাসুন। মনে মনে

বলুন, চিৎকার করছ, করো। সময় মতোই জবাব দেবো। কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন পর দেখবেন স্ত্রীই তার আচরণের জন্যে আপনার কাছে দুঃখ বা অনুশোচনা প্রকাশ করছেন। আপনার স্বামী রেগে গেছেন, যা তা বলছেন। বলতে দিন। আপনার স্বামী আপনাকে বকছে, অন্যের স্বামী তো আর আপনাকে বকছে না। আপনি চুপচাপ থাকুন।

মনে মনে বলুন, লাফাচ্ছ! লাফাও! সময় আসুক তারপর মজা বোঝাব! কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিনের মধ্যে দেখবেন তিনিই আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছেন। প্রো-অ্যাকটিভ না হয়ে যদি রি-অ্যাকটিভ হন তাহলে কী হবে? তিনি একটা কথা বলবেন। আপনি কথার পিঠে কথা চাপাবেন। তিল জমে জমে তাল হয়ে যাবে।

মনোকষ্ট ও মনোমালিন্য বাড়তেই থাকবে। এমনকি তা বিচ্ছেদের পথে চলে যেতে পারে। অপরদিকে প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত পরিবারের ওপর আপনার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণকেই প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রো-অ্যাকটিভ মানুষই অন্যকে প্রভাবিত করে, পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে। এই জন্যেই মহামানবরা সবসময় প্রো-অ্যাকটিভ ছিলেন। নবীজীর (স) জীবন দেখুন। তিনি সবসময় প্রো-অ্যাকটিভ ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা দুয়েকটি ঘটনা আলোচনা করতে পারি।

১. বৃদ্ধার সাথে আচরণ : ঘটনাটি আমরা সবাই জানি। এক বৃদ্ধা প্রতিদিন নবীজীর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। উদ্দেশ্য নবীজীকে কষ্ট দেয়া। নবীজী প্রতিদিন কাঁটা সরিয়ে পথ চলতেন। যাতে অন্যের পায়ে কাঁটা না বেঁধে।

একদিন পথে কাঁটা নেই। দ্বিতীয় দিনও পথে কাঁটা নেই। নবীজী ভাবলেন, একদিন হয়তো ভুল করে বৃদ্ধা কাঁটা বিছায় নি। দুই দিন তো ভুল হতে পারে না। নিশ্চয় বৃদ্ধা অসুস্থ। তিনি খোঁজ নিলেন।

বৃদ্ধা ঠিকই গুরুতর অসুস্থ। আমরা হলে হয়তো বলতাম, 'বেটি বুড়ি আমার পথে কাঁটা বিছিয়েছিস! আল্লাহ তোকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে।' কিন্তু নবীজী বৃদ্ধার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলেন। তার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন।

বৃদ্ধা সুস্থ হয়ে উঠলেন। সুস্থ হওয়ার পর বৃদ্ধার মনে প্রশ্ন জাগল, যাদের কথায় নবীর পথে কাঁটা বিছিয়েছি তারা তো কেউ আমাকে দেখতে আসে নি। বরং যাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে কাঁটা বিছিয়েছি তিনিই আমার সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন। মানুষ হিসেবে নবীজীই ভালো মানুষ। বৃদ্ধা নবীজীর ধর্ম গ্রহণ করলেন। নবীজী প্রো-অ্যাকটিভ ছিলেন বলেই বৃদ্ধাকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। বৃদ্ধা যা-ই করুক না কেন, বৃদ্ধার আচরণ দ্বারা নবীজী প্রভাবিত হন নি। নবীজী বৃদ্ধার সাথে সেই আচরণই করেছেন, যা তিনি সঙ্গত মনে করেছেন। সে কারণেই বিরুদ্ধাচরণকারী বৃদ্ধা নবী অনুরাগীতে রূপান্তরিত হলো।

২. ইহুদির সাথে আচরণ : এটিও আমাদের জানা ঘটনা। এক সন্ধ্যায় এক ইহুদি এসে নবীজীর আতিথ্য গ্রহণ করল। নবীজী তাকে ভালোভাবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর রাতে ঘুমানোর জন্যে সবচেয়ে ভালো কম্বলটি তাকে দিলেন। কিন্তু ইহুদির মতলব ছিল খারাপ।

সবাই যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন তখন ইহুদি কম্বলে পায়খানা করে ভোর হওয়ার আগেই পালিয়ে গেল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে পালানোর সময় ভুলে তলোয়ার ফেলে রেখে গেল।

নবীজী ফজরের সময় উঠে অবস্থা দেখে সবই বুঝলেন। কিন্তু কাউকেই কিছু না বলে কম্বল পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করলেন। ইহুদির তলোয়ারটা ভালোভাবে রেখে দিলেন।

এদিকে বহু দূর যাওয়ার পর ইহুদীর খেয়াল হলো সে তলোয়ার ভুল করে ফেলে রেখে গেছে। তখনকার দিনে আরবে একজন মানুষের সবচেয়ে দামী সম্পদ ছিল তার তলোয়ার। ইহুদি অনেকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর সিদ্ধান্ত নিল তলোয়ার ফেরত পাওয়ার জন্যে সে নবীজীর কাছে যাবে।

ইহুদি দুরু দুরু বক্ষে নবীজীর কাছে হাজির হলো। আমরা হলে হয়তো বলতাম, 'ব্যাটা ইহুদি! তোকে রাতে যত্ন করে খাওয়ালাম-দাওয়ালাম। সবচেয়ে ভালো কম্বলটি গায়ে দেয়ার জন্যে দিলাম। আর তুই পায়খানা করে কম্বল নষ্ট করে এর প্রতিদান দিলি!

আর এখন এসেছিস তলোয়ার ফেরত নিতে! আয় এই তলোয়ার দিয়ে তোর গলাটা কেটে ফেলি, না হয় একটা হাত-পা কেটে দেই।' কিন্তু নবীজী প্রো-অ্যাকটিভ।

ইহুদির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে বললেন, 'আহা! রাতে তোমার কত না কষ্ট হয়েছে। কত কষ্ট হলে একজন মানুষ কম্বল নষ্ট করতে পারে। আর সেই লজ্জায় তুমি অন্ধকার থাকতেই চলে গেছ। আর যাওয়ার সময় ভুল করে তোমার তলোয়ারটা ফেলে রেখে গেছ। এই নাও তোমার তলোয়ার।'

নবীজীর ব্যবহারে ইহুদি মুগ্ধ হলো। অনুশোচনা এলো তার মাঝে।

ইহুদি নবীজীর ধর্ম গ্রহণ করল। ইহুদির আচরণ দ্বারা নবীজী প্রভাবিত হন নি বলেই নবীজী ইহুদিকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব, যুগে যুগে প্রো-অ্যাকটিভ মানুষরাই অন্যকে প্রভাবিত করেছেন, নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সকল প্রতিকূলতাকে জয় করেছেন।

প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে সাফল্য ও বিজয়ের বুনিয়াদে রূপান্তরিত হতে পারে, সে আলোচনা আমরা শেষ করতে পারি ইতিহাসের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে।

পবিত্র বাইবেল ও কোরআন শরীফে এই কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। কাহিনীটি হযরত ইউসুফের। আমরা খুব সংক্ষেপে এটি আলোচনা করব।

ঘটনার শুরু আমরা ধরতে পারি একটি স্বপ্ন দিয়ে। কিশোর ইউসুফ স্বপ্ন দেখলেন, 'সুর্য, চন্দ্র ও ১১টি নক্ষত্র ধীরে ধীরে এসে অবনত হচ্ছে তার সামনে।'

ঘুম ভেঙে গেল তার। দৌঁড়ে গেলেন বাবা হযরত ইয়াকুবের কাছে। বাবা স্বপ্নের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। বুঝলেন, পুত্র তার স্মরণীয়-বরণীয় হবে, অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী হবে।

তিনি পুত্রকে নিষেধ করলেন, তোমার ভাইদের এ স্বপ্নের কথা কখনোই বলো না। তাহলে তারা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তোমার ক্ষতি করবে।

ইউসুফের আপন ভাই বেনিয়ামিন ছাড়াও বৈমাত্রেয় ভাই ছিল দশ জন। বৈমাত্রেয় ভাইরা ছিল ইউসুফের বড়।

ইউসুফ বড় হতে লাগল। সৎগুণাবলিও বিকশিত হতে লাগল। বাবার খুবই প্রিয়পাত্র হয়ে গেলেন তিনি। আর বৈমাত্রীয় ভাইদের ঈর্ষাও বাড়তে লাগল।

তারা ইউসুফকে পথের কাঁটা মনে করে সরানোর চক্রান্ত করল। বাবা ইউসুফকে আগলে আগলে রাখলেও কৌশলে তারা একদিন তাকে বাবার কাছ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে কুয়ায় নিক্ষেপ করল।

ইউসুফ কুয়ার মাঝে এক প্রস্তর খণ্ডের ওপর বসে ধৈর্য ও সাহসের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ব্যবসায়ীদের এক কাফেলা ভুল পথে এসে কুয়োর কাছে উপস্থিত হয়। তারা পানি তোলার জন্যে কুয়োয় বালতি ফেলার পর ইউসুফ সেই বালতি ধরে ফেলেন। ব্যবসায়ীরা প্রথম বুঝতে না পারলেও বালতি খুব ভারী লাগায় উঁকি দিয়ে দেখতে পায় একটি লোক রশি ধরে আছে। কয়েকজন মিলে টেনে ইউসুফকে ওপরে তোলে। ব্যবসায়ীর দল উল্লসিত হয়ে ওঠে ইউসুফকে দেখে। তারা বুঝতে পারে এই সুপুরুষ যুবককে মিসরে ক্রীতদাস হিসেবে ভালো দামে বিক্রি করা যাবে।

মিশরের অত্যন্ত ধনাঢ্য ও ক্ষমতাবান ব্যবসায়ী আজিজ তাকে দাস বাজার থেকে উচ্চ মূল্যে কিনে আনলেন। নিজের ব্যক্তিগত দাস হিসেবে নিয়োগ করলেন। বিনয়ী ও মেধাদীপ্ত আচরণ ও কর্তব্যপরায়ণতার কারণে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কার্যত আজিজ পরিবারের সদস্যে রূপান্তরিত হলেন।

ইউসুফ যেমন মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তেমনি ছিলেন সুপুরুষ। গৃহস্বামী আজিজের স্ত্রী জুলেখা তার প্রেমে পড়ে গেল। কিন্তু ইউসুফ তাতে সাড়া না দিয়ে কৌশলে তাকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জুলেখা মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করার চেষ্টা করল। আজিজ চক্রান্তের মাধ্যমে ইউসুফকে মিশরের রাজার কারাগারে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করলেন। ধনকুবের আজিজের বাড়িকে তিনি যেমন সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি

কারাগারের জীবনকেও সহজভাবে গ্রহণ করলেন। সাধনার নতুন পর্যায় শুরু হলো। তিনি স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করলেন।

কারাগারে নিজের আত্মিক শক্তিকে সংহত করতে থাকলেন ইউসুফ। এর মধ্যে কারাগারে দুই নতুন কয়েদি এলো। একজন রাজ-পরিচারক অপরজন রাজ-বাবুর্চি। এ দুজন একটু আলাপ করেই বুঝতে পারল যে ইউসুফ কোনো সাধারণ অপরাধী নয়। ইউসুফের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে উঠল দুজন। এক রাতে দুজনই খুব স্পষ্ট স্বপ্ন দেখল। আর স্বপ্ন তাদের বিচলিত করে তুলল।

রাজ-বাবুর্চি স্বপ্ন দেখল যে, সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় রুটি। দুটি পাখি ঠুকরে ঠুকরে রুটি খেয়ে ফেলছে। রাজ-পরিচারক স্বপ্ন দেখল যে, সে রাজাকে মদ পরিবেশন করছে। দুজনই হযরত ইউসুফের কাছে এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বললেন, বাবুর্চি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। আর রাজ-পরিচারক তার চাকরি ফিরে পাবে।

হযরত ইউসুফ রাজ-পরিচারককে বললেন, সে চাকরি ফিরে পেলে যেন রাজাকে জানায় ইউসুফ নামে এক নিরপরাধ ব্যক্তি কারাগারে শাস্তি পাচ্ছে। হযরত ইউসুফের স্বপ্ন ব্যাখ্যা সত্য হলো। বাবুর্চি মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত হলো। রাজ-পরিচারক তার কাজে যোগদান করল। রাজ-পরিচারক চাকরিতে পুনর্বহাল হওয়ার পর ইউসুফের কথা রাজাকে বলতে ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ আরো কয়েক বছর কারাগারেই রয়ে গেলেন। নীরবে ধৈর্যের সাথে নিজেকে গড়তে লাগলেন ভবিষ্যতের জন্যে।

এদিকে মিশরের রাজা এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, তিনি নীলনদের তীরে হাঁটছেন। তার চোখের সামনেই নীলনদের পানি শুকিয়ে যেতে লাগল। সামনে শুধু কর্দমাক্ত মাটি। বহু মাছ কাদা মাটিতে লাফাচ্ছে। নদীর তলদেশ থেকে সাতটি মোটাসোটা গাভী উঠে এলো। তাদের পেছনে পেছনে এলো সাতটি কঙ্কালসার গরু। কঙ্কালসার গরুগুলো খেয়ে ফেলল মোটাসোটা গাভীগুলোকে।

রাজা ঘটনা দেখে আতঙ্কিত হলেন। তারপর দেখলেন নদীর তীরে পরিপুষ্ট সাতটি গমের শীষ জেগে উঠল। তা আবার হারিয়ে গেল কাদামাটিতে। সে জায়গায় দেখা গেল সাতটি শুকনো শস্যহীন গমের শীষ।

মিশরের রাজা ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠলেন। আতঙ্কিত, বিষণ্ন। স্বপ্নের অর্থ তার কাছে দুর্বোধ্য। পরদিন সভাসদ, জ্যোতিষী, পুরোহিত, মন্ত্রী সবার কাছে স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইলেন। কিন্তু কারো উত্তরই রাজার পছন্দ হলো না। স্বপ্নের এই বিষয়টি রাজ-পরিচারকের কানে গেল। হঠাৎ তার মনে পড়ল কারাগারে থাকাকালে তার স্বপ্ন ও ইউসুফের ব্যাখ্যার কথা। মনে পড়ল সে ওয়াদা করেছিল, রাজার কাছে তার কথা বলবে। কিন্তু বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।

পরিচারক রাজার কাছে এবার ইউসুফের কথা বলল। রাজা পরিচারককে পাঠালেন ইউসুফের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্যে।

হযরত ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন, 'আগামী সাত বছর প্রচুর ফসল হবে। ঠিকভাবে চাষাবাদ করা হলে লোকজনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল হবে। অতিরিক্ত ফসল জমা করে রাখতে হবে। এরপর সাত বছর অনাবাদী ও দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হবে। এই সময়ে অতিরিক্ত জমানো শস্য ব্যবহার করা যাবে।'

পরবর্তী সময়ে বীজ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে কিছু শস্যদানা জমিয়ে রাখার পরামর্শ দিলেন তিনি।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও পরামর্শে রাজা বিস্মিত হলেন। তিনি কারাগার থেকে মুক্ত করে তার সামনে ইউসুফকে আনার জন্যে আদেশ দিলেন। রাজ কর্মচারী ইউসুফকে আনার জন্যে দ্রুত কারাগারে গেল।

কিন্তু হযরত ইউসুফ তাকে নির্দোষ ঘোষণা করা ছাড়া কারাগার থেকে বেরুতে অস্বীকৃতি জানালেন। রাজা বুঝলেন, অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা না হলে ইউসুফ এ ধরনের কথা বলতেন না।

সকল ঘটনা তদন্ত করে দেখলেন যে, ইউসুফ নির্দোষ। তাকে নির্দোষ ঘোষণা করা হলো। ইউসুফ রাজার দরবারে এলেন। রাজা তার সাথে কথা বলে তার পাণ্ডিত্য ও পরিশীলিত আচরণ দেখে মুগ্ধ হলেন।

হযরত ইউসুফ রাজাকে পরামর্শ দিলেন কীভাবে ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষাবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে। তিনি বললেন, দুর্ভিক্ষ শুধু মিশর নয় আশেপাশের দেশকেও প্রভাবিত করবে।

মিশরের রাজা হযরত ইউসুফকে খাদ্যমন্ত্রী নিয়োগ করলেন। সময় এখন তার অনুকূলে। তিনি সাধারণ মানুষকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করলেন।

সাত বছর পর দুর্ভিক্ষ শুরু হলেও মিশরবাসীর ওপর এর কোনো আঁচ পড়ল না। বরং উদ্বৃত্ত শস্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে প্রতিবেশী দেশগুলোর দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকেও বাঁচানোর ব্যবস্থা করলেন।

এতে রাজার আন্তর্জাতিক মর্যাদা বেড়ে গেল। রাজা হযরত ইউসুফকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তিনি সেবা ও ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করলেন। সম্মানিত হলেন সর্বত্র।

পবিত্র বাইবেল ও কোরআন শরীফে হযরত ইউসুফের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমরা এই কাহিনীর প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখি যে, একজন সফল মানুষের জীবনে যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন আগাগোড়াই তা তাঁর ছিল।

কিশোর ইউসুফকে সূর্য, চাঁদ ও এগারোটি নক্ষত্রের সেজদা করতে দেখার স্বপ্নকে অনায়াসে আমরা তার জীবনের রূপক মনছবি হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি। তার জীবনের লক্ষ্য ও প্রাপ্তি এই স্বপ্নেই ধরা দেয়

রূপকভাবে।

আর এই লক্ষ্যের জন্যে সবসময়ই তিনি প্রো-অ্যাকটিভভাবে গতিশীল পদক্ষেপ নিয়েছেন। সকল অবস্থায় পরিস্থিতির সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন। তার ভাইয়েরা যখন তাকে কুয়ায় নিক্ষেপ করল, তখন তিনি আহাজারী হা-হুতাশ না করে, হতাশায় ভেঙে না পড়ে পাথরের চাঁই ধরে বসে প্রত্যয়ের সাথে, সবরের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বণিকরা যখন তাকে কুয়া থেকে তুলে ক্রীতদাসের মতো বেঁধে নিয়ে চলল, তখনো তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি।

ধনাঢ্য আজিজ যখন তাকে দাস হিসেবে বাসায় নিয়ে গেল, তখন তিনি বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা ও ব্যবহারের সর্বোত্তম প্রয়োগ করে গৃহকর্তার মন জয় করলেন। তিনি তার পরিবারের সদস্যের মতো মর্যাদার অধিকারী হলেন।

গৃহকর্তার স্ত্রী জুলেখা যখন প্রেম নিবেদন করলেন, তখনো যুবক ইউসুফ গৃহস্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকলেন। যখন জুলেখা জোর করে ইউসুফের সাথে মিলিত হতে চাইল, ইউসুফ নিজেকে সে পাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্যে দৌড়ে পালাতে গিয়ে গৃহস্বামীর সামনে পড়লেন। আর জুলেখা পুরো ব্যাপারটিকেই উল্টো ইউসুফের ওপর চাপাতে চাইল।

তখন তিনি রি-অ্যাকটিভ না হয়ে পুরো ঘটনা পর্যালোচনার দায়িত্ব গৃহস্বামীর ওপর অর্পণ করেন। ফলে গৃহস্বামী পুরো ঘটনা পর্যালোচনা করে বুঝতে পারেন ইউসুফ নির্দোষ। কিন্তু কেলেঙ্কারি ও মর্যাদাহানির ভয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আজিজ ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

তখনো হযরত ইউসুফ কোনো রি-অ্যাকটিভ আচরণ করেন নি। প্রাক্তন মনিব আজিজের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেন নি। বরং কারাগারে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করার সাধনায় নিজেকে নিয়োগ করেন। বন্দি জীবনকে তিনি ধ্যানের মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বিকশিত করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন।

স্বপ্ন ব্যাখ্যা সফল হয়ে রাজ-পরিচারক কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর রাজার কাছে ইউসুফের কথা বলতে ভুলে গেলেও তিনি কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনার পর রাজা ইউসুফকে দরবারে আসতে বলার পর তিনি দরবারে গিয়ে প্রাক্তন মনিব আজিজের বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারতেন। কিন্তু তখনো তিনি মনিবের বিশ্বাসকে লঙ্ঘন করেন নি। মনিবের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। শুধু তিনি যে নির্দোষ এই তদন্তের দায়িত্ব রাজা যাতে নিজে গ্রহণ করেন কার্যত সেই দাবি জানিয়েছিলেন।

মিশরের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তিনি তার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশোধ নেয়ার কোনো

সুযোগ গ্রহণ করেন নি। এমনকি তার বৈমাত্রেয় ভাইদের কব্জার মধ্যে পেয়েও প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি সমস্যা ও দুর্যোগ তিনি মোকাবেলা করেছেন প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, সবর করে।

সবসময় নিজ বিশ্বাসে অটল থেকেছেন আর মেধাকে কাজে লাগিয়েছেন সৃষ্টির সেবায়। ফলে কৈশোরে দেখা স্বপ্ন বা মনছবি বাস্তবায়িত হয়েছে তার জীবনে।

তাই আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি-'দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে'। প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে পৌঁছে দেবে মহিমান্বিত জীবনে।

অধ্যায়-৫

ধ্যানাবস্থা : প্রথম পদক্ষেপ

আমরা জানি, মস্তিষ্ককে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার জন্যে প্রয়োজন সুসংহত মানসিক প্রস্তুতি। আর সুসংহত মানসিক প্রস্তুতির ভিত্তি হচ্ছে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি। আর যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে মনের শক্তি ও তৎপরতার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে কোনো শক্তিকেই নিজের বা মানুষের কল্যাণে লাগানো যায় না। আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ওপরই নির্ভর করে তা সভ্যতা গড়ার কাজে লাগবে, না তা সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। যে পারমাণবিক শক্তি হিরোশিমা-নাগাসাকিতে মুহূর্তে প্রলয় ঘটিয়েছিল, সে শক্তির নিয়ন্ত্রিত ও সৃজনশীল প্রয়োগই বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে বিপ্লব। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নেহাত জড় পদার্থও পরিণত হতে পারে শক্তিতে, শক্তি পরিণত হতে পারে মহাশক্তিতে।

প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষেত্রে এ নিয়ম যেমন স্বতঃসিদ্ধ তেমনি মানুষের ক্ষেত্রে তা সমভাবে প্রযোজ্য। মানুষের অসীম শক্তিকে ব্যক্তি বা মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করার পন্থাও এই একটিই-শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও সৃজনশীল প্রয়োগ।

মানুষের শক্তির উৎস দুটি। এক, দৈহিক শক্তি। দুই, মানসিক শক্তি। দৈহিক শক্তি সসীম, কিন্তু মনের শক্তি অসীম। দেহের পক্ষে অসম্ভব এমন প্রতিটি কাজ মন করে যেতে পারে অবলীলায়। কঠিন পর্বতমালার মধ্যে সে যেমন অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে, তেমনি পারে পরমাণুর মাঝেও ঢুকে পড়তে। অতল সাগরের তলদেশে মন যেমন মুহূর্তে ডুব দিতে পারে তেমনি মহাবিশ্বের দূরতম গ্যালাক্সি পরিভ্রমণ করে আসতেও তার সময় লাগে না। দেহের অবস্থান স্থান-কালে সীমাবদ্ধ হলেও স্থান-কালের কোনো বেষ্টনী দিয়েই মনকে আবদ্ধ করা যায় না। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকালের যে-কোনো স্তরে মন অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে পারে। দেহের ক্লান্তি আছে, কিন্তু মনের কোনো ক্লান্তি নেই। দেহের নিষ্ক্রিয় বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, কিন্তু মনের কোনো নিষ্ক্রিয় বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। দেহ যখন নিদ্রায় অচেতন থাকে, মন তখনো থাকে সজাগ, সচেতন।

আমাদের সকল সচেতনতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মন। শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যা কিছুই আমরা

এখন বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি তার সবকিছুর ধারণাই প্রথম এসেছে মনে। মনের ধারণার বীজই পরবর্তীতে পত্র-পুষ্পে প্রস্ফুটিত হয়ে বাস্তব রূপ নিয়েছে।

এই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও এ শক্তি ইন্দ্রিয়াতীত নয়, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী। তাই মনের বল ইন্দ্রিয়শক্তি তথা দৈহিক শক্তিকে বাড়াতে পারে বহুগুণ। আপাতত যুক্তির বিচারে যা অসম্ভব তাকেও করতে পারে সম্ভব।

প্রতিভার রহস্য

মনের শক্তি অসীম। আর প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে একটি মন। প্রতিভাবান ও একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে-প্রতিভাবান ব্যক্তি মনের এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজস্ব সৃজনশীল পন্থায় ব্যবহার করে অমরত্ব লাভ করেন। আর সাধারণ মানুষ মনকে নিয়ন্ত্রণ না করে মন দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসীম শক্তির অপচয় করে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কারণ মন হচ্ছে আলাদীনের দৈত্যের মতো সদা তৎপর। তার আহার নিদ্রার কোনো প্রয়োজন নেই। তার প্রয়োজন কাজ। তাকে সবসময় কাজ দিয়ে রাখতে হয়। আপনি যদি তাকে আপনার সাফল্যের জন্যে প্রয়োজনীয় ইতিবাচক কাজ দিয়ে রাখতে পারেন, তবে সেই লক্ষ্যেই সে নিরলস কাজ করে যাবে। নিত্যনতুন আইডিয়া ও সাফল্যে আপনি চমৎকৃত হবেন। আর যদি ইতিবাচক কাজ দিতে না পারেন তবে মন করবে নেতিবাচক কাজ। আলাদীনের দৈত্য যেমন কাজ দিতে না পারায় মালিককেই হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল, তেমনি আপনার মনও নেতিবাচক কাজে শক্তির অপচয় করে জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

মনকে নিয়ন্ত্রণ ও মনোশক্তিকে সৃজনশীলভাবে কাজে লাগিয়ে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার প্রচেষ্টা নতুন নয়। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই জ্ঞানীরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। এই চেষ্টার ফলশ্রুতিতে কেউ হয়েছেন অভিযাত্রী, আবিষ্কারক, বিজ্ঞানী। কেউ হয়েছেন শিল্পী, সাধু, সন্ত, দরবেশ। কেউ পরিণত হয়েছেন মহাপুরুষে।

বিশ শতকের শেষে এসে আমরা তাই পেয়েছি মননিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল সম্পর্কে নানা প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। একেক প্রক্রিয়া একেক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে তৈরি। বিভিন্ন প্রক্রিয়া রচিত হয়েছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিচিত্র মানসিকতা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে। মনকে নিয়ন্ত্রণ করে সাধু, সন্ত,

আওলিয়া, দরবেশে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে বৈষয়িক সাফল্য লাভ তথা বিত্তবান ও ক্ষমতাবান হওয়ার প্রক্রিয়া। উভয় প্রক্রিয়াই মূলত এক, শুধু লক্ষ্য ভিন্ন।

মনের আচরণ বিধি

মনকে নিয়ন্ত্রণ করার আগে আমাদের অবশ্য মন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা স্মরণ রাখা উচিত। বিজ্ঞানীরা মনকে ভাগ করেছেন তিন ভাগে। সচেতন, অবচেতন এবং অচেতন। সচেতন মন সবকিছুকেই নিজের ধারণা, যুক্তি ও বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা করে। কিন্তু অবচেতন মন ভালো-মন্দ কোনোকিছুই বিচার করার চেষ্টা করে না। সে যে তথ্য, পরিকল্পনা বা আইডিয়া পায়, সেভাবেই প্রভাবিত হয়ে কাজ শুরু করে দেয়। প্রভাবটা আপনার জন্যে ভালো হোক বা ক্ষতিকর সে বিবেচনা করে না। ভয়, ক্রোধ বা বিশ্বাস দ্বারা গভীরভাবে তাড়িত হলে যে-কোনো ধরনের প্রভাবে অবচেতন মন সহজেই সাড়া দেয়।

মনের অবচেতন অংশ আবার সচেতন অংশের কথা সহজেই শোনে। ভয়, সীমাবদ্ধতা বা ভুল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সচেতন মন সবসময় অবচেতন মনের দরজা বন্ধ করে রাখতে চায়। অথচ প্রজ্ঞার সাথে সচেতন মনের যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে অবচেতন মন। কারণ সচেতন ও অচেতন মনের মাঝখানেই অবস্থান করছে অবচেতন মন।

বিজ্ঞানীরা যাকে মনের অচেতন অংশ বলে মনে করেন, সাধকরা সেটাকেই মনে করেন মনের মহাচেতন অংশ। শুধুমাত্র অবচেতন ও অচেতনের মাঝখানের দরজা খুলতে পারলেই সচেতন মন প্রজ্ঞা বা মহাচৈতন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়।

আমরা আগেই জেনেছি- অবচেতন মন ভালো-মন্দ বিচার বিবেচনা করতে পারে না। আর অবচেতন মন আলাদীনের দৈত্যের মতো কখনো অলস বসে থাকতে পারে না। তার চাই কাজ। আপনি যদি তাকে আপনার কল্যাণে ইচ্ছানুসারে ব্যস্ত না রাখেন তাহলে সে আপনার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজ করবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই কাজের কাঁচামাল হবে আপনার ভয়, ভীতি, অপছন্দনীয় ও অবাঞ্ছিত বিষয়সমূহ। খারাপ বা ভালো যে বিষয় সে পাক না কেন অবচেতন মন সে চিন্তাকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অবচেতন মন কীভাবে প্রভাবিত হয়, তা আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। অবচেতন মন প্রধানত প্রভাবিত হয় তিনভাবে।

প্রথমত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তথা স্পর্শ, নাসিকা, কান, চোখ ও জিহবা দ্বারা। অন্যের কোনো কথা বা কাজের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হলেও তার প্রভাব পড়ে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা। অন্যের চিন্তাতরঙ্গ দ্বারা। কারণ প্রতিটি ব্রেন হচ্ছে চিন্তার ট্রান্সমিটার ও রিসিভার।

তৃতীয়ত, ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা দ্বারা। আপনি আকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের আকারে যা প্রেরণ করেন তা যেমন অবচেতন মনে পৌঁছায় তেমনি আজেবাজে ও অর্থহীন চিন্তাও অবচেতন মনে পৌঁছায়। বেশিরভাগ লোকের মন আচ্ছন্ন থাকে আজেবাজে চিন্তায়।

আর এই আজেবাজে ও ক্ষতিকর চিন্তার ওপরই অবচেতন মন কাজ করে সে ধরনের অবাঞ্ছিত পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলে। কারণ অবচেতন মন কাজের ফলাফল বিচার করে না। বেশিরভাগ মানুষের ব্যর্থতার মূল কারণ এখানেই নিহিত। কারণ তাদের বেশিরভাগ চিন্তাই ব্যর্থতাকেন্দ্রিক আর অবচেতন মন সে চিন্তাকেই যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

অবচেতন মন যেহেতু ভালো-মন্দ বিচার না করেই প্রেরিত চিন্তাকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেহেতু সাফল্যের জন্যে আপনি কী চান সে সম্পর্কে অবচেতন মনকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাঠাতে হবে। তাহলেই অবচেতন মন সেই চিন্তা ও নির্দেশকে তার যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।

ব্রেনওয়েভ

আমরা জানি, মনের প্রতিটি কাজ করে দেয় আমাদের ব্রেন। সক্রিয় অবস্থায় ব্রেন থেকে প্রতিনিয়ত খুব মৃদু বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিকিরিত হয়। বিজ্ঞানীরা একে বলেন, ব্রেন ওয়েভ। ১৯২৯ সালে ড. হ্যান্স বার্জার ইলেক্ট্রোএনসেফেলোগ্রাফ (ইইজি) যন্ত্র দ্বারা এই ওয়েভ বা তরঙ্গ মাপেন।

মানসিক চাপ, সতর্কতা, তৎপরতামূলক পরিস্থিতিতে ব্রেনের বৈদ্যুতিক বিকিরণ বেড়ে যায়। তখন ব্রেন ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি দাঁড়ায় প্রতি সেকেন্ডে ১৪ সাইকেল থেকে ২৬ সাইকেল পর্যন্ত। একে বলা হয় বিটা ব্রেন

ওয়েভ।

চোখ বন্ধ করে বিশ্রামকালে একটু তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব সৃষ্টি হলে ব্রেনের বৈদ্যুতিক তৎপরতা কমে যায়। এ অবস্থায় ব্রেন ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি দাঁড়ায় প্রতি সেকেন্ডে ৮ থেকে ১৩ সাইকেল। একে বলা হয়, আলফা ব্রেন ওয়েভ।

থিটা ব্রেন ওয়েভ আলফার চেয়ে ধীর। এর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ৪ থেকে ৭ সাইকেল।

এরপর রয়েছে গভীর নিদ্রাকালীন ব্রেন ওয়েভ। এর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ০.৫ থেকে ৩ সাইকেল। একে বলা হয় ডেল্টা ব্রেন ওয়েভ।

ব্রেন ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি প্রতি সেকেন্ডে ২৭ বা তার ওপরে উঠে যেতে পারে হঠাৎ উত্তেজিত অবস্থার ফলে। একে বলা হয় গামা ব্রেন ওয়েভ।

ব্রেন ওয়েভ প্যাটার্ন সারণি

	ফ্রিকোয়েন্সি সীমা	প্রধান লক্ষণসমূহ
স্থান কালে সীমাবদ্ধ বাহ্যিক সচেতন অবস্থা	গামা ২৭ সাইকেল ও তার বেশি	পুরোপুরি অনুসন্ধান চালানো হয় নি। ক্রোধ ও অতি উত্তেজিত অবস্থায় এটা ঘটে থাকে।
	বিটা ১৪-২৬ সাইকেল	সাধারণ জাগ্রত অবস্থা, সক্রিয় মন, চিন্তা, গভীর মনোযোগ, দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ।
অন্তর্চেতনা অতিচেতনা প্রজ্ঞা স্থানকাল দ্বারা সীমিত নয়। অনন্ত চেতনা	আলফা ৮-১৩ সাইকেল	মনের প্রশান্ত অবস্থা, শিথিলকৃত অবস্থা। মেডিটেশন ও শিথিলায়নে এই ওয়েভ বজায় থাকে এবং ভাবাবেগ বা কোনো ধরনের ক্ষোভ সৃষ্টি হলে এ ওয়েভে ছেদ পড়ে।
	থিটা ৪-৭ সাইকেল	গভীর নিদ্রার পূর্বাবস্থা। থিটা লেভেল হচ্ছে উচ্চস্তরের সৃজনশীলতা ও সচেতনতার স্তর। মেডিটেশনকালে সাধকরা আলফা থেকে থিটা স্তরে প্রবেশ করেই মহাচৈতন্যের (Super consciousness) সাথে সংযোগ স্থাপন করেন।
	ডেল্টা ০.৫-৩ সাইকেল	গভীর নিদ্রা। দরবেশ ঋষিরা এই স্তরেও সজাগ থাকেন। আবার মহাচৈতন্যে লীন হতে পারেন।

লাগাম লাগানোর উপায়

আমরা জানি বিশ্রাম, তন্দ্রা বা নিদ্রাকালীন সময়ে অবচেতন মন সবচেয়ে সৃজনশীল থাকে ও ভালোভাবে কাজ করে। আর বিশ্রাম বা তন্দ্রাকালীন সময়ে দেহ, মন পুরোপুরি শিথিল হয়ে গিয়ে ব্রেন ওয়েভ নেমে যায় প্রতি সেকেন্ডে ১৩ থেকে ৪ সাইকেলে, বিজ্ঞানের পরিভাষায় আলফা/থিটা লেভেলে।

এখন যদি আমরা কৃত্রিমভাবে শিথিলায়নের (Relaxation) মাধ্যমে শরীর-মনে বিশ্রাম ও তন্দ্রাকালীন আবহ সৃষ্টি করতে পারি, তাহলেও ব্রেন ওয়েভ নেমে আসবে আলফা/থিটা লেভেলে। আর ব্রেন ওয়েভকে আলফা/থিটা লেভেলে নামিয়ে আনতে পারলেই ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি হবে। অবচেতন মনের গভীরের শক্তিকে কাজে লাগানোর পথ হবে মুক্ত। আপনি প্রবেশ করতে পারবেন মনের আরো গভীরে।

সচেতন মন যেমন অবচেতনকে যথাযথ নির্দেশ প্রদান করতে ও সৃজনশীলভাবে কাজে লাগাতে পারবে, তেমনি পারবে অচেতন বলয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে। আর অবচেতন তখন সেই নির্দেশকে বা ধারণাকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুকূল ব্রেন ফ্রিকোয়েন্সিতে নিরলস কাজে নেমে পড়বে।

শরীর-মনকে শিথিলায়নের মাধ্যমে ব্রেন ওয়েভকে আলফা লেভেলে নিয়ে মনের ধ্যানাবস্থা সৃষ্টিই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, মননিয়ন্ত্রণ, মেডিটেশন বা পরিকল্পিত ধ্যানের প্রথম ধাপ।

অধ্যায়-৬

শিথিলায়ন : মনের বাড়ি

শিথিলায়ন (Relaxation) মননিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত মেডিটেশনের প্রথম স্তর। কারো কারো মতো আপনিও মনে করতে পারেন শিথিলায়নের অনুশীলন করা হচ্ছে একঘেয়ে নিষ্প্রাণ ঝামেলার সাথে নিজেকে জড়ানো। অথবা মনে করতে পারেন আমি তো এমনি এমনি পুরোপুরি আরাম করতে বা শিথিল (Relax) হতে পারি।

দুটোর যে-কোনোটি মনে করে থাকলে আপনি গুরুতর ভুল করছেন। শিথিলায়ন অত সহজ ব্যাপার নয়। আর শিথিলায়ন 'কিছু না করা'কে বোঝায় না। এটি মনের এমন একটি 'ইতিবাচক অবস্থা' যার অভিজ্ঞতা চর্চা ছাড়া খুব কম মানুষই অর্জন করতে পেরেছেন। আর চর্চা ছাড়া ইচ্ছামতো যখন তখন শিথিল হতে পারা আরো বিরল ঘটনা। তাই পুরোপুরি শিথিলায়নের কৌশল আয়ত্ত করা মননিয়ন্ত্রণের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এককথায় বলা যায়, সঠিক শিথিলায়ন মননিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি।

শিথিলায়নের উপকারি দিকগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে আপনার উৎসাহ বাড়াবে-

১. শিথিলায়নকালে শরীরের কার্যক্রম মনিটর ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব থেকে মন অব্যাহতি লাভ করে। (অবশ্য শরীরের অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম গভীর শিথিলায়ন দ্বারাও প্রভাবিত হবে না)। মন অপ্রয়োজনীয় শারীরিক কাজ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ায় প্রকৃতির গভীর ও সূক্ষ্ম স্পন্দন অনুভব করার ক্ষমতা অর্জন করে। নিঝুম ও নিস্তব্ধ পরিবেশে যেমন একটা মৃদু শব্দও আমরা শুনে ফেলি, তেমনি মন যখন শিথিল ও শান্ত থাকে তখন প্রকৃতির সূক্ষ্ম স্পন্দন অনুভব করাও সহজ হয়।

২. আমরা প্রায়ই শুনে থাকি অন্ধদের মাঝে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। এ কথার মধ্যে অবশ্যই সত্যতা রয়েছে। একটা ইন্দ্রিয় যখন কাজ করা থেকে বিরত থাকে তখন অন্য ইন্দ্রিয়গুলো এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যে বেশি সজাগ হয়ে ওঠে। এজন্যে আমরা প্রায়ই দেখি সঙ্গীতের কোনো সূক্ষ্ম সুর বোঝার জন্যে বোদ্ধা তার চোখ বন্ধ করে ফেলেন। আমরা নিজেরাও অনেক সময় কিছু মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে চোখ বন্ধ করি। ইন্দ্রিয়ের কার্যক্রম বন্ধ করার সাথে সাথে মনের এনার্জি পুনর্বিন্যস্ত হয় এবং মনের উচ্চতর মাধ্যমগুলো (Higher faculties) কাজ শুরু করে। আপাত বিরোধী মনে হলেও সত্য যে, এর ফলে বিশ্রামরত ইন্দ্রিয়গুলোও বিশ্রাম পেয়ে সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নিয়মিত শিথিলায়ন করলে দৃষ্টিশক্তি উন্নত হয়, শ্রবণশক্তি বাড়ে ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সজাগ হয়।

৩. শিথিলায়নে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি হয়। আপনি নিজ মনের গভীরে প্রবেশ করেন। মন হয় প্রশান্ত। নিয়মিত শিথিলায়নে মনের প্রশান্তি এত দৃঢ়মূল হয় যে, বাস্তব জীবনের কোনোকিছুই এই প্রশান্তিকে নষ্ট করতে পারে না। কারণ শিথিল শরীরে ক্ষতিকর আবেগ অবস্থান করতে পারে না। দুশ্চিন্তা ও শিথিলায়ন একসাথে সম্ভব নয়। টেনশন বা দুশ্চিন্তা এলে শিথিলতা থাকবে না। আর শরীর শিথিল হলে সেখানে টেনশন বা দুশ্চিন্তা থাকবে না।

এক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর একটি বাণী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'তোমরা উত্তেজিত অবস্থায় দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়, বসা থাকলে শুয়ে পড়।' শিথিলায়নের বিশাল প্রাসাদ এই তত্ত্বের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কারণ উত্তেজনার নিয়মই হচ্ছে কেউ শোয়া অবস্থায় উত্তেজিত হলে বসে পড়ে। বসা থাকলে দাঁড়িয়ে হাঁটাহাঁটি লাফালাফি শুরু করে দেয়। তাই উত্তেজনার বিপরীত অবস্থান হচ্ছে হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়া। এ কারণে দেখা যায় শিথিল শরীরে কোনো ধ্বংসাত্মক আবেগ কাজ করতে পারে না। নিয়মিত অনুশীলনে ধ্বংসাত্মক আবেগ হ্রাস পেতে থাকে এবং একসময়ে তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪. ড. হার্বার্ট বেনসন দীর্ঘ গবেষণার পর প্রমাণ করেছেন যে, শরীর শিথিল হলে হার্ট বিট কমে, দেহে ব্যথা বা আঘাতের অনুভূতি হ্রাস পায়, উচ্চ রক্তচাপ কমে, দম ধীর গতি লাভ করে, রক্তে এড্রিনালিনের পরিমাণ হ্রাস পায়, রক্তে ল্যাকটেটের লেভেল কমে, প্যারা সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের তৎপরতা বাড়ে, দেহে অক্সিজেন গ্রহণ হ্রাস পায়, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, শরীর আপনা থেকেই রোগমুক্তির প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে।

৫. শরীরের শিথিল অবস্থায় সচেতনতার পরিধি বৃদ্ধি পায়। শরীর সক্রিয় রাখার জন্যে যে এনার্জি ব্যয় হতো তা চলে আসে মনের আওতায়। আর মন তা বেশি মাত্রায় কাজে লাগাতে পারে উচ্চতর ক্রিয়া বা দক্ষতার পরিস্ফুটনে। চিন্তার ক্ষমতা (Thought power) তখন বহুগুণে বেড়ে যায়।

৬. নিয়ন্ত্রিত গভীর শিথিলায়নের ফলে চেতনা লাভ করে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ রূপ এবং তখন মনছবি অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায়। সাইকিক বা অতীন্দ্রিয় প্রক্রিয়ায় চেতনার স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সাফল্যের ক্ষেত্রে চিন্তা ও মনছবি অনেকক্ষণ ধরে রাখতে সক্ষম হওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নিজের চিন্তাকে স্বচ্ছভাবে অনুভব এবং সাফল্যের মনছবিকে অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারলেই আপনি সাফল্যের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারবেন।

৭. পূর্ণ শিথিলায়নে মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ে। শিথিল অবস্থায় ব্রেনে আলফা ওয়েভ ছন্দ সৃষ্টি হয়। আর মেডিটেশন, সাইকিক বা অতিচেতনার অধিকারী হওয়ার ট্রেনিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে ইচ্ছেমতো ব্রেনে আলফা ওয়েভ ছন্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়া।

সংক্ষেপে বলা যায়, শিথিলায়ন, মেডিটেশন বা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থানের সুখই আলাদা। এটা এমন একটা সুখ ও আনন্দানুভূতি যা অনুভবের বিষয়, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শিথিলায়নের প্রাথমিক প্রাপ্তিই হচ্ছে প্রশান্তি। আপনি মনের যত গভীরে প্রবেশ করবেন, ততই প্রশান্তিতে অবগাহন করবেন। আপনি দেখবেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কোনো ধরনের টেনশন বা দুশ্চিন্তা আপনার ধারে-কাছে আসতে পারছে না। ক্রোধ, ক্ষোভ বা ঘৃণা সবটাই অনুপস্থিত তখন। যত বেশিক্ষণ সময় আপনি ধ্যানমগ্ন থাকবেন, তত বেশি প্রশান্তি লাভ করবেন।

তাছাড়া শিথিলায়নে বা মেডিটেশনে দেহের রোগমুক্তির প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। দেহের নিজস্ব রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা পুরো মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। টেনশন, দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ, ক্রোধে যে শক্তির অপচয় হতো, ব্রেন সে শক্তিকে তখন নিয়োজিত করে দেহের স্বাস্থ্য উদ্ধারে, মেধার বিকাশে, সম্ভাব্য সংকট নিরসনে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বাস্তবায়নে, চেতনার অভ্রভেদী বিস্তারে।

মনের বাড়ি

এককথায় শিথিলায়ন বা মেডিটেশনের আনন্দকে তাই বলা হয়ে থাকে নিজের বাড়িতে ফেরার আনন্দ। কারণ শিথিলায়নের পথ ধরেই মন তার নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। আর মন তার নিজের বাড়িতে যখন সকল প্রকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অবস্থান করে তখনই সে তার সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার সর্বোত্তম প্রয়োগে সক্ষম হয়। তাই সাফল্যের পথে প্রো-অ্যাকটিভ হওয়ার জন্যে মনের শক্তিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে হলে আপনাকে প্রথমেই মনের জন্যে একটি মনোরম ও প্রশান্তিময় বাড়ি বানাতে হবে। যেখানে আপনি দিনে রাতে যখন খুশি চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চলে যেতে পারবেন এবং নিজের ও মানবতার কল্যাণে মনের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবেন।

আলফা স্টেশন

আলফা স্টেশন এমন একটি সুন্দর স্থান যেখানে আছে ঘন বন, ঝর্না, লেক, সুন্দর বাগান ও একটি ওয়েটিং রুম। প্রথমবার মেডিটেশনের সময় আলফা স্টেশনে এগুলো কল্পনায় বানিয়ে নিতে হবে।

মনের বাড়ি আপনার পছন্দমতো যে-কোনো শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থাপিত হতে পারে। যেমন নদী বা লেকের পাড়ে, দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি বা পার্কের মাঝে, কোনো পাহাড়ের চূড়ায়, হ্রদের মাঝে, কোনো ঝর্না, জলপ্রপাত বা সমুদ্র সৈকতে বা কোনো গভীর বনে বা সমুদ্রের তলদেশে। যেখানেই আপনি মনের বাড়ি বানান না কেন, পরিবেশ এমন হতে হবে যা আপনাকে সবসময় প্রশান্তি দেবে। এই বাড়িতে অনেকগুলো কক্ষ থাকবে। আর তা থাকবে ফুল-ফল-লতা-গুল্মের বাগানে পরিবেষ্টিত। সৌন্দর্য ও আনন্দ যেন ঘিরে থাকে

আপনার মনের বাড়িকে।

আপনার সবচেয়ে পছন্দের বাড়িকে মনের বাড়ি বানাবেন। মনের বাড়ির দহলিজ বা দরবার কক্ষ বা ড্রইংরুম বেশ বড়সড় হবে। ডানদিকে একটি বারান্দা দিয়ে যাবেন বড় আরেকটি কক্ষে। আপনার নিরাময় কক্ষ বা হিলিং সেন্টার হিসেবে এ কক্ষটি কাজ করবে। এছাড়া আপনার প্রয়োজনে মনের বাড়িতে গবেষণা কক্ষ, রেওয়াজ কক্ষ, অভিনয় মঞ্চ, ইবাদত বা প্রার্থনা কক্ষ ইত্যাদি তৈরি করবেন। মনের বাড়িতে যখনই যাবেন তখনই প্রয়োজন অনুসারে কক্ষ সংস্কার, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারবেন।

শিথিলায়ন-১ : শিথিল প্রক্রিয়া

সাফল্য লাভে মনের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্যে মনের বাড়িতে যাওয়ার পথ হচ্ছে শিথিলায়ন। একটু প্রস্তুতি ও সহজ অনুশীলনের মাধ্যমেই আপনি তা আয়ত্ত করতে পারবেন। আপনার অনুশীলনের সুবিধার জন্যে আমরা ধাপে ধাপে শিথিলায়নের পর্যায়গুলো আলোচনা করছি।

১. শিথিলায়ন অনুশীলনের জন্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে একটি নিরিবিলি ঘর বেছে নিন। নিশ্চিত হোন এ সময় কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। দরজা ভালোভাবে বন্ধ করে নিন। টেলিফোন অন্য ঘরে রেখে আসুন অথবা টেলিফোনের আওয়াজ কমিয়ে কাপড় দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখুন যাতে টেলিফোন বাজলেও তার আওয়াজ আপনাকে হতচকিত করে না দেয়। দরজা বন্ধ করলেও ঘরের ভেতরে যাতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। আর ঘর একেবারে অন্ধকার করে ফেলবেন না, হালকা আলো থাকতে হবে। গায়ের পোশাক একটু ঢিলে করে নিন। অনুশীলন শুরুর আগে দুই একদিনের মধ্যে ঘটেছিল এমন কোনো আনন্দদায়ক ঘটনা বা কোনো সুখানুভূতির কথা চিন্তা করুন। সে ঘটনা যত তুচ্ছই হোক না কেন, কিছু যায় আসে না। অনুভূতিটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

২. শক্ত বিছানায় অথবা মেঝেতে মাদুর বা পাতলা কার্পেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন। এভাবে শুতে অসুবিধা হলে মাথার নিচে পাতলা একটি বালিশ দিতে পারেন। তবে বিছানা যত শক্ত হয় ততই ভালো। শোয়ার পর হাত থাকবে দেহের দুপাশে, হাতের তালু থাকবে ওপরের দিকে। দুপায়ের মাঝখানে অন্তত চার আঙুল ফাঁক থাকবে।

বসেও আপনি শিথিলায়ন করতে পারেন। মাদুর পেতে বা কার্পেটের ওপর সুখাসন বা পদ্মাসনে বসতে পারেন অথবা চেয়ারেও আরাম করে সোজা হয়ে বসতে পারেন। পদ্মাসনে বসলে হাতের আঙুল থাকবে হাঁটুর ওপর। আর সুখাসনে বসলে ডান হাত থাকবে বাম হাতের ওপর ঠিক নাভির নিচ বরাবর। চেয়ারে বসলে জুতো-মোজা খুলে প্যান্টের বেল্ট একটু ঢিলে করে নিন। চেয়ারে এমনভাবে বসবেন যাতে পায়ের পাতা ও আঙুল

মাটি স্পর্শ করে এবং হাতের তালু থাকে হাঁটুর ওপর। মেরুদণ্ড ও ঘাড় থাকবে সোজা।

৩. হালকাভাবে চোখ বন্ধ করুন। ভ্রূ ও চেহারা কুঁচকাবেন না। চোখের দুই পাতাকে ধীরে ধীরে একসাথে লেগে যেতে দিন। চোখ বন্ধ করার সাথে সাথেই আপনি কোনো কিছু দেখা থেকে বিরত থাকছেন এবং সবচেয়ে সক্রিয় ইন্দ্রিয় চোখকে বিশ্রাম দেয়ায় কোনোকিছু দেখে উত্তেজিত বা চিন্তাগ্রস্ত হওয়া থেকে রেহাই পাচ্ছেন।

৪. এবার নাক দিয়ে লম্বা দম নিন। আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেবেন বিশেষ পদ্ধতিতে। বুক ফুলিয়ে নয়, দম নেয়ার সাথে ধীরে ধীরে আপনার পেটের উপরিভাগ ফুলবে। আবার দম ছাড়ার সময় পেটের উপরিভাগ চুপসে যাবে। দম নেয়া ও ছাড়ার সময় ধীরে ধীরে পেটের ওপরের অংশ ওঠানামা করবে। এক, দুই, তিন, এভাবে গুণে গুণে ৬ থেকে ১০ বার দম নিন। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়তে সামান্য বেশি সময় নিন। দম নিতে নিতে ভাবুন, 'প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি আমার দেহে প্রবেশ করছে।' আর দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন 'শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে।' এভাবে ৬ থেকে ১০ বার দম নেয়ার পর দম স্বাভাবিক হতে দিন। অর্থাৎ দম নাক দিয়ে নিয়ে নাক দিয়েই ছাড়তে থাকুন।

৫. আপনার চোখ বন্ধ আছে। এক মুহূর্তে মনের চোখে নজর বুলিয়ে যান মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত। এবার প্রথম ১০ সেকেন্ড মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন মাথার তালুর পেশিগুলোতে। আপনি মনোযোগ দেয়ার সাথে সাথে অনুভব করবেন, সেখানে রক্ত চলাচল বাড়ছে। সেখানে একটু গরম গরম লাগছে বা একটু শিরশির করছে। এরপর অনুভব করবেন, তালুর পেশি শিথিল হয়ে আসছে। ভারী হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে আপনি পর্যায়ক্রমে কপাল, চোখ ও চোখের পাতা, ঠোঁট ও জিহবা, চোয়াল, মুখমণ্ডল, গলা, ঘাড়, কাঁধ, ডান হাত, বাম হাত, বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড, পেট, কোমর, নিতম্ব, ঊরু, হাঁটু, পা, গোড়ালি ও পায়ের পাতায় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন। বর্ণিত প্রতিটি অঙ্গে ১০ সেকেন্ড করে মনোযোগ দিন। মনের চোখ দিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গ অবলোকন করুন। অবলোকনের সাথে সাথে অনুভব করবেন প্রতিটি অঙ্গে রক্ত চলাচল বেড়ে যাচ্ছে। পেশি শিথিল হয়ে ভারী হয়ে আসছে। (অনুশীলন শুরুর আগে কোন অঙ্গের পর কোন অঙ্গে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবেন তা কয়েকবার পড়ে মুখস্থ করে ফেলুন। তাহলে অনুশীলনের সময় কোনো অসুবিধা হবে না।) আপনি যখন মাথা থেকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে পায়ের পাতা পর্যন্ত নামতে থাকবেন, তখন অনুভব করুন যে বরফগলা পানি যেমন বরফের গা বেয়ে নিচের দিকে নামে, তেমনি শিথিলতা স্রোতের মতো আপনার গা বেয়ে মাথা থেকে পায়ের দিকে নেমে যাচ্ছে।

৬. ভাবুন আপনার অঙ্গ শিথিল ও নিষ্প্রাণ হয়ে আসছে। এবার আবার ৫ বার নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিয়ে বেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেয়ার চেয়ে ছাড়ার জন্যে সময় একটু বেশি নিন।

এরপর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে দিন।

৭. এবার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন দমের ওপর। বাতাস কীভাবে নাক দিয়ে ঢুকছে তা অনুভব ও মনের চোখে অবলোকন করুন। অনুভব ও অবলোকন করুন বাতাস কীভাবে ফুসফুসের প্রতিটি কোষে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে আসছে। দমের আসা-যাওয়ার ওপর আপনার মনোযোগ দিন। বাতাস স্বাভাবিক যাওয়া-আসা করবে, আপনি শুধু দমের প্রতি খেয়াল রাখুন। (১ থেকে ২ মিনিট আপনি দম অবলোকন করুন। এরপর অনুভব করুন আপনার শরীর ভারী লাগতে শুরু করেছে।

৮. আপনি এবার সচেতন হোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে। কীভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আপনার শরীরকে নিচের দিকে টানছে তা অনুভব করুন। নিজের ওজন অনুভব করুন। অনুভব করুন মাথার ওজন। কাঁধ, বুক, নিতম্ব, হাত, পায়ের ওজন বেড়ে গেছে তা খেয়াল করুন। অনুভব করুন তা ভারী হতে হতে জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। অনুভব করুন দেহের জৈব কোষগুলো আর জৈবকোষ নেই, পরিণত হয়েছে বালুকণায়।

৯. অনুভব করুন আপনার সারা দেহ এখন বালুকণায় পরিণত হয়েছে। এবার অনুভব ও অবলোকন করুন আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে বালুকণাগুলো ঝরে পড়তে শুরু করেছে। আঙুল, হাত, পা, বুক, পেট, উরু সব বালুর মতো ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। আপনি পরিণত হচ্ছেন এক বালুর স্তূপে। যত স্পষ্টভাবে সম্ভব কল্পনা করুন যে, আপনার পুরো শরীর সূক্ষ্ম বালুকণার স্তূপে রূপান্তরিত হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে।

১০. আপনি এখন সূক্ষ্ম বালুকণার স্তূপ। এখন আপনি অনুভব করুন উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে। বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। বাতাস ঝড়ের রূপ নিচ্ছে আর ঝড় আপনার শরীরের অবশিষ্টাংশ হিসেবে যে বালুকণাগুলো রয়েছে তা উড়িয়ে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনার বলতে এখন রয়েছে শুধু আপনার চেতনা, আপনার মন। আপনি এখন পরিপূর্ণরূপে শিথিল। শিথিলায়নের গভীর স্তরে পৌঁছে গেছেন আপনি। আপনার ব্রেন ফ্রিকোয়েন্সি বিটা স্তর থেকে নেমে গেছে আলফায়। মনের বাড়ির পথে এখন আপনি আলফা স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন। এই স্টেশনে আপনার জন্যে রয়েছে বিশেষ ওয়েটিং রুম।

এবার মনে মনে বলুন, আলফা স্টেশন থেকে এখন আমি আরো গভীরে মনের বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমি যতক্ষণ মনের বাড়িতে থাকব, ততক্ষণ বাইরের যে-কোনো অপ্রয়োজনীয় শব্দে আমার মনোযোগ আরো গভীর হবে। তবে আগুন, ভূমিকম্প বা কোনো বিপজ্জনক বা জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আমি যত গভীর লেভেলেই থাকি না কেন, মুহূর্তে পুরোপুরি জেগে উঠব এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

১১. আলফা স্টেশন থেকে মনের বাড়িতে প্রবেশের জন্যে এবার বিশেষ কাউন্ট ডাউন শুরু করুন। ১৯ থেকে

০ গণনার পর আপনি আলোর পথ দিয়ে পৌঁছে যাবেন মনের বাড়িতে। ১৯ উচ্চারণের সাথে সাথে আপনি কল্পনায় অবলোকন করুন শীতল নীল স্নিগ্ধ আলো বর্ষিত হচ্ছে আপনার ওপর। আলোয় আপনি অবগাহন করছেন। আলোর এক দীর্ঘ পথ রচিত হয়েছে আপনার জন্যে। আর সে পথ পৌঁছে গেছে মনের গভীর স্তরে। আপনি ১৮, ১৭, ১৬, ১৫, ১৪, ১৩, ১২, ১১ উচ্চারণ করুন। এবার মনে মনে বলুন, 'আলোর পথ দিয়ে আমি পৌঁছে যাচ্ছি মনের গভীর থেকে গভীরে।' আবার ১০, ৯, ৮, ৭, ৬। মনে মনে বলুন, 'গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে যাচ্ছি আমি।' ৫, ৪, ৩, ২, ১, ০ উচ্চারণ করুন। মনে মনে বলুন, 'আমি পৌঁছে গেছি মনের বাড়িতে।' আর অনুভব করুন এক অনাবিল প্রশান্তি।

১২. মনের বাড়িতে পৌঁছার পর আপনি প্রথমে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি উপভোগ করুন। ফুলের সুবাস, পাতার রং, পাখির কলতান, ঝর্নার শব্দ বা সমুদ্রের তরঙ্গ, আকাশে মেঘের ভেলা, যা যা দেখতে পান সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন, স্পর্শ করুন, অনুভব করুন।

১৩. এবার মনের বাড়ির ড্রইং রুমে আরাম করে বসুন।

১৪. মনের বাড়ি চেতনার এক শক্তিশালী স্তর। এ স্তরে পৌঁছার সাথে সাথে মন দেহের প্রতিরক্ষা ও নিরাময় ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোগমুক্তির কাজে নিয়োজিত করে। এ স্তরে মন যে-কোনো কল্যাণমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্রেনকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে। মনের বাড়িতে আপনার যে-কোনো 'অটোসাজেশন' মস্তিষ্ক সহজেই গ্রহণ করে। এবার ভবিষ্যতের কার্যক্রমের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করুন। মনে মনে বা জোরে জোরে বলুন, 'ভবিষ্যতে শিথিলায়নের উদ্দেশ্যে যখনই আমি চোখ বন্ধ করে আরাম! আরাম! আরাম! উচ্চারণ করব তখনই আমার দেহমনের সকল অপ্রয়োজনীয় তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমি পরিপূর্ণ শিথিল হয়ে যাব। যখনই এরপর ১৯ থেকে ০ গণনা করব তখনই মনের বাড়িতে পৌঁছে যাব।' এরপর মনকে আরো কিছু ইতিবাচক অটোসাজেশন দিতে পারেন। যেমন মনে মনে বলতে পারেন, 'এখন থেকে আমার স্মৃতিশক্তি বাড়বে। আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়বে। আমার মনোযোগ বাড়বে। আমার শরীর ও মন সবসময় সুস্থ থাকবে। অমূলক ভয়ভীতি ও নেতিবাচক চিন্তা বা নেতিবাচক কথার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে আমার মন ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি মুক্ত থাকবে। ইতিবাচক চিন্তা আমার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে। আমি যা চাই ইতিবাচক চিন্তা দিয়ে তা পাব। প্রতিদিন আমি সবদিক দিয়ে ভালো হচ্ছি, লাভবান হচ্ছি, সফল হচ্ছি।'

অটোসাজেশনের ক্ষেত্রে আপনি আপনার মনোদৈহিক বা পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন অনুসারে যে-কোনো ইতিবাচক কথা সংযোজন করতে পারেন। আপনার উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষরই এখন শক্তিতে পরিণত হবে।

১৫. এরপর আপনি সময় নিয়ে মনছবি বা অন্যান্য যা করার প্রয়োজন তা করতে পারেন।

১৬. এবার জেগে ওঠার পালা। আপনাকে এখন মনের বাড়ি থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে হবে। প্রথমে লম্বা দম

নিন। মনে মনে বা আওয়াজ করে বলুন, '০ থেকে ৭ গুণে আমি চোখ মেলে তাকাব, আমি পুরোপুরি জেগে উঠব, পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে উঠব।' এবার গণনা শুরু করুন। ০, ১। অনুভব করুন উড়ে যাওয়া বালুকণাগুলো চারপাশ থেকে এসে আপনার শরীর গঠন করছে। ২, ৩। লম্বা দম নিন। অনুভব করুন বালুকণাগুলো প্রাণবন্ত জৈবকোষে পরিণত হয়েছে। ৪, ৫। আবার লম্বা দম নিন। মনে মনে বলুন, '৭ গুণে আমি চোখ মেলে তাকাব, আমি পুরোপুরি জেগে উঠব, আমার মাথা, ঘাড়, কাঁধ বা শরীরে কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি থাকবে না। পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ, সবল ও চাঙ্গা অনুভব করব।' ৬, ৭। এবার চোখ মেলুন। মাথা ও ঘাড় নাড়ুন। পা টান টান করুন। হাত নাড়ুন। আস্তে আস্তে উঠে বসুন বা দাঁড়ান। জোরে বলুন, 'বেশ ভালো লাগছে। শরীর মন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।'

শিথিলায়নের ১৬ ধাপ

অনুশীলনীর পর্যায়ক্রম যাতে মনে রাখতে পারেন সেজন্যে শিথিলায়নের ১৬টি ধাপের সারসংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো-

১. পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি।

২. আরামে বসা বা শোয়া।

৩. চোখ বোজা

৪. বিশেষ পদ্ধতিতে ৪/৫ মিনিট নাক দিয়ে দম নেয়া ও মুখ দিয়ে ছাড়া।

৫. মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে শরীরের পেশিগুলো শিথিল করা।

৬. ধীর লয়ে দম নেয়া ও দম ছাড়া।

৭. দম অবলোকন করা।

৮. শরীর ভারী লাগতে লাগতে জড় পদার্থে পরিণত হওয়া।

৯. বালুকণার স্তূপে পরিণত হওয়া।

১০. ঠান্ডা ঝড়ে বালুর স্তূপ উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে আলফা স্টেশনে পৌঁছা।

১১. মনের বাড়িতে পৌঁছার জন্যে ১৯ থেকে ০ কাউন্ট ডাউন করা।

১২. মনের বাড়ির পারিপার্শ্বিকতায় হারিয়ে আনন্দ উপভোগ করা।

১৩. মনের বাড়ির ড্রইং রুমে আরাম করে বসা।

১৪. ড্রইং রুমে বসে আত্মউন্নয়নের জন্যে অটোসাজেশন দেয়া।

১৫. ড্রইং রুমে বসে মনছবি করা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভাবনা ভাবা।

১৬. ০ থেকে ৭ গুণে জেগে উঠে পরিপূর্ণ সুস্থ ও চাঙ্গা অনুভব করা।

এই পদ্ধতিতে শিথিলায়ন করার পর প্রথমদিকে আপনার মধ্যে কিছুক্ষণ একটু আড়ষ্টভাব থাকতে পারে। তাই দ্রুত হাত পা নাড়াচাড়া করতে যাবেন না। তাহলে পেশি টান পড়া বা খিঁচুনি লাগতে পারে। অবশ্য আপনার বেশ আরাম লাগবে। তরতাজা একটা অনুভূতি পাবেন। রাতে ঘুমানোর আগে এই শিথিলায়ন করতে গেলে নিজের অজান্তেই হয়তো নাক ডাকা শুরু হয়ে যেতে পারে।

যারা অনিদ্রায় ভোগেন, তারা খুব প্রফুল্লচিত্তে রাতে শোয়ার আগে এই শিথিলায়ন করতে পারেন, ঘুমের ট্যাবলেট ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়বেন। কেউ কেউ আবার অন্য সময়েও এই শিথিলায়ন করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। ঘুম ঘুম ভাব এলে অনুশীলনীর যতটুকু করার পর ঘুম এসেছিল, সেখান থেকে পুনরায় শুরু করুন। আর যদি শুয়ে করতে গেলেই ঘুম চলে আসতে চায় তাহলে চেয়ারে বসে বা মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে আরাম করে বসে শিথিলায়ন করুন।

কেউ কেউ এই শিথিলায়ন করতে গিয়ে বসে বসেও ঝিমাতে পারেন, মুহূর্তে তন্দ্রায় চলে যেতে পারেন। তাদের সচেতন প্রচেষ্টায় ঘুম এড়িয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে আপনি ঘুমের অনুশীলন করছেন না, আপনি শিথিলায়ন করছেন মননিয়ন্ত্রণের জন্যে। ঘুমিয়ে পড়লে আরাম পাবেন ঠিকই কিন্তু শিথিলায়নের আসল উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হবেন, সেইসাথে মননিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া এবং অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ হবে বিলম্বিত।

নিয়মিত শিথিলায়ন করে গেলে আপনার শরীর-মন আপনার সংকেতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেবে (Condition reflex response)। পরিশেষে দেখবেন শিথিল হওয়ার জন্যে এত লম্বা নিয়ম পালন করার প্রয়োজনই হচ্ছে না। শুধু চোখ বন্ধ করে কয়েকবার লম্বা দম নিয়ে এবং ১/২ মিনিট দম অবলোকন করে 'আরাম' 'আরাম' 'আরাম' উচ্চারণের সাথে সাথে আপনার দেহমনের সকল অপ্রয়োজনীয় তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে, আপনি পরিপূর্ণরূপে শিথিল হয়ে যাবেন এবং ১৯ থেকে ০ গণনার সাথে সাথে মনের গভীর স্তরে মনের বাড়িতে পৌঁছে যাবেন। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর-মন আপনার সংকেতের সাথে সম্পৃক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ ধৈর্য ধরে প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করে শিথিলায়ন করে যান।

[মনোশক্তি ব্যবহারের পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলোকে ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করার জন্যে আপনাকে প্রথম এই শিথিলায়ন রপ্ত করতে হবে। এজন্যে নিয়মিত দিনে দুই বার করে ৪০ দিন চর্চার কর্মসূচি নিন। কারণ মেডিটেশন লেভেলে পৌঁছতে পারলেই এর পরবর্তী টেকনিকগুলো সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করতে পারবেন। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা গেছে, নিজে নিজে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যে-কোনো বয়সের নরনারী শিথিলায়ন করতে পারেন।

কেউ ১০/১৫ দিনের মধ্যেই শিথিলায়ন রপ্ত করে ফেলতে পারেন। কারো হয়তো বা নিজে নিজে রপ্ত করতে নিয়মিত ২/৩ মাস চর্চার প্রয়োজন হতে পারে। এই শিথিলায়ন চর্চা আপনার জন্যে আরো সহজ হতে পারে

যদি আপনি যোগ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত কোয়ান্টাম মেথডের শিথিলায়ন অডিও ব্যবহার করতে পারেন। অডিও শুনতে শুনতে এমনিই আপনার শরীর-মন শিথিল হয়ে যাবে।]

স্মরণ রাখুন

শিথিলায়ন বই দেখে সব ধাপ মুখস্থ করে অথবা অডিও শুনে করুন, আপনাকে যা বলা হয়েছে তা শুধু কল্পনা করে যাবেন। যে রকম বলা হচ্ছে ঠিক সে রকম অবলোকন বা অনুভব করতে পারলেন কী পারলেন না, তা নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনাকে যেভাবে অবলোকন বা অনুভব করতে বলা হয়েছে, আপনি ভাববেন বা কল্পনা করবেন যে, আপনি সে রকম অনুভব করছেন। [ঠিক ছোটবেলায় পুতুলের বিয়েতে খুব মজা করে উপাদেয় খাবার খাচ্ছেন বলে যে রকম ভান বা অভিনয় করতেন সে রকম ভান বা অভিনয় করবেন।] তাহলেই চমৎকার শিথিলায়ন হবে।

প্রথমদিকের মেডিটেশনের অনুভূতি

১. মেডিটেশন শেষে মনে হতে পারে আপনি শুধুমাত্র চোখ বন্ধ করে বসে বা শুয়ে ছিলেন। আর কিছুই অনুভব করেন নি। এমন হলেও চিন্তার কিছু নেই। নিয়মিত করে যান। অনুভূতি আসতে থাকবে।

২. কারো শরীর বেশ ভারী লাগতে পারে। এটা শুভ লক্ষণ। আপনার শরীর খুব দ্রুত কথা শুনতে শুরু করেছে।

৩. কারো গরম লাগতে বা শরীর ঘেমে যেতে পারে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কয়েকদিন চর্চা করলেই গরম ও ঘাম স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

৪. কারো মুখে বেশ লালা আসতে পারে। এটাও শুভ লক্ষণ। শরীর প্রথমেই বেশি শিথিল হচ্ছে।

৫. কারো গলা শুকিয়ে যেতে পারে। এমন হলে মনের বাড়িতে থেকেই তেঁতুল বা লেবুর কথা একটু ভাবলেই লালা এসে গলা ভিজিয়ে দেবে।

৬. বসে শিথিলায়ন করলে প্রথম প্রথম প্রায় সবারই ঘাড়ে, কাঁধে বা পিঠে ব্যথা করে। কয়েকদিন নিয়মিত চর্চা করলে এ ব্যথা এমনিতেই দূর হয়ে যায়।

৭. দুয়েকজনের শিথিলায়নকালে মাথা ঘোরা ও বমি বমি ভাব হতে পারে। এমন হলে শিথিলায়নরত অবস্থায়ই লম্বা করে দুই/তিন বার নাক দিয়ে দম নিয়ে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। দেখবেন বমি বমি ভাব বা মাথা ঘোরা ভাব চলে যাবে।

শিথিলায়ন-২ : আরাম প্রক্রিয়া

১. পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর আরাম করে বসুন।

২. হালকাভাবে চোখ বন্ধ করুন।

৩. নাক দিয়ে লম্বা দম নিন। আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেবেন বিশেষ পদ্ধতিতে। বুক ফুলিয়ে নয়, দম নেয়ার সাথে ধীরে ধীরে আপনার পেটের উপরিভাগ ফুলবে। আবার দম ছাড়ার সময় পেটের উপরিভাগ চুপসে যাবে। দম নেয়া ও ছাড়ার সময় ধীরে ধীরে পেটের ওপরের অংশ ওঠানামা করবে। এক, দুই, তিন, এভাবে গুণে গুণে ৬ থেকে ১০ বার দম নিন। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়তে সামান্য বেশি সময় নিন।

নাক দিয়ে দম নিতে নিতে ভাবুন, 'প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি আমার দেহে প্রবেশ করছে।' আর মুখ দিয়ে দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন, 'শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে।' এভাবে ৬ থেকে ১০ বার দম নেয়ার পর দম স্বাভাবিক হতে দিন। অর্থাৎ দম নাক দিয়ে নিয়ে নাক দিয়েই ছাড়তে থাকুন। আপনার শরীর ভারী লাগতে শুরু করবে।

৪. এবার ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম নিন। নাক দিয়েই ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। ৫/৬ বার এভাবে ধীরে ধীরে দম নিন ও ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। শরীর আরো শিথিল হতে থাকবে।

৫. এবার দম স্বাভাবিক হতে দিন। আপনি শুধু দম খেয়াল করুন। বাতাস কীভাবে নাক দিয়ে ফুসফুসে যাচ্ছে এবং আবার বেরিয়ে আসছে তা খেয়াল করুন। মিনিটখানেক দমের প্রতি খেয়াল অব্যাহত রাখুন। দমের প্রতি খেয়াল রাখতে রাখতেই আপনি পুরোপুরি শিথিল হয়ে যাবেন।

৬. এবার আপনার সংকেত শব্দ 'আরাম, আরাম, আরাম' উচ্চারণ করুন। অনুভব করুন, আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনার বলতে এখন রয়েছে শুধু আপনার চেতনা, আপনার মন। আপনি এখন পরিপূর্ণরূপে শিথিল।

শিথিলায়নের গভীর স্তরে পৌঁছে গেছেন আপনি। আপনার ব্রেন ফ্রিকোয়েন্সি বিটা স্তর থেকে নেমে গেছে আলফায়। মনের বাড়ির পথে এখন আপনি আলফা স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন। এই স্টেশনে আপনার জন্যে রয়েছে বিশেষ ওয়েটিং রুম।

এবার মনে মনে বলুন, আলফা স্টেশন থেকে এখন আমি আরো গভীরে মনের বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমি যতক্ষণ মনের বাড়িতে থাকব, ততক্ষণ বাইরের যে-কোনো অপ্রয়োজনীয় শব্দে আমার মনোযোগ আরো গভীর হবে। তবে আগুন, ভূমিকম্প বা কোনো বিপজ্জনক বা জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আমি যত গভীর

লেভেলেই থাকি না কেন, মুহূর্তে পুরোপুরি জেগে উঠব এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

৭. আলফা স্টেশন থেকে মনের বাড়িতে প্রবেশের জন্যে এবার ১৯ থেকে ০ বিশেষ কাউন্ট ডাউন শুরু করুন। ১৯ উচ্চারণের সাথে সাথে আপনি অবলোকন করুন- শীতল নীল স্নিগ্ধ আলোর এক দীর্ঘ পথ পৌঁছে গেছে মনের গভীর স্তরে। আর আপনি সে আলোয় অবগাহন করছেন।

১৮, ১৭, ১৬, ১৫, ১৪, ১৩, ১২, ১১ গণনা করুন, 'আলোর পথ দিয়ে আপনি পৌঁছে গেছেন মনের গভীর থেকে গভীরে।' ১০, ৯, ৮, ৭, ৬ গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে গেছেন আপনি। ৫, ৪, ৩, ২, ১, ০। আপনি পৌঁছে গেছেন মনের বাড়িতে। আর অনুভব করুন এক অনাবিল প্রশান্তি।

৮. মনের বাড়িতে পৌঁছার পর আপনি প্রথমে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি উপভোগ করুন। ফুলের সুবাস, পাতার রং, পাখির কলতান, ঝর্নার শব্দ বা সমুদ্রের তরঙ্গ, আকাশে মেঘের ভেলা, যা যা দেখতে পারেন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন, স্পর্শ করুন, অনুভব করুন।

৯. এবার মনের বাড়ির ড্রইং রুমে আরাম করে বসুন। ড্রইং রুমকে সবসময় মনের মতো করে সাজিয়ে রাখবেন। কারণ এই ড্রইং রুমে বসেই আপনি সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন, অটোসাজেশন, প্রত্যয়ন, মনছবি ইত্যাদি দেখবেন। ড্রইং রুম থেকেই আপনি ডান দিকের করিডোর দিয়ে হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করবেন। আবার এই ড্রইং রুমের বাম কোনায় অবস্থিত দরজা দিয়েই কমান্ড সেন্টারে প্রবেশ করবেন।

১০. মনের বাড়ি চেতনার এক শক্তিশালী স্তর। এ স্তরে পৌঁছার সাথে সাথে মন দেহের প্রতিরক্ষা ও নিরাময় ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোগমুক্তির কাজে নিয়োজিত করে। এ স্তরে মন যে-কোনো কল্যাণমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্রেনকে পুরোপুরি কাজে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়।

মনের বাড়িতে আপনার যে-কোনো 'অটোসাজেশন' মস্তিষ্ক সহজেই গ্রহণ করে। এবার ভবিষ্যতের কার্যক্রমের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করুন। মনে মনে বলুন, 'ভবিষ্যতে শিথিলায়নের উদ্দেশ্যে যখনই আমি চোখ বন্ধ করে আরাম আরাম আরাম উচ্চারণ করব তখনই আমার দেহমনের সকল অপ্রয়োজনীয় তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমি পরিপূর্ণ শিথিল হয়ে যাব। যখনই এরপর ১৯ থেকে ০ গণনা করব তখনই মনের বাড়িতে পৌঁছে যাব।' এরপর মনকে আরো কিছু ইতিবাচক অটোসাজেশন দিতে পারবেন।

অটোসাজেশনের ক্ষেত্রে আপনি আপনার মনোদৈহিক বা পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন অনুসারে যে-কোনো ইতিবাচক কথা সংযোজন করতে পারেন। আপনার উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষরই এখন শক্তিতে পরিণত হবে।

১১. এবার জেগে ওঠার পালা। আপনাকে এখন মনের বাড়ি থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে হবে। প্রথমে লম্বা দম

নিন। মনে মনে বলুন, '০ থেকে ৭ গুণে আমি চোখ মেলে তাকাব, আমি পুরোপুরি জেগে উঠব, পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে উঠব।' এবার গণনা শুরু করুন। ০, ১। আবার লম্বা দম নিন। ২... ৩। আবার লম্বা দম নিন। ৪... ৫। আবার লম্বা দম নিন। মনে মনে বলুন, '৭ গুণে আমি চোখ মেলে তাকাব, আমি পুরোপুরি জেগে উঠব। আমার মাথা, ঘাড়, কাঁধ বা শরীরে কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি থাকবে না। পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ, সবল ও চাঙ্গা অনুভব করব। ৬... ৭।' চোখ মেলুন। মাথা ও ঘাড় নাড়ুন। পা টানটান করুন। হাত নাড়ুন। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান। জোরে বলুন, 'বেশ ভালো লাগছে। শরীর মন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।'

শিথিল প্রক্রিয়া রপ্ত হওয়ার পর চর্চা করতে করতে এমন একটা সময় আসবে যখন আপনি লম্বা দম নিয়ে আরাম, আরাম, আরাম বলে ১৯ থেকে ০ গণনা করে মনের বাড়ি চলে যাবেন। আবার ০ থেকে ৭ গণনা করে বাস্তব জাগ্রত অবস্থায় পৌঁছে যাবেন।

অধ্যায়-৭

আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম-১

মনের বিষ

দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়ত বা প্রোগ্রাম দ্বারাই মন নিয়ন্ত্রিত আর মস্তিষ্ক পরিচালিত হয়। মস্তিষ্কের কাজের ফলাফলও নিরূপিত হয় এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রোগ্রাম দ্বারা। দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রোগ্রাম দুধরনের। এক, আত্মবিনাশী। দুই, আত্মবিকাশী। আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম ধীরে ধীরে একজন মানুষকে অবক্ষয় ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর আত্মবিকাশী প্রোগ্রাম মেধা ও প্রতিভাকে বিকশিত করে। জীবনে আনে প্রশান্তি প্রাচুর্য ও সাফল্য।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, আমাদের অধিকাংশের চিন্তা-জগতের শতকরা ৭০-৮০ ভাগই দখল করে রাখে রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, দুঃখ, অনুতাপ, অনুশোচনা, কুচিন্তা, দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, হতাশা ও নেতিবাচক চিন্তারূপী আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম। এই আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম অধিকাংশ মানুষের জীবনকেই ধীরে ধীরে করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। আমরা যদি এই প্রক্রিয়াকে উল্টে দিতে পারি অর্থাৎ ৭০-৮০ ভাগ চিন্তাকেই আত্মবিকাশী ইতিবাচক চিন্তায় পরিণত করতে পারি, তাহলেই আমরা মনের শক্তিকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগাতে পারব।

ইতিবাচক চিন্তাকে একবার ৭০ ভাগে উন্নীত করতে পারলে নেতিবাচক চিন্তা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তার প্রভাব এতই হ্রাস পাবে যে, তা ইতিবাচক চিন্তার প্রাধান্যের কারণে আপনার জন্যে ক্ষতিকর কিছু করতে পারবে না।

আত্মবিনাশী চিন্তার বিনাশ সাধন প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। এমনকি নেতিবাচক ও ইতিবাচক চিন্তার অনুপাত ৫০:৫০ করাও মনে হতে পারে দুঃসাধ্য। কারণ আমরা নেতিবাচক চিন্তায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, এটা আমাদের চরিত্রের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। তবুও একটু সচেতন প্রচেষ্টা চালালে ধাপে ধাপে আপনি এই নেতিবাচক চিন্তাকে নির্মূল করতে পারবেন। একবার এ প্রক্রিয়া শুরু করলে আপনার কাছে তা এত সুন্দর ও মজার মনে হবে যে, আপনি তাকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবেন। আপনার মধ্যে এমন একটা তৃপ্তি আসবে, যা আপনি ইতিপূর্বে অনুভব করেন নি। তাহলে এবার শুরু করা যাক।

অনুশীলনী-১

বিষণ্নতা বা হতাশায় আক্রান্ত হয়েছেন। সব আজেবাজে চিন্তা মাথায় ভিড় জমাচ্ছে! ভেতরে ক্ষোভ, ঘৃণা বা প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে! ব্যর্থতার গ্লানিতে ভুগছেন! অনুশোচনা আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! ঠিক আছে,

ঘাবড়াবার কিছু নেই। হতাশায় তলিয়ে যান। কিন্তু সময় পাচ্ছেন ঘড়ি দেখে মাত্র পাঁচ মিনিট! পাঁচ মিনিট পর্যন্ত যত নেতিবাচক চিন্তা করতে পারেন করুন।

তারপরই নেতিবাচক চিন্তা বন্ধ করে দিন। নেতিবাচক চিন্তার ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালান। হতাশাকে ছিন্নভিন্ন করে দিন। কারণ এ এক কালসাপ। দুধকলা দিয়ে পুষলে আর প্রশ্রয় দিলে আপনাকেই ছোবল দিয়ে শেষ করে দেবে। তাই বেড়ে ওঠার আগে ভ্রূণেই বিনষ্ট করুন একে।

হাঁ পারতেই হবে। আর আপনি তা পারবেন। কারণ বিষণ্নতা মানেই অশান্তি। আর অশান্তিতে আপনার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ পৃথিবীতে এমনিতেই প্রচুর অশান্তি রয়েছে। আপনি আরেকটা অশান্তি সৃষ্টি হতে না দিলে নিজের যেমন উপকার করবেন তেমনি তা আপনার আপনজন ও সহকর্মীদের জীবনকেও কিছুটা স্বস্তি ও শান্তি দেবে। আর এই ইতিবাচক প্রভাবের ফল অন্যরাও ভোগ করবে।

বিজ্ঞ জ্ঞানীরা সবসময় চিন্তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন আর আপনিও তা-ই চান। কিন্তু দুশ্চিন্তাকে পাঁচ মিনিটের চেয়ে বেশি বাড়তে দিলে দুশ্চিন্তাই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আর তাই উল্টোটা করার জন্যে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে চিন্তার চ্যানেল পাল্টে দিন।

রেডিও-টিভির চ্যানেল পাল্টানোর সাথে সাথে যেমন ভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে, আপনিও ঠিক তেমনি চিন্তাকে চ্যানেল পাল্টে নতুন খাতে নিয়ে যান। ঘরে বসে থাকলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। দেখুন না বাইরে কী হচ্ছে? জানালার ধারে কি কোনো গাছ আছে? গাছে কি কোনো কাঠঠোকরা গর্ত করার চেষ্টা করছে? বা কোনো দোয়েল কি লেজ নাচাচ্ছে? বা কোনো টুনটুনি দম্পতি কি পিঠা তৈরির ব্যাপারে শলাপরামর্শ করছে? বা কোনো পাখি কি নীড়ে ফিরে বাচ্চাদের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে? এর যে-কোনো একটির দিকে মনোযোগ দিন। এদের গতি ও রঙ উপলব্ধি করুন।

কী বললেন? আপনার জানালা দিয়ে কোনো গাছ দেখা যায় না! ঠিক আছে চারতলায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তায় দেখুন না জীবনের গতি। রাস্তার যে-কোনো দিকেই চিন্তাকে প্রসারিত করতে পারেন। আর জানালার কাছে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে যদি অসুবিধা থাকে তবে ভেতরে বসেই তাকান না আকাশের দিকে।

রোদ হচ্ছে, না বৃষ্টি হচ্ছে? মেঘ আছে কী নেই? মেঘ থাকলে প্রতিটি মেঘকেই একটা চেহারা হাত পা বা অবয়ব দিন না! শিল্পীর মতো মেঘগুলোকে রঙে রঞ্জিত করে ফেলুন। কবির মতো কথা বলুন মেঘের সাথে। একসময় মজা পেয়ে নিজেই হেসে উঠবেন হো হো করে। আর এই হাসিই বিষণ্নতা ও হতাশার বিরুদ্ধে সবচেয়ে সফল অস্ত্র!

ঘরের বাইরে থাকা অবস্থায় বিষণ্নতায় আক্রান্ত হলে তাকান না চারপাশে। প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকান,

পোশাকের দিকে তাকান, এমন কাউকে অবশ্যই পেয়ে যাবেন, যার অবস্থা আপনার চেয়েও করুণ। আপনার কী নেই তা নিয়ে ভাবা একেবারেই অর্থহীন। আপনার কী আছে তা নিয়ে ভাবুন। কতটুকু আছে তা ভাবুন।

তারপরে ভাবুন কী কী দরকার। পরিকল্পনা করুন কীভাবে তা পাওয়া যেতে পারে। মনকে বলুন পাওয়ার উপায় চিন্তা করে খুঁজে বের করতে। হতাশ ব্যক্তি সবসময় চিন্তা করে তার গ্লাস অর্ধেক খালি আর সফল ব্যক্তি সবসময় ভাবে তার গ্লাস অর্ধেক ভর্তি। আর এই ইতিবাচক মনোভাবই তাকে আরো সাফল্যের পথে নিয়ে যায়।

চিন্তার চ্যানেল পরিবর্তন করে আপনি নেতিবাচক চিন্তাকে প্রথম পাঁচ মিনিট সময় দেবেন। ক্রমান্বয়ে সময় কমাতে থাকবেন। চার মিনিট। তার কিছুদিন পর তিন মিনিট। তারপর দুই মিনিট।

তারপর এমন সময় আসবে যখন বিষণ্নতা বা দুশ্চিন্তা আসার সাথে সাথেই ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে তাকে অকেজো বা নিউট্রালাইজ করে দিতে পারবেন। আপনি হয়ে উঠবেন আত্মনিয়ন্ত্রিত এক শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। কারণ একজন হতাশ ব্যক্তি সবসময় নিজেকে বিড়ম্বিত, বঞ্চিত মনে করে। আর একজন আশাবাদী ব্যক্তি সবসময় মনে করে আমিই আমার নিয়ন্তা।

আত্মবিনাশী চিন্তা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা

নেতিবাচক চিন্তা ও অনুভূতি থেকে রাগ ক্ষোভ ক্রোধ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার আরেকটি পথ হচ্ছে তা প্রকাশ করা। সাধারণত আমরা আমাদের নেতিবাচক চিন্তা বা কুচিন্তার শতকরা ৯০ ভাগ কখনো প্রকাশ করতে পারি না। কারণ একটাই- 'লোকে শুনলে কী বলবে!' চিন্তার প্রকাশ মনকে হালকা করে। প্রকাশ যত তীব্র হয়, মন তত দ্রুত হালকা হয়ে ওঠে।

শিকারীর হাতে সঙ্গী বা শাবক নিহত হলে পশুর যে হৃদয় নিংড়ানো চিৎকার তা যে-কাউকে ব্যথিত করবে। কিন্তু সেই চিৎকারের পরই দ্রুত সব ভুলে গিয়ে সে জীবনকে নতুন করে গড়ার উদ্যোগ নেয়। কোনো দুঃখ পেলে কেউ যদি আর্তচিৎকার দিয়ে কাঁদতে পারেন, তাহলে তিনি সহজে সে দুঃখ কাটিয়ে উঠতে পারবেন। আর যিনি কাঁদতে পারেন না, তিনি সহজে দুঃখ ভুলতে পারেন না।

মনের বিষ ঝেড়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চমৎকার একটি গল্প আছে। এক গ্রামে এক সাপ বাস করত। ছেলেমেয়েরা খেলতে বেরুলেই সাপ তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলত। গ্রামের মুরুব্বীরা সাপের সাথে দেখা করে অনুরোধ করলেন সে যেন ছেলেমেয়েদের না কামড়ায়। সাপ তাদের অনুরোধ রক্ষা করল এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ সবকিছু ঠিকঠাক চলল। ছেলেমেয়েরা মাঠে খেলাধুলা শেষে প্রতি সন্ধ্যায়ই খুশি মনে বাসায় ফিরে আসতে লাগল।

মুরুব্বীরা এতে খুশি হয়ে সাপকে ধন্যবাদ দিতে গেলেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন যে, সাপ বিধ্বস্ত অসুস্থ হয়ে নিজে নিজেই গিঁট পাকিয়ে পড়ে আছে। তারা সাপকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? কী হয়েছে তোমার? সাপ বিরস কণ্ঠে জবাব দিল, 'তোমরাই তো আমাকে ছেলেমেয়েদের কামড়াতে মানা করেছ।' মুরুব্বীরা জবাব দিলেন, 'তা ঠিক! আমরা কামড়াতে না করেছি, কিন্তু ফোঁস ফোঁস করতে তো না করি নি।'

সাপের এ গল্প থেকে ক্রোধ, ঘৃণা, ক্ষোভ এগুলো মন থেকে প্রকাশ করে ফেলা যে কত জরুরি তা আমরা বুঝতে পারি। বিশিষ্ট মার্কিন শল্য চিকিৎসক ও রোগ নিরাময়ে মনোশক্তি ব্যবহারের প্রবক্তা ড. বার্নি সীগেল খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, 'অপ্রীতিকর অনুভূতিসহ আপনার অনুভূতিগুলো পুরোপুরি প্রকাশ করে ফেলা উচিত। প্রকাশিত হলেই আপনার ওপর এগুলোর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো তখন আপনার জন্যে কোনো জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে না-আপনার মনে কোনো গিঁঠ লাগাতে পারে না।'

কিন্তু সচেতন মনের অনুশাসন সবসময়ই আমাদের চিন্তা প্রকাশের অন্তরায়। অন্যরা খারাপ মনে করবে, এইজন্যে আমাদের অধিকাংশ নেতিবাচক চিন্তা অপ্রকাশ্য থেকে যায়। অধিকাংশ সময়ই রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা মনের ভেতরেই গুমরাতে থাকে। এর ফলে মনে সৃষ্টি হয় এক নেতিবাচক অবস্থা। নোংরা আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থে মনের কক্ষ পূর্ণ হয়ে ওঠে। ভালো জিনিস ঢোকার জায়গাই পায় না তখন।

আমরা যেমন ঘরবাড়ি আসবাব নিয়মিত সাফ করি, তেমনি মনের কক্ষগুলোও নিয়মিত সাফ করা প্রয়োজন। এই সাফ করার পদ্ধতি হচ্ছে লেখা, একটু বিশেষ পদ্ধতিতে লেখা।

অনুশীলনী-২

১. প্রথমে একটি বলপেন নিন। লেখার জন্যে কাগজ নেবেন একেবারে নিম্নমানের। নিম্নমানের নিউজপ্রিন্টই (সংবাদপত্র ছাপার কাগজ) এজন্যে সবচেয়ে ভালো। একটা নীরব কক্ষ বেছে নিন। যেখানে আপনাকে আপাতত কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। এবার বসে লেখা শুরু করুন। সব লিখে যান। যা মনে আসে সব। কোনো বাছ-বিচারের চেষ্টা করবেন না। কোনো সংকোচ করবেন না। কারণ কেউ আপনাকে এখন দেখছে না। আর আপনার এ লেখাও কেউ কোনোদিন দেখবে না। তাই কোনো দ্বিধার প্রয়োজন নেই। লিখে যান আপনার অশান্তি, দুঃখ, ক্ষোভ, অপরাধবোধ, ঘৃণার কথা। লিখুন সব হতাশা, ঈর্ষা, লোভ ও লালসার কথা।

কাউকে অশ্লীল গালিগালাজ করতে ইচ্ছে হয়ে থাকলে তা-ও লিখে ফেলুন। যৌন কল্পনা বা তাড়না বা অনাচারের কথা, যা কাউকে কখনো বলতে পারেন নি, তা-ও লিখে যান অবলীলায়। কারণ প্রতিটি নর-নারীই ষড়রিপু দ্বারা প্রভাবিত। বিজ্ঞ জ্ঞানীরা চেষ্টা করে রিপুকে জয় করেছেন। আর নির্বোধরা রিপুর তাড়নায় ধ্বংস হয়েছে। আপনিও রিপুকে জয় করার চেষ্টা করছেন। তাই লিখতে থাকুন। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধা ঘণ্টা,

এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত লিখে যান। লিখতে লিখতে ক্লান্ত হওয়ার পর আপনি থামুন।

২. এবার একটা খালি টিনের বাক্স নিন। মুড়ির টিন বা বড় ডিব্বা হলেও চলবে। আপনি এতক্ষণ যা লিখেছেন সেই কাগজগুলো টুকরো টুকরো করে টিনের ডিব্বার মধ্যে ফেলুন। এবার একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলুন কাগজের টুকরোগুলো। আপনার সকল ক্ষতিকর চিন্তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন তা বাগানে মাটিতে পুঁতে ফেলুন বা কমোডে ফেলে ফ্লাশ টেনে ভাসিয়ে দিন।

৩. এ প্রক্রিয়া অনুসরণে লাভ হচ্ছে এই যে, মনের ভেতরে যে ক্ষতিকর চিন্তাগুলো আপনাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, তাকে আপনি ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছেন। আপনার টেনশন কমে গেছে। ক্ষতিকর চিন্তাগুলো হচ্ছে অন্ধকারের কীট।

আলোর মুখ দেখলেই সে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। প্রকাশিত হয়ে পড়লেই এর ধ্বংসকারী প্রভাব শেষ হয়ে যায়। আবার তারপরও আপনি ওকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছেন। ফলে তা অন্য কারো হাতে পড়ছে না। তাই আপনারও কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরং দু'তিনবার এমনিভাবে ক্ষতিকর চিন্তা বা কুচিন্তাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলার পর নিজেকে অনেক হালকা লাগবে আপনার, মনে হবে কাঁধ থেকে সিন্দাবাদের বুড়ো যেন নেমে গেল। সফল জীবনের পথে আরেক ধাপ অগ্রসর হলেন।

৪. সাবধান! একটা ব্যাপারে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। কী লিখছেন লিখে ফেলার পর তা কখনোই আর পড়তে যাবেন না। এমনকি লেখা ঠিক হলো কিনা দেখার জন্যেও তা পড়বেন না। লেখা ঠিক হোক বা না হোক, একবারে যা লিখে গেলেন তা সে অবস্থায়ই থাকবে। যদি আপনি আপনার লেখা পড়েন তবে আপনার পুরো শ্রমই হবে পণ্ডশ্রম। কারণ যা আপনি মন থেকে বের করে দিতে চাচ্ছিলেন তা পুনরায় চোখের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তাই সতর্ক থাকুন। লিখে ফেলার পর তা আর কখনো পড়তে যাবেন না।

মেডিটেশন-মনের বিষ দূর

নেতিবাচক চিন্তা বিনাশের জন্যে এতক্ষণ যা করলেন তা পুরোটাই করেছেন সচেতন স্তর বিটা লেভেলে। বিটা লেভেলের এই কাজকে আরো মজবুত করার জন্যে মেডিটেশন লেভেলেও আপনার অনুশীলন প্রয়োজন। কারণ ধ্যানাবস্থায় মনের ওপর যে-কোনো কাজের ছাপ হয় গভীরতর।

১. শিথিলায়নের মাধ্যমে আলফা স্টেশনে ওয়েটিং রুমে পৌঁছে যান। আমরা জানি যে, এটা মনের এমন একটা স্তর যেখানে মনোশক্তি (Mind energy) মূলত সবকিছু তৈরি করতে পারে, সংশোধন করতে পারে। কল্পনাই সেখানে বাস্তবতা, বাস্তবতাই সেখানে কল্পনা।

২. এবার সামনে একটি ব্ল্যাকবোর্ড ও চকখড়ি কল্পনা করুন। কল্পনা করার সাথে সাথে আপনি ব্ল্যাকবোর্ড

দেখতে পাবেন। চক হাতে নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যত ক্ষোভ ও অভিযোগ আছে লিখতে শুরু করুন। ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভ-লালসা কোনো কথাই বাদ দেবেন না। যত খারাপ কথা মনে আসে লিখুন।

কোনো যৌন চিন্তা এসে থাকলে তা-ও লিখুন। কাউকে গালি দিতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার ভয়ে বা সংকোচের কারণে তা দিতে পারেন নি, সে কথাও লিখে ফেলুন। কোনো কুচিন্তা এসে থাকলে তা-ও নিঃসংকোচে লিখে ফেলুন।

ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত লিখুন। যখন দেখবেন আর নেতিবাচক কিছু মনে আসছে না, তখন লেখা বন্ধ করুন। (আপনি লেখা কিছু না দেখতে পেলেও লিখে যান। মনে করুন লিখছেন। এই লেভেলে মনে করাটাই হচ্ছে বাস্তবতা)।

৩. এবার চেয়ারে বসুন। দেখুন সামনের টেবিলে একটি ভেজা ডাস্টার আছে। ডাস্টার তুলে নিন। আস্তে আস্তে ঘষে ঘষে লেখাগুলো মুছে ফেলুন। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা মুছতে মুছতেই আপনার মনে হবে, মনের সব ময়লা মুছে ফেলছেন। পরিতৃপ্তির সাথে গোসল করার পর দেহে যেমন একটা পরিচ্ছন্ন তরতাজা ভাব সৃষ্টি হয় তেমনি মনে হবে আপনার।

৪. এরপর ১৯ থেকে ০ গণনা করে মনের বাড়িতে যান এবং ইতিবাচক অটোসাজেশন প্রদান করে নিয়মমাফিক ধাপে ধাপে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় পৌঁছান।

৫. প্রথমদিকে একদিন পর একদিন এই অনুশীলন করুন। পরে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে করুন। ক্ষোভ, গ্লানি ও পাপবোধ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। একমাস এই অনুশীলনী করার পর আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন নেতিবাচক চিন্তার ওপর আপনার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন আপনার জীবনবোধ কত প্রো-অ্যাকটিভ বা ইতিবাচক হয়ে উঠেছে।

৬. সাবধান! ব্ল্যাকবোর্ডে যা-ই লিখবেন, লিখে যাওয়ার পর তা আর পড়বেন না। এক্ষেত্রেও বিটা লেভেলের নির্দেশাবলি আপনার জন্যে পালনীয়।

মেডিটেশন : মনের বিষ দূর-২

নিয়মমাফিক মনের বাড়ির পথে আলফা স্টেশনে এসে ওয়েটিং রুমে আপনার চেয়ারে আরাম করে বসুন।

আপনি এখন মনের গভীরে জমে থাকা ক্ষোভ ও ঘৃণা এক এক করে তুলে আনবেন। এক এক করে মনে করার চেষ্টা করুন কারো বিরুদ্ধে আপনার মনে কোনো ক্ষোভ আছে কিনা। প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মা-ভাই-বোন-স্বামী-স্ত্রী যে-কারো বিরুদ্ধেই আপনার মনের গহীনে ক্ষোভ লুকিয়ে থাকতে পারে। ক্ষোভ যার

বিরুদ্ধেই হোক না কেন এক এক করে তা সামনের ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে থাকুন-

এক এক করে লিখুন... সময় নিয়ে লিখুন...

এবার আপনার সহকর্মী, সহপাঠী, প্রতিবেশী বন্ধু বা প্রতিপক্ষের কারো বিরুদ্ধে আপনার কোনো ক্ষোভ আছে কিনা তা এক এক করে অনুসন্ধান করুন...এক এক করে সামনের ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে থাকুন।

এবার নিজের বিরুদ্ধে আপনার কোনো ক্ষোভ আছে কিনা এক এক করে সময় নিয়ে খুঁজে বের করে তা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন।

এবার অনুসন্ধান করুন আপনার মনে কোনো ঘৃণা বাসা বেঁধে আছে কিনা... এ ঘৃণা হতে পারে কোনো ব্যক্তি, দল, গোত্র, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। এক এক করে ঘৃণাগুলোকে লিখুন... ঘৃণার উৎস ও কারণগুলোকে লিখুন...

আপনার মনে হতে পারে আপনার মনে কোনো ক্ষোভ বা ঘৃণা নেই... কিন্তু সময় নিয়ে অনুসন্ধান করলেই দেখবেন মনের গভীর থেকে একের পর এক জমে থাকা ক্ষোভ বা ঘৃণা ওপরে ভেসে উঠতে শুরু করেছে...

আপনার সকল ক্ষোভ ও ঘৃণাকে লিখে ফেলেছেন। এবার চিন্তা করুন এই ক্ষোভ ও ঘৃণার বোঝা আপনি কেন অহেতুক বয়ে বেড়াবেন? এ বোঝা বয়ে তো আপনার কোনো লাভ হচ্ছে না।

বরং এই ক্ষোভ ও ঘৃণা নামক বিষ আপনার মনের অসীম শক্তিকে দূষিত করে ফেলছে। আপনার মহান সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করছে। কারণ ঘৃণা নামক বিষ অন্যের চেয়ে নিজের ক্ষতিই বেশি করে। ইতিহাসের দিকে তাকান, দেখবেন ঘৃণা সবসময় ধ্বংসই করেছে। ঘৃণা কোনোদিন কোনো মহান কিছু গড়তে পারে নি।

মানুষ হিসেবে মহান কিছু করার জন্যেই আপনার জন্ম হয়েছে। ক্ষোভ ও ঘৃণা যাতে এই মহান সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে না পারে সেজন্যে এখনই সজাগ হোন। পদক্ষেপ নিন। মনকে বড় করুন। ক্ষমা ও প্রেমে মনকে পরিপূর্ণ করুন।

এবার ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা ক্ষোভ ও ঘৃণাগুলোকে ভেজা ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলুন। লেখাগুলো আর পড়বেন না। কেউ আপনার ক্ষতি করলে বা আপনার বিরুদ্ধে অপরাধ করলে আপনি তাকে সমপরিমাণ শাস্তি দিতে পারেন। এটা আপনার ন্যায্য অধিকার। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা জমিয়ে রাখা আপনার নিজের সম্ভাবনার বিকাশকেই বাধাগ্রস্ত করে।

ক্ষোভ ও ঘৃণা আপনার অনেক জটিল রোগের কারণ হতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা দেখেছেন জমাট বাঁধা ক্ষোভ ও ঘৃণা বহু ক্রনিক ব্যাধি, মানসিক ব্যাধি এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হয়।

তাই মনকে বড় করুন। ক্ষমা করতে শিখুন। ক্ষমাশীল হোন। ক্ষমার মধ্য দিয়েই আপনি আপনার হৃদয়কে প্রেমে পরিপূর্ণ করতে পারবেন। স্রষ্টা ক্ষমাশীলকে পছন্দ করেন। প্রেমময় হৃদয়কে ভালবাসেন।

ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা ক্ষোভ ও ঘৃণাগুলোকে ভেজা ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলার পর এবার ওয়েটিং রুমে ঝর্নার পানিতে অবগাহন করতে থাকুন।

অনুভব করুন, আপনার মনের সকল বিষ দূর হয়ে মন হালকা ও ফুরফুরে হয়ে উঠেছে। মন ক্ষমা, প্রেম ও মমতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঝর্নার পানিতে অবগাহন শেষে নতুন পোশাক পরে নিন। গোলাপের আতর বা সেন্ট স্প্রে করে দিন। গোলাপের গন্ধ পুরোপুরি অনুভব করুন। অনুভব করুন আপনার চারপাশ তাজা গোলাপের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে।

এবার অনুভব করুন ক্ষমা ও প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ হওয়ায় আপনি নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছেন।

মহামানবদের গুণাবলিতে নিজেকে ভূষিত করার প্রত্যয় নিয়ে এবার আলফা স্টেশন থেকে আপনি মনের বাড়িতে যান। অটোসাজেশন, প্রত্যয়ন, মনছবি করে নিয়মমতো পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় চলে আসুন।

মেডিটেশন : দুঃখ দূর

মনের বাড়ির পথে আলফা স্টেশনে যান। স্টেশনের পাশে রয়েছে ঘন বন। আপনি আস্তে আস্তে বনে প্রবেশ করুন। বিশাল অশ্বত্থ গাছের নিচে বসুন। অবলোকন করুন আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চারদিকে বৃষ্টির শব্দ, পশু-পাখির আওয়াজ। বৃষ্টির একটু আধটু ঝাপটা আপনার গায়েও লাগতে শুরু করেছে।

আপনি নিঃসঙ্গ, একা বসে আছেন গাছের নিচে। আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছেন মনের গভীরে। অনুভব করুন মনের গভীরে যে দুঃখগুলো আটকে ছিল বাধভাঙা স্রোতের মতো এখন তা একে একে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

এখন এক এক করে নিজের দুঃখগুলোকে পুরোপুরি অনুভব করুন, অবলোকন করুন...

আপনার দুঃখের কারণ হতে পারে প্রিয়জন বা আপনজনের মৃত্যু। হতে পারে প্রিয় বিচ্ছেদ, বন্ধু বিচ্ছেদ, সন্তান বিচ্ছেদ, আত্মীয়ের সাথে বিচ্ছেদ। হতে পারে খুব আপনজন ভুল বুঝে দূরে চলে গেছে। হতে পারে অর্থনাশ, চাকরিনাশ, সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া... আবার হতে পারে স্নেহ মমতা ভালবাসা থেকে বঞ্চিত

আপনি... হতে পারে নিকটজনের আচরণ আপনাকে মর্মাহত করেছে... হতে পারে বন্ধু বা প্রেমিক/প্রেমিকার বিশ্বাসঘাতকতা আপনার হৃদয়কে ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়েছে... হতে পারে প্রিয়জনের ক্রমাগত অবহেলার শিকার হচ্ছেন আপনি... অথবা নিজের নিঃসঙ্গতা ব্যথিত করছে আপনাকে... দুঃখ-বেদনার কারণ যা-ই হোক, এর স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে সবসময় কান্নায়...

আপনার দুঃখের কারণ যা-ই হোক, আপনি এখন আপনার জমাট বাঁধা দুঃখকে কান্নায় প্রকাশ পেতে দিন...

অবলোকন করুন হৃদয় নিংড়ানো কান্নায় আপনি ভেঙে পড়েছেন। আপনার দুচোখে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে...

আপনার দুঃখের কারণ যদি কারো মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে আপনি জানেন, মৃত্যুকে ঠেকানোর ক্ষমতা আপনার নেই। জীবনের পাশাপাশি মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য। আপনার আপনজন চলে গেছেন। আপনিও একদিন মারা যাবেন। আমরা সবাই মারা যাব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে জীবনের মতো মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এই সত্যকে যত সহজভাবে গ্রহণ করবেন, ততই আপনি বেঁচে থাকার নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন। আপনি যতই দুঃখ করুন না কেন আপনজনকে ফিরিয়ে আনতে পারছেন না। বরং আপনার দুঃখের তীব্রতা আপনাকে যারা ভালবাসে তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করবে।

আর ধর্মে বিশ্বাসী হলে আপনি জানেন, দেহ নশ্বর, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। তাই তার আত্মার প্রশান্তির জন্যে নিয়মিত দোয়া, প্রার্থনা ও সৎকর্ম করতে পারেন। এতে তার আত্মাও তৃপ্তি পাবে। তার আত্মা তৃপ্তি পেলে আপনিও প্রশান্তি পাবেন।

আপনি জানেন মানুষ মারা যায়। কিন্তু তার স্মৃতিকে ধরে রাখা যায়। আপনি শুধুমাত্র দুঃখ বুকে নিয়ে কালাতিপাত না করে তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যে মানবকল্যাণমূলক কিছু করার চেষ্টা করুন। আপনার প্রিয়জন সে কাজের মধ্যে বেঁচে থাকবে।

অবলোকন করুন, অনুভব করুন আপনার অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আপনি কাঁদছেন... শুধু কাঁদছেন... দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে...

জীবনের যত কান্না জমে আছে অবলীলায় তা প্রকাশ পেতে দিন। আপনি কাঁদুন... (বিরতি)
দুঃখের প্রকাশে আপনার মন কিছুটা হালকা হয়েছে এখন...

এবার আপনার দুঃখের কারণগুলো এক এক করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করুন...

কী দুঃখ আপনার... প্রিয়জন বা আপনজনের মৃত্যু বা বিয়োগ কি আপনার হৃদয়কে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে? যদি তা-ই হয়, তবে আপনার দুঃখের কারণ যথার্থ। কিন্তু এক্ষেত্রে কী করার আছে আপনার?

প্রিয় বিচ্ছেদ কি আপনার দুঃখের কারণ? তাহলে এমনও হতে পারে আপনিও বিচ্ছেদ বা ভুল বোঝাবুঝির জন্যে আংশিক দায়ী...

তাহলে এক এক করে কারণগুলো খুঁজে বের করুন। কারণগুলো দূর করার জন্যে কী কী করা যেতে পারে তা দরদ দিয়ে মমতা দিয়ে বিচার করুন...

মনের গভীর থেকে আন্তরিকতার সাথে পুরো পরিস্থিতির পরিবর্তন কামনা করুন, দোয়া করুন, প্রার্থনা করুন...

আপনার দুঃখের কারণ দূর হয়ে সুখের বীজ অঙ্কুরিত হবে...

আবার এমনও হতে পারে কেন যে আপনি দুঃখিত, কেন যে বিষণ্ন তা আপনি নিজেও বোঝেন না...

আপাতদৃষ্টিতে নিজেকে দুঃখী মনে করার কোনো কারণ নেই-তারপরও আপনি বিষণ্ন... যদি তা-ই হয়... তবে এক অর্থে আপনি ভাগ্যবান... কারণ এই অকারণ বিষণ্নতা ও দুঃখবোধ আপনার ক্ষেত্রে সহজেই সৃজনশীল ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে...

আপনার দুঃখের কারণ কি প্রেমে ব্যর্থতা? স্বামী/স্ত্রীর অবহেলা? বন্ধু বিচ্ছেদ? সন্তান বিচ্ছেদ? অর্থনাশ? চাকরিনাশ? সুযোগ নষ্ট? কারো আচরণ বা অবহেলা বা বিশ্বাস ভঙ্গ?

কারণ যদি কারো বিশ্বাসঘাতকতা হয় তাহলে আপনার দিক থেকে করণীয় কিছু নেই... শুধু নিজেকে ধন্যবাদ দিন... আরো পরে বিশ্বাসঘাতকতা করলে আরো বড় বিপর্যয় হতে পারত... তা থেকে বেঁচে গেছেন...

মহামানবরা দুঃখকে যুগে যুগেই সৃজনশীল বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন....

এবার অশ্বত্থ গাছের নিচ থেকে বেরিয়ে আসুন... বৃষ্টিতে ভিজতে থাকুন...

অনুভব করুন সারা শরীর বেয়ে টপ টপ করে বৃষ্টির পানি পড়ছে... বৃষ্টির পানি আপনার সকল দুঃখকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাচ্ছে... আপনার দুঃখ কল্যাণময় শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে... সৃজনশীল শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে... আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে... আপনি সকল দুঃখকে অতিক্রম করেছেন।

দুঃখ জয়ের অনুভূতি নিয়ে নিয়মমাফিক মনের বাড়ি যান। নিয়মমতো পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

মেডিটেশন : অনুশোচনা

মনের বাড়ির পথে আলফা স্টেশনে যান। স্টেশনের পাশে রয়েছে ঘন বন। আপনি আস্তে আস্তে বনে প্রবেশ করুন। বিশাল অশ্বত্থ গাছের নিচে বসুন। অবলোকন করুন আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চারদিকে বৃষ্টির শব্দ, পশু-পাখির আওয়াজ। আপনি একা বসে আছেন গাছের নিচে।

বৃষ্টির শব্দ আর একাকীত্ব আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে অতীতে, মনের গভীরে... অনুভব করুন স্মৃতি থেকে, মনের গভীর থেকে এক এক করে গ্লানি, পাপবোধ, অপরাধবোধগুলো উঁকি দিচ্ছে...

আপনি এখন সময় নিয়ে এক এক করে অপরাধবোধ, পাপবোধ আত্মগ্লানিগুলোকে বের করে আনুন...

এক এক করে স্মরণ করার চেষ্টা করুন...কী কী অন্যায়, কী কী পাপ করেছেন আপনি, অন্যের কোনো ক্ষতি আপনার দ্বারা হয়েছে কিনা ।

যে-কোনো কাজ-যা আপনার মধ্যে পাপবোধের জন্ম দিয়েছে-তার আগাগোড়া সবকিছু স্মরণ করুন।

এমন কোনো কাজ বা অন্যায়-যা করার পর থেকে আপনি অনুশোচনায় ভুগছেন-তা বিস্তারিত মনে করুন... প্রথম দিকে মনে হতে পারে আপনার কোনো পাপবোধ নেই... কিন্তু একটু সময় নিয়ে সন্ধান করলে দেখা যাবে মনের গভীরে কোনো পাপবোধ বাসা বেঁধে আছে...

এক এক করে আপনি আপনার সকল পাপ, অন্যায়, অপরাধ আপনার সামনে নিয়ে আসুন...

কাগজে লিখতে থাকুন... সময় নিয়ে লিখুন...

আপনি এক এক করে সকল পাপ, অপরাধ, অন্যায়ের কথা লিখে শেষ করেছেন।

এবার লেখা কাগজ সব এক এক করে বৃষ্টির পানিতে ফেলে দিন এবং নিজেও বৃষ্টির পানিতে ভিজতে থাকুন...

এবার অতীতের সকল পাপের জন্যে আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করতে থাকুন। আপনি ধর্মে বিশ্বাসী হলে পরম করুণাময়ের কাছে বার বার অনুশোচনা ও তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। (বিরতি ২ মিনিট)

আপনি জানেন পরম করুণাময় অনুশোচনা ও তওবাকারীকে পছন্দ করেন।

এবার অনুভব করুন আপনি আন্তরিকভাবে অনুশোচনা ও তওবা করার পর এখন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছেন। অনুভব করুন আপনার অনুশোচনা এখন এক বিপুল কল্যাণশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ শক্তিকে এখন নিজের ও মানুষের কল্যাণে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারবেন।

এবার নিয়মমাফিক মনের বাড়িতে যান। নিয়মমতো পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় চলে আসুন।

মেডিটেশন : রাগ নিরীক্ষণ

নিয়মমতো আলফা স্টেশনে যান।

আপনি ওয়েটিং রুমে বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়ান। অনুভব করুন আপনি আপনার সকল ধরনের অভিব্যক্তির প্রতিবিম্ব সামনের আয়নায় দেখতে পাচ্ছেন।

আপনি এখন আয়নায় আপনার সত্যিকারের ক্ষোভ অবলোকন করবেন।

১. অতীতে আপনি কাউকে রেগে মারতে গিয়েছিলেন... সে দৃশ্য পুরোপুরি অবলোকন করুন। এখন আপনি তাকে না মেরে হাতের লাঠি দিয়ে বাতাসে প্রহার করুন... গালিগালাজ করতে চেয়েছিলেন... গালিগালাজ করুন... রাগ ও গালিগালাজের অভিব্যক্তিগুলো আয়নায় অবলোকন করুন...

২. অতীতের রাগ ও ক্রোধের ঘটনা এক এক করে স্মরণ করুন... পুরো ঘটনায় আপনি যা যা করেছিলেন... তার পুনরাবৃত্তি করুন... এক এক করে সবগুলো ঘটনার পুনরাবৃত্তি করুন...।

৩. অতীতে কেউ আপনাকে অপমানিত করেছিল আপনি তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কী করেছিলেন... তা অবলোকন করুন। ... ঘটনার পুনরাবৃত্তি বার বার দেখুন।

যার বিরুদ্ধেই আপনার মনে কোনো রাগ, ক্ষোভ বা ক্রোধ থাক না কেন তা এক এক করে প্রকাশ করুন... অহেতুক রাগ চেপে রাখবেন না... রাগ চেপে রাখলে আপনার ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাবে... তাই আপনার সব রাগ ক্রোধ এক এক করে প্রকাশ করতে থাকুন...
কখনো কখনো মনে হতে পারে, না, আমার কোনো রাগ ক্ষোভ নেই... কিন্তু একটু সময় দিলেই আপনি দেখবেন মনের গভীরে লুকানো রাগ, ক্ষোভ বেরিয়ে আসছে... রাগের এই প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ... কারণ অতীতের অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করার মধ্য দিয়েই মন হালকা হয়... মনের গহীনে যে ক্ষত বিরাজ করছে তা মুছে যায় ... আপনি লুকানো রাগ ক্ষোভ মন থেকে বের করে প্রকাশ করতে থাকুন...

আপনি জানেন রাগ প্রকাশ করা বা রাগ চেপে রাখা সহজ। প্রতিপক্ষ দুর্বল হলে আমরা রাগ প্রকাশ করি। আর প্রতিপক্ষ সবল হলে রাগ চেপে রাখি। দুটোই কাজ হিসেবে সহজ।

তবে নিজের রাগ নিরীক্ষণ বা অবলোকন করা বেশ কঠিন কাজ... এবার নিজের রাগকে দেখুন... অতীতে রেগে গিয়ে যখন অযৌক্তিক আচরণ করেছিলেন তা নিরীক্ষণ করুন... দেখুন নিজের আচরণ দেখে নিজেরই হাসি পাচ্ছে... রাগলে যে মানুষ কত বোকার মতো আচরণ করে, তা দেখে আপনার নিজেরই হাসি পাবে... অনুভব করুন নিজের রাগ দেখে নিজেই কৌতুক অনুভব করছেন... এখন থেকে আপনি যখনই নিজের রাগকে নিরীক্ষণ করবেন তখন আপনি নিজেই কৌতুক অনুভব করবেন... আপনার মধ্যে এক দারুণ পরিবর্তন আসবে...

ভবিষ্যতে বাস্তবে রাগ এলেও আপনি তা অনুভব করতে পারবেন... নিজের রাগ ও ক্রোধ নিয়ে নিজেই মজা করতে পারবেন... রাগ বা ক্রোধ আপনাকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না... আপনি ঠান্ডা মাথায়ই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

আপনি পুরোপুরি অনুভব করুন, রাগের মাথায় করা প্রতিটি কাজ বা আচরণে বোকামিরই প্রকাশ ঘটে। পুরো আচরণই হাস্যকর হয়ে ওঠে।

রাগ নিরীক্ষণের ফলে আপনি এখন থেকে ভবিষ্যতে বাস্তবে আপনার ভেতরে রাগ আসতে থাকলেও আপনি বুঝতে পারবেন। আর মুহূর্তে এই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কোয়ান্টা ভঙ্গি প্রয়োগ করতে পারবেন।

এরপর কখনো রাগ আসতে নিলেই কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে মুহূর্তে থামবেন। একটা লম্বা দম নেবেন। কোয়ান্টা ভঙ্গি করবেন। মনকে জিজ্ঞেস করবেন, মন! এই মুহূর্তে আমার সর্বোত্তম করণীয় কী? মন আপনাকে করণীয় বলে দেবে। আপনি ঠান্ডা মাথায় প্রো-অ্যাকটিভভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতিকে সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারবেন। নিজের রাগকে নিয়ে এখন থেকে নিজেই মজা করতে পারবেন।

আপনি জানেন উষ্ণ হৃদয়ের সাথে ঠান্ডা মস্তিষ্কের মিলন ঘটলেই মানব মহামানবে রূপান্তরিত হয়। আপনার হৃদয়ে উষ্ণতা আছে। এবার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে মাথাকে ঠান্ডা রাখুন। উষ্ণ হৃদয়ের সাথে ঠান্ডা মস্তিষ্কের মিলন ঘটিয়ে আপনিও মহামানবে রূপান্তরিত হতে পারেন।

এরপর মনের বাড়িতে যান। নিয়মমতো পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

[মনের বিষ দূর করার এই মেডিটেশনগুলোর যেটি আপনার প্রয়োজন সেটি অনুশীলন করুন। আলফা স্টেশনে বসে প্রতিটি বিষয় কল্পনা করতে বা ভাবতে যতটুকু সময় প্রয়োজন নিন। তারপর নিয়মমতো মনের বাড়িতে যান। তারপর ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।]

অধ্যায়-৮

আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম-২

মনের বাঘ : ভয় ও নেতিকথা

কথায় বলে, 'বনের বাঘে খায় না মনের বাঘে খায়।' মনের বাঘে যে কীভাবে খায় বাংলার প্রাচীন উপকথাই হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জঙ্গলের মাঝে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন এক যুবক। একাগ্রচিত্তে সে ধ্যান করে যাচ্ছে। ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। বৈষয়িক কোনো ব্যাপারেই এখন তার কোনো আগ্রহ নেই। জঙ্গলে হিংস্র প্রাণীর কোনো অভাব না থাকলেও তার ভয়ডর বলে কোনো কিছু ছিল না। সাধনার ফলে এই যুবক একদিন ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে। ঈশ্বর তাকে বর দেন, 'তুমি যা ভাববে, তা-ই হবে।'

ঈশ্বরের বর পেয়ে যুবক আত্মহারা। ভাবল এই গহীন জঙ্গলে সোনার এক বিশাল প্রাসাদ হলে কেমন হয়। সাথে সাথে হলোও তা-ই। আনন্দে লাফিয়ে উঠল সে। হঠাৎ মনে হলো ক্ষুধা লেগেছে তার। ভাবল সোনার থালায় সব সুস্বাদু খাবারের কথা। সাথে সাথে সামনে হাজির। মজাদার সব খাবার খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল সে। শরীর এখন একটু বিশ্রাম চাচ্ছে। সোনার পালঙ্কে গা এলিয়ে দিল।

হঠাৎ তার মনে হলো প্রাসাদের মাঝে থাকলেও এর চারপাশে রয়েছে গহীন জঙ্গল। এখন যদি একটা বিরাট বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে!

আর যায় কোথায়! যেই মনে করা ওমনি এক বিরাট বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলল। সোনার প্রাসাদে পড়ে রইল শুধু তার কয়েক টুকরো হাড়।

এ যুবক বছরের পর বছর জঙ্গলে কাটিয়েছিল, বাঘ তার ধারে কাছেও আসে নি। কিন্তু নিরাপদ সোনার প্রাসাদেও সে মনের বাঘ থেকে রেহাই পেল না।

এ তো গেল ঈশ্বরের বর পাওয়া যুবকের কথা। বর না পেয়েও আমরা একটা ইতিবাচক কথা উচ্চারণ করে যেমন সফল হতে পারি তেমনি একটা নেতিবাচক কথা বার বার উচ্চারণ করেও বিপদ ডেকে আনতে পারি। এমনকি তামাশাচ্ছলে বার বার নেতিবাচক কথা বললেও তা ঘটে যেতে পারে। বাঘ ও রাখাল বালকের গল্পে এই কথাটিই বলা হয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছেন গল্পটি। এক রাখাল বালক 'বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে' বলে চিৎকার করে গ্রামবাসীদের জড়ো করে মজা পেত। প্রথমদিকে গ্রামবাসীরা ভাবত সত্যিই বুঝি বাঘ এসেছে। পরে তারা

বালকের তামাশা বুঝতে পেরে তার কথায় কান দিত না। কিন্তু রাখাল বালক 'বাঘ এসেছে' বলে মাঝে মাঝেই চিৎকার দেয়া অব্যাহত রাখল। দেখা গেল একদিন সত্যি সত্যিই বাঘ এলো এবং রাখাল বালকের প্রাণ সংহার করল।

এই গল্পটির মাঝে প্রাকৃতিক নিয়মের এক মহাসূত্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আর তা হচ্ছে-একটি নেতিবাচক কথাও যদি বার বার উচ্চারিত হয় তবে তা বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারে। কারণ ভাবনা ও শব্দ এক প্রচণ্ড শক্তি। ভাবনা ও শব্দ শুধু বাস্তবতার বিবরণই দেয় না, বাস্তবতা সৃষ্টিও করতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রমাণ চান এ কথার? ঠিক আছে। তেঁতুল নিয়ে একটু ভাবুন না। তেঁতুলের স্বাদ কেমন, একটু কাঁচা তেঁতুলের চাটনি বা পাকা তেঁতুলের আচার পেলে কীভাবে আপনি তার স্বাদ গ্রহণ করবেন তা ভাবুন এবং পাশে বসা বন্ধু/বান্ধবীদের বলুন। দেখুন জিভে পানি এসে গেছে কিনা। বন্ধু/বান্ধবীদের জিভের অবস্থাও জিজ্ঞেস করুন।

শুধু তেঁতুল কেন? খাবার টেবিলে বসে খাবার নিয়ে তামাশা করে দেখুন না কী প্রতিক্রিয়া হয়। নুডুলসকে বলুন, আহা! কেঁচোগুলো কেমন কিলবিল করছে। জেলিকে তুলনা করে দেখুন না জমাটবাঁধা কফ বা সর্দির সাথে! কোনো বিশেষ ভর্তাকে গোবরের সাথে, প্রতিক্রিয়া কী হয় দেখুন।

অনেকের পক্ষে তখন এসব খাবার গ্রহণ করা হবে মুশকিল! অনেকের আসবে বমি বমি ভাব। কেউ কেউ তো বমিও করে ফেলতে পারেন। তবে একই কথায় বা একই খাবার নিয়ে তামাশা যে সবার মধ্যে একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা নয়। প্রতিক্রিয়া জনে জনে হবে ভিন্ন। কিন্তু শক্ত মনোভাব না থাকলে প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়।

নেতিবাচক কথার ক্ষমতা

নেতিবাচক কথার প্রভাব যে কত দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা দেখার জন্যে কয়েকজন বন্ধু একটা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছিলেন। একই অফিসে কাজ করেন তারা। ঠিক করলেন অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান লোকমান সাহেবকে পরপর নেতিবাচক কথা বলে অসুস্থ করা যায় কিনা দেখবেন। যেই পরিকল্পনা সেই কাজ। আগে থেকেই এরা পাঁচ জন পজিশন নিয়ে অফিসে অপেক্ষা করছেন। প্রথম জন লোকমান সাহেব অফিসে ঢোকার সাথে সাথে বললেন, আরে লোকমান সাহেব! আপনার চেহারা আজকে একটু মলিন দেখাচ্ছে! শরীর ভালো আছে তো?

লোকমান সাহেব হেসে বললেন, শরীর তো ভালোই আছে, মলিন দেখাবে কেন? আরেকটু এগিয়ে যেতেই আরেকজন তাকে বললেন, আরে লোকমান সাহেব আপনি কি অসুস্থ? আপনাকে বেশ দুর্বল ও নিষ্প্রাণ

দেখাচ্ছে। কী হয়েছে বলুন তো। রাতে ঘুম হয়েছে তো? বুকে কোনো ব্যথা নেই তো? হার্ট ঠিক আছে তো?

একনাগাড়ে এতগুলো প্রশ্ন শুনে বেচারা লোকমান সাহেব ভাবলেন, আমি কি সত্যি সত্যি অসুস্থ? ভেতরে কোনো অসুবিধা তো অনুভব করছি না। কিন্তু আমাকে অসুস্থ না দেখালে পর পর দুজন একই কথা বলবে কেন? হয়তো কোনো সমস্যা আছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না।

লোকমান সাহেব আরেকটু এগিয়ে গেলে তৃতীয়জন তার সামনে এসে সেই একই কথা বলল। এর সাথে সে আরো যোগ করল, অসুস্থ শরীর নিয়ে অফিসে আসার কী প্রয়োজন ছিল? একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেই তো পারতেন।

এবার তিনি আসলেই ঘাবড়ে গেলেন। ভাবলেন নিশ্চয়ই তিনি অসুস্থ! তা না হলে এরা এভাবে বলবে কেন। অনুভব করলেন, হার্ট বিট যেন একটু বেশি হচ্ছে। এরপর চতুর্থজন। একই কথা। তিনি আরেকটু যোগ করলেন, লোকমান সাহেব আপনি আমার চেয়ারেই একটু বসে বিশ্রাম নিন। আর আমি বরং একজন ডাক্তার আনতে পিওনকে পাঠিয়ে দেই।

লোকমান সাহেব ততক্ষণে রীতিমতো অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছেন। ঘেমে উঠলেন। তাকে বাতাস করা হচ্ছে। বুকের কাপড় খুলে দেয়া হয়েছে। ডাক্তার এসে চেকআপ করে কিছু না পেয়ে স্রেফ বিশ্রাম নিতে বলে চলে গেলেন।

আস্তে আস্তে লোকমান সাহেব সুস্থ বোধ করতে শুরু করলেন। তখন এরা তাদের এক্সপেরিমেন্টের কথা খুলে বলে তার কাছে মাফ চাইলেন। আর লোকমান সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন।

মসনবীর কাহিনী

নেতিবাচক কথার শক্তি সম্পর্কে যে শুধু আধুনিককালের বিজ্ঞানীরাই সচেতন, তা নয়। আমাদের অতীতের সাধকরাও এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এক্ষেত্রে হযরত জালালউদ্দিন রুমীর মসনবীর একটি গল্প বিশেষ অর্থবহ। গল্পটি এরকম-

গ্রামের মাদ্রাসা। মাদ্রাসার ওস্তাদজী অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান। কোনো অসুখ-বিসুখ নেই তার। মাদ্রাসার পাশেই তার বাসস্থান। প্রতিদিন নিয়মমতো মাদ্রাসায় আসেন। ছাত্রদেরও নিয়মমতো আসতে হয়। ওস্তাদজীর যেহেতু কোনো অসুখ-বিসুখ হয় না, তাই মাদ্রাসায় কোনো অতিরিক্ত বা হঠাৎ ছুটি হয় না।

সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু কয়েকজন ছাত্রের কাছে নিয়মিত ক্লাস করা বিরক্তিকর বিষয় হয়ে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে ছাত্রনেতাও জুটে গেল একজন। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়ও বাতলে দিল

ছাত্রনেতা।

ছাত্রনেতার পরামর্শ অনুসারে পরদিন একশন শুরু করল ছাত্ররা। প্রতিদিনের ন্যায় সকালবেলা গোসল ও খাওয়াদাওয়া করে পান চিবুতে চিবুতে ওস্তাদজী মাদ্রাসায় প্রবেশ করলেন। মাদ্রাসায় প্রবেশ করতেই একজন ছাত্র বলল, 'আসসালামু আলাইকুম ওস্তাদজী! আপনার শরীর ভালো তো। আপনাকে কেমন কেমন যেন লাগছে!' শরীরের প্রসঙ্গ তোলায় ওস্তাদজী বিরক্ত হলেন। ধমক দিয়ে পড়তে বসতে বললেন। দ্বিতীয় ছাত্রও সালাম দিয়ে বলল, ওস্তাদজী আপনাকে কেমন যেন লাগছে! আপনার অসুখ করে নি তো! ওস্তাদজী তাকেও ধমক দিয়ে পড়তে বসতে বললেন। তার বিরক্তি বেড়ে গেল। তৃতীয় ছাত্রও সালাম দিয়ে বলল, ওস্তাদজী! আপনার জ্বর আসে নি তো। চোখ কেমন যেন লাল লাল মনে হচ্ছে! ওস্তাদজী তাকেও ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলেন। ছাত্রদের আচরণে তিনি বিরক্তির সাথে সাথে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। এরপর চতুর্থ ছাত্রও সালাম দিয়ে বলল, ওস্তাদজী আপনি কি খুব অসুস্থ! আপনার মাথা চক্কর দিচ্ছে না তো!

ওস্তাদজী ছাত্রদের এহেন কথাবার্তায় রীতিমতো উত্তেজিত। আর উত্তেজিত হলে অনেকেরই চোখমুখ লাল হয়ে যায়, গরম হয়ে ওঠে। মাথা চক্কর দেয়। চতুর্থ ছাত্রের কথায় ওস্তাদজীর খেয়াল হলো-তাই তো, চোখমুখ কেমন যেন গরম গরম লাগছে। মাথাও একটু কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠছে! পঞ্চম ছাত্র সালাম দিয়ে এবার বলল, ওস্তাদজী আপনি কি একটু আরাম করবেন! আমরা কি আপনাকে একটু বাতাস করে দেবো! মাথায় পানি ঢেলে দেবো!

ওস্তাদজীর জন্যে এ কথাগুলোই যথেষ্ট ছিল। তিনি কিছুটা অসুস্থ অনুভব করতে লাগলেন। আর তার সব রাগ গিয়ে পড়ল বেগম সাহেবের ওপর। তিনি ছাত্রদের পড়তে বলে ফিরে এলেন বাসায়।

রাগতস্বরে বেগম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার যে অসুখ এটা তোমার চোখে পড়ে নি। তার স্ত্রী বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, একটু আগেই তো আপনি গোসল সেরে তৃপ্তির সাথে খাওয়াদাওয়া করে মাদ্রাসায় গেলেন। আপনার অসুখ হলো কখন!

ওস্তাদজী তখন উত্তেজিত! ঝাঁঝ মেশানো গলায় বললেন, আমার ছাত্ররা দেখছে আমি অসুস্থ! আর তোমার চোখে আমার অসুখ ধরা পড়ে না! নিশ্চয়ই তোমার নিয়ত খারাপ হয়ে গেছে। আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি। এখন আর আমার দিকে নজর নেই। নিশ্চয়ই তোমার নজর অন্য দিকে চলে গেছে।'

বেচারী স্ত্রী তো একেবারে অপ্রস্তুত। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে এবার এগিয়ে এসে স্বামীর কপালে হাত দিলেন। আসলে তাপমাত্রা স্বাভাবিক। কিন্তু বলতে পারলেন না সত্য কথাটি। পাছে স্বামী আরো উত্তেজিত হয়ে পড়েন। স্বামীর দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, তাই তো একটু গরম গরমই লাগছে।

উত্তেজিত ওস্তাদজী বললেন, একটু না অনেক। স্ত্রী আর কী করেন। স্বামীকে খাটিয়ায় শুতে বলে মাথায় পানি ঢালতে ও বাতাস করতে লাগলেন।

এদিকে মাদ্রাসায় ছাত্ররা তাদের নেতাকে পাকড়াও করে বলল, কী রে! লাভ তো হলো না। মাদ্রাসা তো ছুটি হলো না! ছাত্র নেতা বলল, হবে হবে। চল সবাই মিলে জোরে চিৎকার করে পড়তে শুরু করি। যেই পরামর্শ সেই কাজ। সবাই জোরে চিৎকার করে আলিফ জবর আ, বে জবর বা পড়া শুরু করল।

অসুস্থ মানুষের কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর বিষয় হচ্ছে আওয়াজ। ওদিকে ছাত্রদের শোরগোলে ওস্তাদজীর মেজাজ তখন গামা লেভেলে। জোরে বললেন, বেয়াদবের দল! যা তোদের ছুটি।

আর যায় কোথায়! জেলভাঙা কয়েদির মতো ছাত্ররা তখন মাঠে গোল্লাছুটে ব্যস্ত হয়ে উঠল। অভিভাবকরা অবাক। এ সময় তো তাদের মাদ্রাসায় থাকার কথা। মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছে কেন। জিজ্ঞেস করায় তারা বলল, ওস্তাদজী অসুস্থ। তাই মাদ্রাসা ছুটি।

অসুস্থ ওস্তাদজীকে দেখার জন্যে গ্রাম থেকে লোক এলো। কেউ কলা, কেউ মুলা, কেউ মুরগি, কেউ ফল হাতে। একজন নিয়ে এলো হেকিম সাহেবকে। হেকিম সাহেব নাড়ি দেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, না তেমন কিছু না। ওস্তাদজী একটু উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এখন একটু চিন্তা করুন, পাঁচজন কিশোর নেতিবাচক মিথ্যা কথা বার বার উচ্চারণ করে যদি একজন স্বাস্থ্যবান শিক্ষককে অসুস্থ করে দিতে পারে, তাহলে যাদেরকে আমরা জ্ঞানী বুদ্ধিমান ভাবি, তাদের নেতিবাচক কথার প্রভাব কত মারাত্মক হতে পারে! সন্তানের ওপর অভিভাবকের নেতিবাচক কথার প্রভাব কত গুরুতর হতে পারে!

সন্তানের ওপর নেতিবাচক কথার প্রভাব

নেতিবাচক কথার প্রভাব যে সন্তানের ওপর কত মারাত্মক হতে পারে তা জানেন না বলেই বহু মা-বাবা ছেলে বা মেয়ের ওপর কোনো ব্যাপারে বিরক্ত হলেই বলেন যে, 'এর দ্বারা কিছুই হবে না' বা 'এ একেবারে গোল্লায় গেছে।' হয়তো সময়মতো দু'চারদিন পড়তে বসে নি। ওমনি 'তোর দ্বারা তো পড়াশুনা হবে না, খামোকা তোর পেছনে পয়সা নষ্ট করা।'

হয়তো বেকার সন্তান খোঁজাখুঁজি করে চাকরি পাচ্ছে না! বাসায় এসেই জুটছে বকুনি। হয়তো অভিহিত হচ্ছে বিশ্রী কোনো অভিধায়। মা-বাবা হয়তো রাগ বা ক্ষোভ সামলাতে না পেরে কথাগুলো বলছেন, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া যে কত মারাত্মক ও কত সুদূরপ্রসারী তা তারা বুঝতে পারছেন না। তারা বুঝতে পারছেন না

তাদের এই ক্রমাগত নেতিবাচক কথা কীভাবে সন্তানের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে! ক্রমাগত শুনতে শুনতে একসময় তার মনেও ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে যে, তার দ্বারা কোনোকিছু করা সম্ভব নয়।

আমার পেশাগত জীবনে শত শত প্রতিশ্রুতিশীল তরুণের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, মা-বাবারা এদের বুঝতে ভুল করেছেন। এদের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রায়শই নেতিবাচক কথা বলেছেন অথবা কোনো ব্যাপারে একবার ব্যর্থতার জন্যে পিতামাতার কাছ থেকে 'অপদার্থ,' 'অকর্মণ্য,' 'নালায়েক' ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত হয়েছে। বাবা অথবা মা কোনো ব্যাপারে আবেগপ্রবণ হলেই ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তুলে বার বার খোঁটা দিয়েছেন।

সন্দেহ নেই, মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল চান না। কিন্তু কোনো ব্যাপারে সন্তানের সাথে মতের অমিল হলে বা সন্তানের কোনো আচরণে ক্ষুব্ধ হলে মায়েরা অনেক সময় প্রচণ্ড সব নেতিবাচক উক্তি করে ফেলেন। তিনি হয়তো কিছুক্ষণ পরে তা ভুলে যান। কিন্তু এ ধরনের প্রচণ্ড নেতিবাচক উক্তির পুনরাবৃত্তি যে তার প্রিয় সন্তানের জীবনেই 'অভিশাপ' রূপে দেখা দিতে পারে তা তারা কখনো ভাবেন না।

শুধু অশিক্ষিত মা নয়, বহু শিক্ষিত মা-ও আবেগপ্রবণ হলে প্রচণ্ড নেতিবাচক কথা বলে থাকেন, যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া তার প্রিয় সন্তানের ওপরই পড়ে।

পক্ষান্তরে মা-বাবার উৎসাহ সন্তানের ব্যর্থতাকেও সাফল্যে রূপান্তরিত করতে পারে। এরূপ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ডা. আলম। আমেরিকা যাবেন। ভিসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন। একবার, দুবার, তিন বার, চার বার। পাসপোর্টে সিল লাগছে, কিন্তু ভিসা মিলছে না।

মা তাকে নিরুৎসাহিত না করে বলছেন, বাবা আবার দেখ। আবার গিয়ে লাইনে দাঁড়া। পাঁচবার, ছয়বার। ভিসা হলো না। এর মধ্যে মা'র একই কথা। আরেকবার দেখতে ক্ষতি কী?

অন্য সবার ধারণা- এতবার পাসপোর্টে সিল পড়ার পর এই পাসপোর্টে আর ভিসা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মা'র একই কথা- লাইনে দাঁড়াতে ক্ষতি কী?

সপ্তমবার তার ভিসা হয়ে গেল। নতুন যে অফিসার ভিসা দেন তিনি ডাক্তার আলমের সাথে আলাপ করেই মুগ্ধ হন। পাসপোর্টের সিল মারা শেষ পাতা উল্টে দেখেন নি। আর এটা সম্ভব হয়েছে মায়ের উৎসাহের কারণে।

নেতিচিন্তার দৈহিক প্রভাব

ছোটবেলা থেকে বার বার নেতিবাচক কথা শুনতে শুনতে আমাদের মন-মানসিকতা এমনকি ব্রেনও সেভাবে কম্পিউটারের মতো প্রোগ্রামড (Programmed) হয়ে যায়। তখন সত্য না হওয়া সত্ত্বেও এই কথাগুলোই নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করে। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন সাধারণ ধারণা হচ্ছে, বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগে বা জ্বর আসে। বৈজ্ঞানিকভাবে বৃষ্টিতে ভেজার সাথে ঠান্ডা লাগা বা জ্বর আসার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি, ' আরে বৃষ্টিতে ভিজিসনে, সর্দি লাগবে।' শুনতে শুনতে ব্রেন এমনভাবে প্রোগ্রামড হয়ে গেছে যে, বৃষ্টির পানি গায়ে লাগার সাথে সাথে সর্দি বা ঠান্ডা লেগে যায়। বৃষ্টির পানি অনেকের কাছে রীতিমতো এলার্জিতে পরিণত হয়েছে। অথচ গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ বৃষ্টিতে ভিজে দিনভর কাজ করছে, তাদের ঠান্ডা সর্দি লাগে না। আপনিও আজকে থেকে ভাবা শুরু করুন বৃষ্টিতে ভিজলে আপনার কিছু হবে না। প্রত্যয় নিয়ে ভাবুন বৃষ্টিতে ভিজবেন। সুস্থ থাকবেন। দেখবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজেও আপনি সুস্থ থাকছেন। কারণ বৃষ্টির সাথে জ্বর বা সর্দির কোনো সম্পর্ক নেই।

শুধু অন্যের নেতিবাচক কথায় নয়, নিজের নেতিবাচক ধারণা, কথা বা চিন্তাও আপনার মনে একই ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যেমন আপনি মনে করছেন, অমুক কাজটা করতে গেলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার কোমর ধরে যাবে বা এই ধারায় কাজ করে গেলে আমি অসুস্থ হয়ে যাব বা যা গরম পড়েছে তাতে সর্দিগর্মি না হয়েই যায় না, অথবা এতক্ষণ চুলার ধারে রান্না করছি বা দুপুরে রোদে হাঁটছি মাথাব্যথা বা মাথাধরা না হয়েই যায় না। অথবা আপনি কোনো ব্যাপার নিয়ে কারো ওপর বিরক্ত হয়েছেন। তাকে দেখলেই আপনার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, অসহ্য লাগে। আপনি ভাবছেন তাকে দেখলেই আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। যেই ভাবা সেই ফল। কারণ আপনার নার্ভাস সিস্টেম কখনো ভালো-মন্দ বিচার করে না। মনের নির্দেশ বা ইচ্ছা অনুসারে দেহকে কাজ করার নির্দেশ দেয়। আপনি যা ভাবছেন ব্রেন মনে করছে আপনি তা চাচ্ছেন। তাই সেজন্যে প্রয়োজনীয় দৈহিক অবস্থা সৃষ্টি করছে।

অবশ্য প্রতিটি নেতিবাচক চিন্তার সাথে সাথে যে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তা নয়। কারণ দেহের নিজস্ব একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে। তা সবসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আপনি যদি বার বার নেতিবাচক চিন্তা ও শব্দ তরঙ্গ দ্বারা এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দিতে থাকেন, তাহলে আপনার শরীর ও জীবন সমস্যা ভারাক্রান্ত হতে সময় লাগবে না। তখন দেখা যাবে, যে অসুখের কথাই আপনি ভাবছেন, তাতেই আপনি আক্রান্ত হচ্ছেন, সে রোগের লক্ষণই আপনার শরীরে প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্য চিন্তা ও শব্দের শক্তি সবসময় আপনার মনের স্তর ও আবেগের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। চিন্তার ওপর আবেগের সার যত বেশি প্রয়োগ করবেন, সমস্যা তত তীব্র হবে, ফলাফলও হবে তেমন।

ভয় : নেতিচিন্তার জননী

নেতিবাচক চিন্তার জননী হচ্ছে ভয়। ভয় এক অদৃশ্য ভূত। অনেকের জীবনেই ভয় তাড়া করে বেড়ায় ছায়ার মতো। ভয় যে কত ধরনের হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। অবশ্য ভয়কে বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রধানত দুধরনের ভয় পাই। একটার প্রভাব ইতিবাচক। অন্যটির প্রভাব নেতিবাচক। ইতিবাচক ভয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। তা যুক্তিসঙ্গত ও সার্বজনীন। যেমন আগুন লাগার ভয়। যদি আগুনের ব্যাপারে আপনার কোনো ভয় না থাকে তবে আপনি এমন বেপরোয়া হয়ে যাবেন যে, আজ হোক বা কাল আপনি সম্ভবত আগুন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আপনার যদি রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে কোনো ভয় না থাকে তাহলে আপনি আজ হোক বা কাল দুর্ঘটনা ঘটাবেনই। আগুন ও দুর্ঘটনার ভয় আপনাকে সতর্ক ও সজাগ রাখে, আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এ ধরনের যুক্তিসঙ্গত ইতিবাচক ও কল্যাণকর ভয়ের আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

ভয় অনেক সময় সৃজনশীল শক্তিতে পরিণত হতে পারে। যেমন অজ্ঞানতার ভয়। এ ভয়ই স্কুল ও শিক্ষায়তনের জন্ম দিয়েছে। পচা-বাসি খাবারের ভয়ই পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতার জন্ম দিয়েছে।

আমাদের এখানকার মূল আলোচনা হচ্ছে নেতিবাচক ভয় নিয়ে যা আমাদের কুরে কুরে খায়। নেতিবাচক ভয়ের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হচ্ছে-
১. রোগ ভয় । ২. লোক ভয় । ৩. বার্ধক্যের ভয় । ৪. প্রিয়জন বিচ্ছেদের ভয় । ৫. নিরাপত্তার ভয় । ৬. ব্যর্থতার ভয় । ৭. দারিদ্রের ভয় । ৮. পোকা মাকড়ের ভয় । ৯. ভুতের ভয় । ১০. মৃত্যুভয়।

ভয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভয় মৃত্যুভয়। আমরা সবসময় আতঙ্কিত থাকি যদি মারা যাই! ভাবখানা এমন যে আমার আগে কেউ মারা যায় নি। আমিই প্রথম মারা যাব। অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে পৃথিবীতে আসার পর আপনার জীবনে যদি একটি মাত্র সত্য থাকে তবে তা হচ্ছে মৃত্যু। আপনি যত ভালো কাজ করেন না কেন আপনি মারা যাবেন। যেমন নবী রসুল, দরবেশ, মুনি ঋষি, ধর্মবেত্তা সবারই দৈহিক মৃত্যু হয়েছে। আবার সবচেয়ে খারাপ কাজ যারা করেছে, জুলুম করেছে, অত্যাচার করেছে, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছে, তারাও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় নি। লৌহ যবনিকার মাঝেই স্টালিন মারা গেছেন। সিআইএ এফবিআই কেনেডিকে বাঁচাতে পারে নি। হিটলার এটম বোমাপ্রুফ বাঙ্কারে আত্মহত্যা করে ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন। মৃত্যু জীবনের অবধারিত সত্য। তাই মৃত্যুকে ভয় পাওয়া বোকামি মাত্র।

মৃত্যুভয় নিয়ে সুন্দরবনের বিখ্যাত বাঘ শিকারী পচাব্দি গাজীর চমৎকার এক গল্প রয়েছে। ৬৫টি বাঘ শিকারকারী পচাব্দি গাজীর বাবা ও দাদাও ছিলেন বাঘ শিকারী। পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক বাঘ শিকারকারী পচাব্দি গাজীর এক বন্ধু একদিন বলল, ‘পচা তোর বাঘকে ভয় করে না।’ জবাবে পচাব্দি বললেন, ‘না’। ‘তোর

বাবাকে তো বাঘে খেয়েছে! তারপরও তোর বাঘকে ভয় করে না।' পচাব্দির জবাব, 'না'। তোর দাদাকেও তো বাঘে খেয়েছে। তারপরও তোর বাঘকে ভয় করে না।' পচাব্দির সেই একই জবাব 'না'।

এবার পচাব্দির পালা। পচাব্দি তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বাবা কীভাবে মারা গেছে'। বন্ধুর জবাব, 'রাতে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। সকালবেলা সবাই দেখল তিনি মারা গেছেন।' 'তোর দাদা' পচাব্দি জানতে চাইলেন। 'দাদাও রাতে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। সকালবেলা সবাই দেখল তিনি মারা গেছেন', বন্ধু জানাল। এরপর মুচকি হেসে পচাব্দি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কি এখনো রাতে বিছানায় ঘুমাস'!

অর্থাৎ বাঘের হাতে মুত্যু আসুক বা বিছানায়, মারা আপনি যাবেনই। মৃত্যু জীবনের অবধারিত সত্য। তবে যদি আপনি মৃত্যুকে ভয় পান তবে প্রতিদিন আপনি নব নবভাবে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবেন। আর মৃত্যুকে ভয় না পেলে আপনি শুধু একবারই মারা যাবেন। সেই জন্যেই বলা হয়, ভীরু মরে হাজার বার আর বীরের মৃত্যু একবার।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে মৃত্যুভয় বা যে-কোনো ভয়ের অবস্থান হচ্ছে আমাদের সচেতন মনে। আপনি যদি এই ভয়গুলো কাগজ-কলমে লিপিবদ্ধ করে ফেলেন, তাহলে এগুলোকে যথাযথভাবে শনাক্ত করতে পারবেন। পারবেন এগুলোর উৎস খুঁজে বের করতে। একবার এগুলোকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারলে এগুলোর আকৃতি হবে লিখিত অক্ষরের সমান। তখন আপনি এ ভয়গুলোর বিরুদ্ধে সহজে পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। আমরা যদি আমাদের সচেতনতার সমুদ্রের গভীরে এই ভয়গুলোকে বিচরণ করতে দেই তাহলে আমাদের অজান্তেই এগুলো লালিত পালিত হয়ে নাদুস-নুদুস হয়ে উঠবে। এগুলোর হাত থেকে আমরা কখনো রেহাই পাব না। গভীর সমুদ্রে অনেক বিশাল প্রাণী বাস করে। এগুলোকে যদি কোনোভাবে সমুদ্রের তীরে নিয়ে আসা যায়, তাহলেই এগুলোর মৃত্যু ঘটে। ভয়কেও এই একইভাবে মোকাবেলা করতে হবে।

ভয় কখনো গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের আলো সহ্য করতে পারে না। ভয় হচ্ছে অন্ধকারের কীট। আলোয় এলেই তা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। আমাদের জীবনের সবচেয়ে বেশি সমস্যার কারণ হচ্ছে অনির্দিষ্ট ভয়। 'যদি এমন হয় তবে কী হবে' এই আতঙ্কই আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। তাই আপনার আশঙ্কাকে কাগজে কলমে স্পষ্ট করে লিখে ফেলুন। লেখার পর জিজ্ঞেস করুন, এরপর কী হবে? সবচেয়ে খারাপটাই লিখুন। কাগজে বড় করে লিখুন। যাতে করে আপনি দেখতে পারেন। ভয়ের হাত থেকে বাঁচার সহজ পথ একটাই। তা হচ্ছে ভয়ের কথা কাগজে লিখে তা পুড়িয়ে ফেলা। এভাবে আপনি পর্বত প্রমাণ ভয়কেও নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারেন। কারণ যখনই অজানা জানা হয়ে যায়, তখনই ভয় তার রহস্য ও শক্তি দুই-ই হারিয়ে ফেলে। যেমন অন্ধকারে কাকতাড়ুয়া দেখেও আপনি ভূত ভেবে ভয় পেতে পারেন। কিন্তু একবার টর্চের আলো ফেলুন। ব্যস! সব শেষ। আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ভয়ের উৎস সামান্য খড়কুটো, বাঁশ আর একটা হাড়ি ও একটা

জামা মাত্র।

ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া বা ভয়কে কাবু করার আরেকটা পথ হচ্ছে ভয়কে নিয়ে ঠাট্টা করা। ভয়কে জয় করার জন্যে অবজ্ঞা ও অবহেলার চেয়ে সফল অস্ত্র আর কী হতে পারে। আপনি ক্ষমতা না দিলে আপনার ওপর ভয়ের কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।

ভয়ের বাড়িতে হানা

ভয় সম্পর্কে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, কেউই ভয় থেকে মুক্ত নন। ভয় পান নি পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই। তবে যারা সফল, যারা বীর তারা ভয়কে মোকাবেলা করেছেন, ভয়কে নিয়ে উপহাস করেছেন, ভয়কে অতিক্রম করেছেন। তারা কখনো ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি।

আপনার জীবনেও অনেক পরিস্থিতি আসবে, যার মুখোমুখি হতে আপনি ভয় পান। হয়তো আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডকে ভয় পান, নতুন লোকের সাথে আলাপ করতে ভয় পান, দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় পান, ইনজেকশন নিতে ভয় পান, বিমানে চড়তে ভয় পান।

ঠিক আছে। আপনার এ ভয় নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আপনি শুধু একে মোকাবেলা করুন। ভয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। যে কাজকে ভয় পাচ্ছেন, সাহস করে সে কাজটা করে ফেলুন। বিশ্বাস করুন! আপনি সরাসরি ভয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ভয় পালাবার পথ পাবে না।

আবার এমনও হতে পারে আপনি যে কাজকে ভয় পাচ্ছেন সাহস করে করার পর সে কাজেই অপার আনন্দ লাভ করতে পারেন। যেমন আপনি বিমান ভ্রমণে ভয় পান। বিমানে কোনোদিন ওঠেন নি। সাহস করে উঠে পড়ুন বিমানে। যখন নিচের দিকে তাকাবেন, পৃথিবীকে যখন আকাশ থেকে দেখবেন তখনকার নতুন দৃষ্টি আপনাকে, আপনার উপলব্ধির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।

দাঁতের ডাক্তারের কাছে সাহস করে প্রথমেই চলে যান। হয়তো তিনি আপনার দাঁতকে ফেলে না দিয়ে রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হতে পারেন। সাহস করে ইন্টারভিউ বোর্ডের সম্মুখীন হোন। আপনার চাকরি বা পদোন্নতির দরজা খোলার এটাই তো পথ।

ব্যর্থতার ভয় আপনাকে পেয়ে বসেছে! এটা আপনাকে কাটাতে হবে। তা না হলে আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন না। সাধারণত দেখা গেছে, ব্যর্থ লোকরাই ব্যর্থতাকে ভয় পায়। কারণ তারা শুরু করতেই সাহস পায় না। আপনি সফল হবেন না বলে বিশ্বাস করলে আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন না। আর কাজ শুরু না করা এক গুরুতর অপরাধ।

মনকে বলুন, সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ব্যর্থতা অতিক্রমের মাধ্যমেই আসে সাফল্য। কাজ শুরু করুন। লক্ষ্য উঁচু রাখুন। কথায় বলে, সূর্যের দিকে তীর মারলে তা অন্তত বড় গাছের মগডালে গিয়ে লাগবে। তাছাড়া ব্যর্থতার চিন্তাকেও আপনি ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারেন। যেমন একটি উদ্যোগে যদি আশাব্যঞ্জক ফল না পাওয়া যায় তাহলে এর বিকল্প কী পদক্ষেপ নেয়া যায় আগে থেকেই তা ঠিক করে রাখুন। তখন ভয় আপনার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

আমাদের অধিকাংশের জীবনে ভয় হচ্ছে ভবিষ্যতের কাল্পনিক বিপদ নিয়ে। ভবিষ্যতে কী বিপদ হতে পারে, কী ঝামেলা হতে পারে ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা নিয়ে আপনি আপনার বর্তমানের সুন্দর সময়গুলোকে নষ্ট করছেন। আপনি আগামীকালকে যত বেশি ভয় পাবেন, ততই আপনি আজকের দিনটিকে কাজে লাগাতে ও উপভোগ করতে ব্যর্থ হবেন। বর্তমানকে পুরোপুরি কাজে লাগান, বর্তমান নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাকুন, ভবিষ্যৎ নিজেই নিজের যত্ন নেবে। জীবনকে, জীবনের গতিকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বর্তমানকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান, উপভোগ করুন। কারণ আপনার জীবনে বর্তমান আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না।

ভান করা

ভয়কে জয় করার আরেকটি বড় অস্ত্র হচ্ছে ভান করা। ভান করুন, এমনভাবে অভিনয় করুন যেন আপনার জীবনে ভয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট অকপটে স্বীকার করেছেন- 'আমার জীবনে বহু কিছু ছিল যা নিয়ে আমি প্রথমে ভয় পেতাম। কিন্তু সে কাজগুলো করতে গিয়ে আমি সবসময়ই ভান করতাম যে, আমি আদৌ ভীত নই। ভান করতে করতেই আমার ভয় কমে যেতে লাগল। আমার এখন কোনো কিছু নিয়েই ভয় নেই। ইচ্ছে করলে বেশিরভাগ মানুষের জীবনেই এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।'

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের জীবনে যেটা সত্যি আপনার জীবনেও তা সত্যি হতে পারে। ভয়কে জয় করার জন্যে আপনি একই পন্থা অবলম্বন করুন। জোর করে ভান করুন যে, আপনি ভয় পান নি। আপনি বোঝার আগেই দেখবেন যে, ভানটাই সত্যে পরিণত হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, মনের বাঘের পিঠে সওয়ার হতে হলে আপনাকে নিম্নোক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করতে হবে-

১. ভয়কে মনের গহীনে বাস করতে দেবেন না, তাকে চোখের সামনে তুলে আনুন। কাগজে লিখে ফেলুন। অদৃশ্য দৈত্যকে দৃশ্যমান অক্ষরে পরিণত করুন। তারপর পুড়িয়ে ফেলুন অক্ষরগুলোকে।

২. ভয়কে নিয়ে উপহাস করুন।

৩. ভয়ের উৎস ও কারণগুলো বের করুন।

৪. যে কাজকে ভয় পান সাহস করে তা করে ফেলুন।

৫. মনে সত্যিকার সাহস না পেলে সাহসের ভান করুন। অর্থাৎ এমনভাবে অভিনয় করুন যে, আপনি আদৌ ভয় পান না।

৬. ভয়কে ইতিবাচক ও সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত করুন।

সাধারণভাবে উচ্চারিত নেতিকথা

সাধারণভাবে আমরা কিছু নেতিবাচক কথা উচ্চারণ করি এবং উচ্চারণের দৈহিক প্রতিক্রিয়া ভোগ করি। এগুলো নিম্নরূপ-

১. ..... কে দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত।

২. ..... কে আমি সহ্য করতে পারি না।

৩. ..... আমার জন্যে এক যন্ত্রণা।

৪. ..... কে দেখলেই মাথা ধরে যায়।

৫. ..... খাবার আমার হজম হয় না।

৬. ..... পানীয় আমার গলায় ঢোকে না।

৭. ..... জিনিস খেতে নিলেই বমি আসে।

৮. আমার কিছু হবে না।

৯. আমার পোড়া কপাল।

১০. ভালো কিছুর মুখ জীবনে আর দেখব না।

১১. ..... কে দেখলে গা জ্বালা করে।

১২. আমার চেয়ে হতভাগা কেউ নেই।

১৩. বসকে নিজের কথা বলব কি, সামনে গেলেই তো ভয়ে হাঁটু কাঁপতে শুরু করে।

১৪. পরীক্ষার নাম শুনলেই তো জানা জিনিস ভুলে যাই।

১৫. ইংরেজি বলতে পারি না তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।

১৬. ..... ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। তাই সে আমার চেয়ে যোগ্য।

১৭. আমার কপালে আর সুখ জুটবে না।

১৮. এত দিনেও কিছু পেলাম না, জীবনে কিছু পাবও না।

১৯. আমি শেষ হয়ে গেছি। আমার মরা ছাড়া কোনো পথ নেই।

নেতিপ্রভাব থেকে মুক্তির জন্যে

আপনি যখন এ ধরনের কথা বার বার বলেন তখন আপনার অজান্তেই অবচেতন মন কথার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। অবচেতন মন তখন এটাকেই ভাবে বাস্তবতা। কারণ আমরা আগেই দেখেছি অবচেতন মন বাস্তবতা ও স্রেফ ভাবনার মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারে না।

তাই এখন থেকে আপনি প্রতিনিয়ত কী শব্দ ব্যবহার করছেন সে ব্যাপারে সচেতন হোন। আপনি কী ভাবেন, কী বলেন আর আপনাকে কী বলা হয় তা বিশ্লেষণ করুন। আপনার কথাবার্তা থেকে সকল নেতিবাচক শব্দ ও বাক্য বাদ দিন। কোনো নেতিবাচক শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে সাথে সাথে 'তওবা তওবা' বা 'বাতিল বাতিল' বলুন। নেতিবাচক শব্দটিকে বাতিল করে দিন। প্রতিদিন মনের বাড়িতে গিয়ে অন্তত একবার বলুন, 'অমূলক ভয়-ভীতি, নেতিবাচক চিন্তা ও কথার প্রভাব থেকে আমি সবসময় মুক্ত থাকব।'

নেতিবাচক কথা হঠাৎ উচ্চারিত হলে ইতিবাচক কথা দিয়ে বক্তব্য শেষ করুন। ইতিবাচক কথাই আপনার জীবনে ইতিবাচক ফল আনতে সক্ষম।

মেডিটেশন : ভয় দূর

নিয়মমাফিক আলফা স্টেশনে ওয়েটিং রুমে যান।

আপনি ওয়েটিং রুমে আপনার চেয়ারে বসে আছেন। এবার মনের গভীরে বিরাজমান ভয়গুলোকে এক এক করে মনের গভীর থেকে তুলে আপনার সামনে নিয়ে আসুন।

ক. লোকভয় আপনার কতটুকু পর্যালোচনা করুন... কে কী বলবে, কে কী ভাববে এ নিয়ে কী কী চিন্তা আপনাকে কতখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছে এক এক করে তা বিবেচনা করুন...

খ. রোগ-ব্যাধির অহেতুক ভয়... বার্ধক্যের ভয়... দুর্ঘটনার ভয়... আপনার মনের গভীরে বাসা বেঁধে আছে কিনা অনুসন্ধান করুন...

গ. পোকা মাকড়, চামচিকা বা কোনো জন্তু জানোয়ারের ভয় আপনার আছে কিনা অনুসন্ধান করুন... ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার ভয়, ব্যর্থতার ভয় আপনাকে আচ্ছন্ন করে কিনা... প্রিয়জন বিচ্ছেদের ভয়... মৃত্যুভয়...

ঘ. এছাড়া অন্য কোনো ধরনের ভয় আপনার মনের গভীরে লুকিয়ে আছে কিনা তা সময় নিয়ে খোঁজ করুন... প্রতিটি ভয় আপনি এক এক করে লিখুন...

আপনি আপনার ভয়গুলোর বিবরণ লিখে ফেলেছেন। এবার ভয়গুলো কীভাবে আপনার মনের মধ্যে এলো, তা

এক এক করে বিচার বিশ্লেষণ করুন।

ভয়গুলো লিখে ফেলায় মনের বাঘ এখন কতগুলো লিখিত অক্ষরে পরিণত হয়েছে। এবার সব কাগজ একত্র করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে একটি টিনের কৌটায় রাখুন।

এবার ম্যাচের কাঠি দিয়ে আগুন ধরিয়ে সব কাগজ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলুন। কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর অনুভব করুন আপনার মন থেকে সব ভয় দূর হয়ে গেছে।

আপনি জানেন ভয়ের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। প্রতিটি ভয় হচ্ছে কাল্পনিক। আর ভয়ের উৎস হচ্ছে অতীত। ভয়ের নির্মম শিকার হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তাই যা ঘটে নি, তা নিয়ে অহেতুক আশঙ্কা করে আপনি আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতকে বিষাক্ত ও নিরানন্দ করবেন কেন?

জ্ঞানীরা সবসময় বর্তমানকে নিয়ে বাঁচেন। তারা বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তকে একাগ্রচিত্তে কাজে লাগিয়ে সোনালি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন। আপনি জানেন, এক আনন্দময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্যে সাহসের প্রয়োজন।

এবার অনুভব করুন আপনার অন্তর্গত সত্তা আপনার মধ্যে সাহস সঞ্চার করছে। অনুভব করুন আপনি সাহসী হয়ে উঠেছেন। অনুভব করুন আপনার সাহস বেড়ে গেছে। অনুভব করুন আপনার নিজের ওপর আস্থা বেড়ে গেছে। তাই এবার যে কাজগুলো করতে ভয় পেতেন, তা সাহসের সাথে করুন। বিস্তারিতভাবে সময় নিয়ে কাজটি করুন। সে কাজগুলো যেভাবে করতে পারলে আপনি সুখী হতেন, ঠিক সেভাবে করুন।

সবরকম ভয়মুক্ত হয়ে আস্থা ও সাহসের সাথে কাজ করতে পারলে আপনার মনে যে আনন্দের সঞ্চার হতো তা নিজের মাঝে সঞ্চার করুন।

অনুভব করুন আপনার নিজের ওপরে আস্থা বেড়ে গেছে। আপনি এখন পুরোপুরি সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী।

এরপর নিয়মমাফিক মনের বাড়িতে যান। অটোসাজেশন দিন।

নিয়মমতো পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় চলে আসুন।

মেডিটেশন : নেতিবাচক চিন্তা ও কথার প্রভাব নাশ

নিয়মমতো আলফা স্টেশনে যান।

ওয়েটিং রুমে আপনার চেয়ারে আরাম করে বসুন।

এবার প্রথম শনাক্ত করুন কী কী নেতিবাচক চিন্তা সাধারণত আপনার মনে উদয় হয়। এক এক করে তা আপনার সামনের ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন।

এক এক করে প্রতিটি নেতিবাচক চিন্তা বা নেতিবাচক মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা মনে করুন... সময় নিয়ে মনে করুন... প্রতিটি চিন্তাকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন...

এবার কী কী নেতিবাচক শব্দ বা কথা আপনি বলে থাকেন, তা এক এক করে লিখুন। প্রয়োজনে একাধিক ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করুন।

এবার আপনার নিজের শরীর বা যোগ্যতা সম্পর্কে কী কী নেতিবাচক ধারণা রয়েছে, তা এক এক করে লিখুন। সময় নিয়ে লিখুন।

নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা বা ধারণাগুলো কীভাবে বা কোন ঘটনা থেকে সৃষ্টি হলো তা এক এক করে বিস্তারিতভাবে লিখুন।

আপনি জানেন, নেতিবাচক চিন্তা, ধারণা ও শব্দ আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনার শক্তি ও ক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলে। তাই এই ভ্রান্ত ধারণার বেড়াজাল ছিন্ন করে মুক্তির আনন্দে অবগাহনের জন্যে যা যা লিখেছেন, সেই লেখার ওপর ক্রস চিহ্ন দিয়ে তা কেটে ফেলুন। মনে মনে 'তওবা তওবা' বা 'বাতিল বাতিল' বলুন।

ক্রস চিহ্ন দেয়া বা 'তওবা তওবা' বা 'বাতিল বাতিল' বলার সাথে সাথে নেতিবাচক চিন্তা বা ধারণা বা কথাগুলোর শক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল।

এরপর মনে মনে বলুন, ভবিষ্যতে মনে কোনো নেতিবাচক চিন্তা এলে বা নেতিবাচক কথা বলে ফেললে আমি শুধু মনে মনে তওবা তওবা বা বাতিল বাতিল বলব। সাথে সাথে নেতিবাচক চিন্তা বা কথা তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। এরপর আমি ইতিবাচক বা প্রো-অ্যাকটিভ চিন্তা বা কথা দ্বারা আমার চিন্তা বা কথা শেষ করব। এখন থেকে আমার জীবনে শুধুমাত্র ইতিবাচক বা প্রো-অ্যাকটিভ চিন্তা বা কথারই শুধু প্রভাব বা কার্যকারিতা থাকবে। প্রো-অ্যাকটিভ চিন্তা ও কথার শুভ প্রভাব আমার ভেতরে সুপ্ত গুণাবলিকে ধীরে ধীরে বিকশিত করবে। আমার জীবন সাফল্য, আনন্দ ও প্রশান্তিতে ভরে উঠবে।

এরপর মনের বাড়িতে যান। অটোসাজেশন দিন।

নিয়মমতো পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

মেডিটেশন : হীনম্মন্যতা দূর

[ক্রমাগত নেতিবাচক চিন্তা মনের গভীরে হীনম্মন্যতার জন্ম দেয়। হীনম্মন্যতা এমন এক দুষ্ট ক্ষত যা একদিকে মনোদৈহিক জটিলতা সৃষ্টি করে এবং অপরদিকে সাফল্য ও প্রাচুর্যের পথে অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়। মানুষের অসীম সম্ভাবনার পথে, আত্মবিকাশের পথে এক বড় অন্তরায় হচ্ছে হীনম্মন্যতা। হীনম্মন্যতার

কারণ বেশিরভাগ সময়ই একাধিক। এ কারণগুলোকে শনাক্ত করতে পারলে এগুলোর অসারত্ব খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়। আর এর ফলে সৃষ্ট মনোজাগতিক দাসত্বের শৃঙ্খলও সহজেই ছিন্ন করা যায়।]

১. নিয়মমতো আলফা স্টেশনে যান। ওয়েটিং রুমে বসুন। সামনের বিশাল আয়নায় নিজেকে দেখুন। নিজেকে বিশ্লেষণ করুন। কোন ধরনের হীনম্মন্যতায় আপনি ভোগেন... এক এক করে বের করার চেষ্টা করুন... সময় নিয়ে বিশ্লেষণ করুন...

২. আপনি কি আপনার চেহারা, উচ্চতা, রঙ, রূপ, কণ্ঠস্বর বা শারীরিক কোনো ত্রুটি নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন?...

এটা আপনার প্রাচুর্য ও সাফল্যের পথে অন্তরায় নয়... দেখুন না, মহাকবি শেখ সাদীর চেহারা ছিল গাধার মতো বিশ্রি...
সংগীত সম্রাজ্ঞী লতা মুঙ্গেশকরের চেহারা... মোটেই সুশ্রী নয়।
নেপোলিয়ন বেঁটে ছিলেন...
তৈমুর লং খোঁড়া ছিলেন...
মহিয়সী হেলেন কেলার অন্ধ ও বধির ছিলেন...
বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং পঙ্গু ছিলেন...

৩. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে কি আপনি হীনম্মন্যতায় ভোগেন? প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিছুটা সুবিধা দেয় কিন্তু তা না থাকলেও চিন্তার কিছু নেই। এটা প্রাচুর্য ও সাফল্যের পথে অন্তরায় নয়...

বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক আলভা এডিসন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই বৈদ্যুতিক বাতি, মাইক্রোফোন, চলচ্চিত্রসহ শতাধিক আবিষ্কার করে পৃথিবীকে ঋণী করে রেখে গেছেন...

মাইকেল ফেরাডে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই বিজ্ঞানী হয়েছেন...

লালন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়াই অমর হয়ে আছেন... প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিবিহীন এই ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গবেষণা করেই পণ্ডিতরা এখন পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করছেন...

কোনো ডিগ্রি ছাড়াই শত শত মানুষ ধনকুবের হয়েছেন...
আপনার কোনো ডিগ্রি না থাকলেও আপনি সফল হতে পারেন...

৪. আপনার বংশ পরিচয় নিয়ে কি আপনি হীনম্মন্যতায় ভোগেন? নিজেকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করেন...? ইতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তিদের বেশিরভাগেরই পরিচয় দেয়ার মতো বংশ ছিল না... তারাই নতুন বংশধারা সৃষ্টি করেছেন ...

ভারতের সংবিধান প্রণেতা বাবা আম্বেদকর হরিজন ছিলেন...

খনার বচনের বিদূষী মহিলা খনা নিম্নবর্ণের ছিলেন... শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট প্রেমদাসা বস্তির ছেলে ছিলেন... ধনকুবের এন্ড্রু কার্নেগী, এরিস্টটল ওনাসিস, কিম জু জুং, আর পি সাহা দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন...

মাও সে তুং, হো চি মিন কৃষক পরিবারের সন্তান ছিলেন...
অতএব আপনার কোনো বংশপরিচয় না থাকলেও আপনি সাফল্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী হতে পারেন...

আপনার মাধ্যমেই শুরু হতে পারে নতুন বংশধারা...

৫. আপনার জীবনধারায় কি সবরের অভাব আছে? যে-কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতিতে আপনি কি অস্থির হয়ে পড়েন?
যদি তা-ই হয়... তবে চিন্তা করুন রবার্ট ব্রুশের কথা... অষ্টমবারে যিনি বিজয়ী হয়েছিলেন...

মাও সে তুং-এর কথা। লং মার্চে শতকরা ৯০ জন সঙ্গী নিহত হওয়ার পরও যিনি সবর করেছিলেন... দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলার কথা... ২৯ বছর কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করেছিলেন...

আয়াতুল্লাহ খোমেনীর কথা... শাহের নির্যাতন ও দীর্ঘ নির্বাসন অম্লানবদনে হজম করেছিলেন ... আপনার সবর... আপনার অপেক্ষা করার ক্ষমতা পাহাড়সম বাধাকে টলিয়ে দিতে পারে...

৬. এবার আয়নায় নিজেকে ভালোভাবে অবলোকন করুন। অনুভব করুন, নিজের চেহারা, উচ্চতা, রঙ, রূপ... অনুভব করুন, আপনার কারো মতো হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারো পোশাক, কারো ফ্যাশন, কারো স্টাইল অনুকরণ করার প্রয়োজন নেই। কাউকে অনুকরণ করতে গেলে নিজের সত্তাকেই অপমান করা হয়। ... অনুভব করুন আপনার চেহারা ও শারীরিক অনন্যতাকে। আপনার মতো দ্বিতীয় কেউ এই পৃথিবীতে নেই। অনুভব করুন আপনি আপনার মতোই সুন্দর। আপনি অনন্য। অনুভব করুন আপনার এমন কিছু মেধা, গুণ ও যোগ্যতা রয়েছে যা আর কারো নেই। এই মেধা ও যোগ্যতাকে বিকশিত করেই আপনি সাফল্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী হবেন।

এরপর নিয়মমতো মনের বাড়িতে যান।

নিয়মমতো স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

অধ্যায়-৯

আত্মবিকাশী প্রোগ্রাম-১

অটোসাজেশন ও প্রত্যয়ন

আমরা আগেই জেনেছি, শব্দ বা কথা এক প্রচণ্ড শক্তি। কথা শুধু বাস্তবতার বিবরণই দেয় না, বাস্তবতা সৃষ্টি করে। কথার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি কীভাবে নেতিবাচক কথা জীবনকে, জীবনের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে পারে। এবার আমরা প্রমাণ করব কীভাবে ইতিবাচক কথা আপনাকে সফল করে তুলতে পারে।

ইতিবাচক কথার প্রভাব সম্পর্কে সাধকরা সচেতন ছিলেন সভ্যতার আদি পর্ব থেকেই। প্রতিটি ধর্ম ও দর্শনেই ইতিবাচক কথা বা বাণীর কার্যকারিতা স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি ধর্মের প্রার্থনার মূল সুর ইতিবাচক ধ্বনিরই সমষ্টি। তবে ইতিবাচক কথা বার বার উচ্চারণের ফলে ব্যক্তির আচরণ ও কর্মপদ্ধতিতে কীভাবে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে তা মনোবিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছেন সাম্প্রতিককালে।

মনোবিজ্ঞানীরা একে বলেছেন, 'ব্যক্তি ইমেজ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি : সাফল্যের অনুভূতি নিয়ে আমরা সফলভাবে কাজ করতে শিখি।' আমাদের অতীত সাফল্যের স্মৃতিই বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আত্মবিশ্বাস জোগায়। কথা উঠতে পারে যার অতীতের কোনো সাফল্যের অভিজ্ঞতা নেই অথবা যে শুধুমাত্র ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছে, সে কীভাবে অতীতের সাফল্যের স্মৃতি থেকে শক্তি অর্জন করবে!

তার এই উভয় সংকটকে তুলনা করা যেতে পারে এমন এক বেকার যুবকের সাথে, যে চাকরি পাচ্ছে না। কারণ তার চাকরির কোনো অতীত অভিজ্ঞতা নেই। আর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে না, কারণ সে চাকরি যোগাড় করতে পারে নি। তাহলে উপায়?

উপায় অবশ্যই আছে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের নার্ভাস সিস্টেম (Human nervous system) বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কল্পনার মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারে না। বাস্তব ঘটনায় যে ব্রেন ওয়েভ সৃষ্টি হয়, কাল্পনিক ঘটনার ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ কোনো ঘটনা কল্পনা করলে) সেই একই ব্রেন ওয়েভ সৃষ্টি হয়। আর এই তথ্যই হচ্ছে সাফল্যের পথে নিজেকে পরিচালিত করার এক বড় অস্ত্র। কারণ সাফল্য আরো সাফল্যকে চুম্বকের মতো জড়ো করে। আপনি কল্পনায় গভীর প্রত্যয় নিয়ে নিজেকে সফল বলে ভাবুন, মুখে বার বার সাফল্যের কথা বলুন, বাস্তবেও সাফল্য এসে আপনার পদচুম্বন করবে। ইতিবাচক কথার অন্তর্নিহিত শক্তি এখানেই।

নবীজীর (স) একটি কথা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'কারো সাথে দেখা হলে সালামের পর কুশল জিজ্ঞেস করলে বলবে, শোকর আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি।' একজন মানুষ যদি মন থেকে প্রতিদিন ২০/ ২৫ বার 'আমি ভালো আছি' বলে, প্রকৃতির আইন অনুসারেই সে ভালো থাকতে শুরু করে। কারণ কাল্পনিক সাফল্য সবসময় বাস্তব সাফল্যকে চুম্বকের মতো টেনে আনে।

ফ্রান্সের বিখ্যাত হিপনোথেরাপিস্ট ড. এমিল কোয়ে এই প্রাকৃতিক আইনকে চমৎকারভাবে মনোদৈহিক রোগের চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত করেন। তার বই 'সেলফ মাস্টারি থ্রো অটোসাজেশন' এক্ষেত্রে এখনো পথিকৃত হয়ে রয়েছে।

১৯১০ সালে তিনি অটোসাজেশনের মাধ্যমে রোগমুক্তির জন্যে ক্লিনিক স্থাপন করেন এবং ১৯২৬ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মাইগ্রেন, মাথাব্যথা, বাতব্যথা, এজমা, প্যারালাইসিস, তোতলামি, টিউমার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হাজার হাজার মানুষকে রোগমুক্ত করেন। তবে তিনি নিজে তাদের রোগমুক্ত করতেন না, তিনি রোগীদের নিজে নিজে রোগমুক্ত হওয়ার উপায় শিক্ষা দিতেন।

আর এ উপায়টা ছিল অত্যন্ত সহজ। প্রত্যেক রোগীকে একাগ্র মনোযোগ দিয়ে একটানা ২০ বার বলতে হতো 'ডে বাই ডে ইন এভরি ওয়ে, আই এম গেটিং বেটার এন্ড বেটার'। সকালে বিকালে দুপ্রস্থ একনাগাড়ে বিশ বার বলে যেতে হতো কিছুদিন। ব্যস, রোগ উধাও।

শুধু এমিল কোয়েই নন বাংলাদেশে ফলিত মনোবিজ্ঞানের পথিকৃত প্রফেসর এম ইউ আহমেদ অটোসাজেশন অন্যের ওপর প্রয়োগ করার আগেই তা প্রয়োগ করেছেন নিজের ওপর। ১৯৩৪ সালে প্যারাটাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে চার মাস মিটফোর্ড হাসপাতালে থাকার পর ডাক্তাররা তার বাঁচার আশা নেই বলে তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

তাকে বজরা নৌকা করে বুড়িগঙ্গা দিয়ে নদীপথে গ্রামের বাড়ি মেহেদিগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। এই যাত্রাপথে নদীর নির্মল বাতাস আর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি তাকে জীবন সম্পর্কে এক নতুন উপলব্ধিতে উপনীত হতে সাহায্য করে। তিনি নতুন এক মন্ত্র আবিষ্কার করেন।

সে মন্ত্র হচ্ছে, 'আমাকে বাঁচতে হবে, আমি বাঁচব।' ডাক্তার আশা ছেড়ে দিলেও এই মন্ত্র বা অটোসাজেশন বার বার উচ্চারণ করে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নাজি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ফরাসি প্রতিরোধ বাহিনীর সক্রিয় সদস্য রবার্ট মূলার চরম ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তেও অটোসাজেশন দিয়ে নিজেকে শান্ত রেখে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে বিপদ থেকে বাঁচার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে রয়েছেন। তার 'মোস্ট অব অল দে টট মি হ্যাপিনেস' নামক

স্মৃতিকথায় লিখেছেন, তিনি ১৯৪৩ সালে 'পারিজোঁ' ছদ্মনামে তাঁবেদার ভিকি সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হন। এখানে থেকে তিনি জার্মান সৈন্য মোতায়েন ও চলাচল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতেন।

তাকে জানানো হয় যে, গেস্টাপো বাহিনী তাকে ধরার জন্যে আসছে। তিনি তার অফিস বিল্ডিং-এর ওপরের তলায় এক কোণায় পালান। এমন সময় তিনি জানতে পারেন যে, তিনি যে এখানে আছেন এ কথা জেনেই গেস্টাপো চররা ভবনে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাচ্ছে।

রবার্ট মূলার বেশ কিছুদিন ধরেই ড. এমিল কোয়ের অটোসাজেশন ও ইতিবাচক চিন্তার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিলেন। এই পদ্ধতির সাথে তার পরিচয় হয় এক বন্ধুর মাধ্যমে। বন্ধু টিবিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। ডাক্তার সাফ বলে দিয়েছিলেন যে, তার বাঁচার কোনো আশা নেই। তিনি মূলারকে কোয়ের বই আনার অনুরোধ করেন। মূলার বই এনে দেন এবং নিজেও তা পড়েন। তার বন্ধু টিবি থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠেন। ফলে কোয়ের পদ্ধতির ওপর মূলার বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

এখন এই চরম বিপদ মুহূর্তে মূলার বার বার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন যে, ঘটনাকে একটা থ্রিলিং এডভেঞ্চার হিসেবে দেখা যেতে পারে। এরপর মূলার অনেকখানি শান্ত হন। মন শান্ত হওয়ায় তিনি অনুভব করেন যে, তিনি নাজিদের সামনে হেঁটে যাবেন এটা হবে তাদের প্রত্যাশার একেবারে বাইরে।

তিনি তার চশমা খুলে ফেললেন। চুল পানি দিয়ে একটু ভিজিয়ে মাথার সাথে লেপটিয়ে নিলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। মূলার চেহারার আদল এভাবে একটু পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। চেহারায় নিয়ে আসেন শান্ত নির্লিপ্ত ভাব। একটা ফাইল নিয়ে নিচে হেঁটে নেমে তিনি তার সেক্রেটারির কাছে আসেন। সেক্রেটারিকে তখন গেস্টাপো সৈন্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। তিনি ব্যাপার কী জানতে চাইলে সেক্রেটারি চোখের পলক না ফেলেই বলেন যে, এই ভদ্রলোকরা মি. পারিজোঁকে খুঁজছেন। 'পারিজোঁ?' তিনি বিস্মিত স্বরে উচ্চারণ করলেন! 'আমি তো তাকে কয়েক মিনিট আগে পাঁচ তলায় দেখেছি।' গেস্টাপোর লোকরা পাঁচ তলার দিকে ছুটে উঠতে লাগল এবং মূলারকে তার বন্ধুবান্ধবরা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিলেন।

এমন সরাসরি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ হয়তো আমাদের সবার নেই। কিন্তু আমাদের সবারই ভালোভাবে বাঁচার সুযোগ রয়েছে। আর অটোসাজেশন দিয়ে আমরা এই সুযোগটাকে আরো বিস্তৃত করতে পারি। ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও রোগমুক্তির জন্যে প্রফেসর এম ইউ আহমেদ তার গ্রন্থে অনেকগুলো অটোসাজেশনের উল্লেখ করেছেন।

সেগুলোর বাংলা করলে দাঁড়ায়-

১. আমি সুস্থ হবো, সুখী হবো।

২. আমি আশাবাদী, আত্মবিশ্বাসী, গতিশীল, স্বাধীনচেতা, বলিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ।

৩. আমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকব, শক্তিমান হবো, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবো, সুখী হবো।

৪. আমি ধূমপান ঘৃণা করি, মাদকদ্রব্যকে ঘৃণা করি। শিগগিরই আমি এগুলো ছেড়ে দেবো।

৫. আমি শক্তিশালী মন ও দেহের অধিকারী। জীবনে অবশ্যই সফল হবো।

৬. আমি সাহসী ও শক্তিমান। নিজের জন্যে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ব।

আর তার নিজের মন্ত্র ছিল, 'লিভ লং, হ্যাপি স্ট্রং, গ্রো ইয়ং।'

অটোসাজেশনের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ হচ্ছে, যতদূর সম্ভব না-সূচক শব্দ ব্যবহার না করা। নেতিবাচক কথাগুলোর উল্লেখ কম করা। রোগ-ব্যাধির উল্লেখ কম করা।

যেমন কারো হার্টের কোনো অসুখ আছে। তিনি অটোসাজেশন দিতে চান। এক্ষেত্রে 'আমার হৃদরোগ ভালো হয়ে যাবে' না বলে তার অটোসাজেশন হওয়া উচিত 'আমার হৃৎপিণ্ড যথাযথভাবে কাজ করবে।' তেমনি বহুমূত্রে আক্রান্ত রোগীর 'আমার বহুমূত্র ভালো হয়ে যাবে,' না বলে বলা উচিত, 'আমার প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় যথাযথভাবে কাজ করবে।' যারা অহেতুক ভয় পান, তারা 'আমি ভয় পাব না,' না বলে বলবেন 'অমূলক ভয়ভীতি ও নেতিবাচক চিন্তা বা কথার প্রভাব থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখব।' যারা সবকিছু ভুলে যান, তারা 'আমি আর ভুলব না,' না বলে অটোসাজেশন দেবেন, 'আমার স্মরণশক্তি বাড়বে। আমি যা পড়ব বা শুনব তার প্রয়োজনীয় সব অংশ মনে রাখব।'

পাশ্চাত্যে সাইকো সাইবারনেটিক্স, সিলভা মেথড, সাইনেটিক সিস্টেম, পটেনশিয়াল আনলিমিটেড, রিসার্চ ২১০০, ব্রাদার চার্লস সিনক্রোনিসিটি, লাইট অব মাইন্ড, রোজিক্রুশিয়ান অর্ডার, সেলফ রিয়েলাইজেশন ফেলোশিপ, রিয়েলাইজেশন সিস্টেম, ডায়ানেটিকস, কনসেপ্ট থেরাপি, এডভান্স লার্নিং সিস্টেম, সাবলিমিনাল টেকনিকসসহ প্রতিটি আত্মউন্নয়ন বা মননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে পজিটিভ অটোসাজেশন।

প্রত্যয়নের চারটি শর্ত

অটোসাজেশনকে বিশ্বাসসহ বললেই তা প্রত্যয়নে পরিণত হয়। সফল ইতিবাচক প্রত্যয়ন বা হলফের জন্যে চারটি জিনিস প্রয়োজন-কামনা, তথ্য, পুনরাবৃত্তি ও অপেক্ষা। ইতিবাচক প্রত্যয় সৃষ্টির জন্যে আপনার কামনা যেমন তীব্র হতে হবে, তেমনি আপনার অবচেতন মনের তথ্যভাণ্ডারকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। আর দিনের মধ্যে এ কাজ করার সুযোগ পাবেন বহুবার।

আপনি যখনই শিথিল অবস্থায় থাকেন এবং শুধুমাত্র নিজস্ব চিন্তার মাঝেই নিমগ্ন থাকেন, তখনই প্রত্যয়নের কাজ করতে পারেন। অবচেতন মনের সাথে যোগাযোগের সুন্দর স্বাভাবিক সময় হচ্ছে ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে, অথবা রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে। আর আপনি যেহেতু মননিয়ন্ত্রণ করতে শিখছেন, আপনি যে-কোনো সময় মনের বাড়িতে গিয়ে অবচেতন মনের চ্যানেল খুলে দিয়ে আপনার নতুন কামনার (Desire) তথ্য অবচেতন মনকে সুন্দরভাবে অবহিত করতে পারেন।

ইতিবাচক প্রত্যয়ন বা হলফ ব্যক্ত করার জন্যে আপনি ধাপে ধাপে অগ্রসর হোন। প্রথমে আপনার লক্ষ্য স্থির করুন। কেন এই লক্ষ্য অর্জন করতে চাচ্ছেন, তা ব্যাখ্যা করুন। যত বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নিজেকে বলুন। তারপর খুব সহজ কথায় ইতিবাচক প্রত্যয়ন ব্যক্ত করুন। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘটনার একটা সুস্পষ্ট মানসিক কল্পচিত্র তৈরি করা। স্বাভাবিক শিথিল অবস্থায় অথবা মনের বাড়িতে গিয়ে পুরো বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করুন এবং কল্পনা করুন যে, আপনি ঠিকভাবে নির্দিষ্ট কাজটি করছেন। ঠিকভাবে করার ফলে যে আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তা উপলব্ধি করুন। কথা ও অনুভূতির বিষয়টি মনে পুরোপুরি বদ্ধমূল করে ফেলতে হবে।

আপনাকে মনে রাখতে হবে অবচেতন মনের তথ্যভাণ্ডার পুনর্বিন্যাস করার জন্যে এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। প্রোগ্রাম করার পর এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব অবচেতন মনের ওপর ছেড়ে দিন। ব্রেনকে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করতে দিন। আপনি শুধু পাশে দাঁড়িয়ে দেখুন।

পরিবর্তন সম্পন্নের জন্যে জোর মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। কতদূর অগ্রগতি হলো, তা বার বার খতিয়ে দেখতে যাবেন না। ঘটনা ঘটতে দিন। অন্যের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করবেন না। আপনার কী ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে অন্যের কাছে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করবেন না।

আপনি চুপচাপ এই টেকনিকের প্রয়োগ ও পুনরাবৃত্তি করে যান। আপনি শিগগিরই পরিবর্তন অনুভব করতে পারবেন অথবা আপনার বন্ধুরাই আপনার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করবে।

প্রত্যয়ন বা হলফের কথামালা

কথার শক্তি যে কত প্রচণ্ড তা আপনি ইতিমধ্যেই গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছেন। তাই আপনার প্রত্যয়নের কথামালা ঠিক করার জন্যে নিম্নোক্ত সহজ নিয়ম অনুসরণ করতে পারেন।

১. এই প্রত্যয়ন বা হলফ সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত। তাই 'আমি বা আমার' শব্দ ব্যবহার করুন।

২. পুরোপুরি ইতিবাচক হোন। যা কামনা করেন তা লিখুন।

৩. নেতিবাচক শব্দ পরিহার করুন। করব না, পারব না, চাই না শব্দ পরিহার করুন।

৪. বর্তমানকাল জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করুন।

৫. তুলনা করবেন না। অতীতের সাথে বা অন্যের সাথে তুলনা করবেন না।

৬. প্রত্যয়ন অবশ্যই বাস্তবসম্মত হতে হবে।

৭. কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করবেন না। সময়সীমা ক্ষতিকর হতে পারে, এতে টেনশন সৃষ্টি হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, আপনার অবচেতন মনের স্বয়ংক্রিয় সৃজনশীল কর্মধারা সবসময়ই পরিচালিত হয় আপনার নির্ধারিত লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। আপনি অবচেতন মনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব দিলে অবচেতন মন আপনার সচেতন মনের চেয়েও সুচারুভাবে আপনাকে লক্ষ্য অর্জনের পথে নিয়ে যাবে। আপনি অবচেতন মনের স্বয়ংক্রিয় গাইডেন্স সিস্টেমের ওপর অনায়াসে নির্ভর করতে পারেন। অবচেতন মন বলে দেবে আপনি কীভাবে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছবেন।

মননিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আত্মউন্নয়নের মূল সূত্র হচ্ছে-আপনি যা হতে চান, কল্পনায় তা হোন অর্থাৎ সে রকম ভান করুন এবং কল্পনায় যে রকম কাজ করবেন, বাস্তবেও তা-ই হবে। তবে আপনি যা হতে চান সে সম্পর্কে আপনাকে আন্তরিক, সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত হতে হবে। নিচের আটটি প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে দিলেই বোঝা যাবে চাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটা আন্তরিক-

১. আপনি কী সত্যিই তা চান? (এটা অবশ্যই আপনার বাস্তব কামনা হতে হবে। নিজে চাচ্ছেন না কিন্তু অন্যে শুনলে ভালো বলবে এমন কিছু হলে চলবে না বা অন্যের ক্ষতি করার জন্যে কিছু চাইলে হবে না।)

২. এই লক্ষ্য কি আপনার অন্যান্য লক্ষ্যের সাথে সাজুয্যপূর্ণ?

৩. লক্ষ্যটা কি ইতিবাচক? (যা আপনি চান তা-ই বলতে হবে, যা আপনি চান না তা বললে চলবে না।)

৪. পুরোপুরি বলা হয়েছে কি?

৫. এটা কি বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব? (অর্থাৎ ইতিপূর্বে এটা কি অন্য অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।)

৬. আপনার লক্ষ্য কি বেশ উঁচু? (আপনি বাস্তবভিত্তিক যে-কোনো উঁচু লক্ষ্য স্থির করতে পারেন। কীভাবে তা অর্জন করবেন তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।)

৭. আপনার লক্ষ্য কি মানবতার কল্যাণে নিবেদিত?

৮. লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আপনি কি ব্যক্তিসত্তার উন্নয়নকে জরুরী মনে করছেন?

প্রত্যয়নের প্রক্রিয়া

নিজের অবচেতন মনকে প্রত্যয়নের কথামালা শোনানোর জন্যে আপনার কথাগুলোকে দু'ভাগে গুছিয়ে নিন। প্রথমভাগে থাকবে বর্তমান বাস্তবতার সরল বিবরণ। দ্বিতীয়ভাগে থাকবে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের কল্পচিত্রের বিবরণ। সবশেষে থাকবে আপনার প্রত্যয়ন। আপনি মনের বাড়িতে প্রথমবারই মাত্র বাস্তবতার সরল বিবরণ দেবেন।

এরপর যতবার প্রত্যয়ন করবেন ততবার শুধু আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বাস্তবে ঘটছে বলে কল্পনা করবেন। মনে রাখবেন, যে লক্ষ্য আপনি সুস্পষ্টভাবে কল্পনা করতে পারবেন, আন্তরিকভাবে কামনা করতে পারবেন, নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস করতে পারবেন, আগ্রহের সাথে কাজ করতে পারবেন, ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে পারবেন, তা ঘটবেই।

ধরুন আপনি কোনো সমাবেশে বক্তৃতা করতে চান। কিন্তু আপনি অত্যন্ত নার্ভাস প্রকৃতির। এখন কী করবেন? গুছিয়ে লিখে ফেলুন। যেমন আমি সুধী সমাবেশে বক্তৃতা দিতে চাই। কিন্তু আমার নিজের প্রতি এ ব্যাপারে আস্থা নেই। মনে হয় ভুল বলে ফেলব বা বক্তৃতা দিতে গিয়ে আসল কথাই ভুলে যাব। আমি জানি এ ব্যাপারে যদি আমি প্রত্যয়ী হয়ে উঠতে পারি তাহলে আমার জনপ্রিয়তার পথ খুলে যাবে। (প্রথম অংশ)

আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি শতাধিক শ্রোতার সামনে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছি। আমি এই ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি। আমার বক্তব্যকে শ্রোতারা হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। আমার বক্তব্যে মোহিত হয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা ও পুরুষ সভা শেষে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধ বেড়ে গেছে। (দ্বিতীয় অংশ)

অনুভূতি-আমি একজন সফল বক্তা। (প্রত্যয়ন)

প্রথম অংশ শুধু প্রথমবার বলবেন। পরবর্তীতে প্রতিবারই শুধু দ্বিতীয় অংশ কল্পনা করবেন। আর বার বার প্রত্যয়ন করবেন।

আপনার অবচেতন মন সবসময়ই আপনার কথায় সাড়া দেবে। বিশেষত যদি তা বার বার পুনরাবৃত্তি করেন। অবচেতন মন আপনার কথাকে শাব্দিক অর্থেই বাস্তব বলে ধরে নেয়, সচেতন মনের মতো যুক্তি দিয়ে বিচার করে না। বরং আপনার সৃষ্ট কাল্পনিক বাস্তবতাকেই সত্যিকারের বাস্তবতায় রূপান্তরিত করার মনোদৈহিক ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল তৈরি করে।

ড. মলজের উপদেশ

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ড. ম্যাক্সওয়েল মলজ এ নিয়মের বাস্তবতার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন- আমাদের সাইকো-সাইবারনেটিক্স ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্যে একদিন এক যুবক এলো। সে তার দুরবস্থা ব্যাখ্যা করল।

তার কোনো অর্থ নেই। সে (তার মতে) ঋণ জর্জরিত এবং বিষণ্নতায় আক্রান্ত। যুবক অবিবাহিত। মা তার সাথে থাকে। অ্যারিজোনার স্কটসডেলে তার একটা আর্ট শপ রয়েছে। সেখানে সে নিজের ও অন্যান্য শিল্পীদের শিল্পকর্ম বিক্রি করে। অত্যন্ত মেধাবী ভাস্কর হওয়া সত্ত্বেও নিজের সম্পর্কে তার ধারণা অত্যন্ত বাজে।

ওয়ার্কশপ ও সেশনে সে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে।

অবচেতন মনে তথ্য পুনর্বিন্যাসকালে সে ছয়টি প্রত্যয়ন বা হলফ করে।

১. আর্ট শপ এমন দামে বিক্রি হবে যে, তাতে আমার সকল দেনা শোধ হয়ে যাবে।

২. আমি বাসা বদলাতে পারব।

৩. আমার মায়ের থাকার জন্যে নতুন বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে।

৪. আমার ব্যাংকে ১০ হাজার ডলার জমা থাকবে।

৫. আমি আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাব এবং ভাস্কর্য করার পর্যাপ্ত সময় পাব।

৬. আমার ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

সে নিয়মিত কল্পনার এ সবগুলো ঘটনা ঘটে যেতে দেখতে লাগল। এভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটার পর এক সন্ধ্যায় আমার কাছে এসে হাজির হলো। বলল, 'আমি বোধ হয় ক্রেজি হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমার মনে একটা সুখানুভূতি এসেছে, কিন্তু বাস্তবে আমার অবস্থার এক বিন্দু নড়চড় হয় নি।'

আমি তাকে বললাম, তুমি যা অনুভব করছ, তা হচ্ছে পরিবর্তন। আর যখন তোমার ভেতরে এই পরিবর্তন এসেছে, তখন বাস্তবেও তুমি এই পরিবর্তন উপভোগ করবে। বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল। তার ছয়টি প্রত্যয়নই মাত্র ছয় মাসের মধ্যে বাস্তবতায় পরিণত হয়।

প্রত্যয়নের মাধ্যমে সম্পর্কোন্নয়ন

ডা. ম্যাক্সওয়েল আরো একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন, একদিন এক মহিলা ফার্নিচার ডিজাইনার একজন খ্যাতনামা ফার্নিচার প্রতিষ্ঠানের মালিকের সাথে তার কাজ করার অসুবিধার কথা বললেন। তিনি নিশ্চিত যে, মালিক তার সবচেয়ে ভালো কাজগুলোকে অন্যায়ভাবে সমালোচনা করে বাতিল করে দিচ্ছেন এবং তার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে কঠোর ও অন্যায় আচরণ করছেন। তার সব কথা শোনার পর তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম যে, যদি তার প্রতি মালিক অন্যায় ও কঠোর আচরণ করে থাকে, তবে দোষটা মালিকের নয়, দোষটা তার এবং পুরো ব্যাপারটাতেই তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। অবচেতন মনে তথ্য পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে বললাম, এই নিয়ম অনুসারে মালিক শুধু তার সম্পর্কে আপনার ধারণারই প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে তার সাথে কথা বলেন এবং এর বেশিরভাগই সমালোচনা ও ক্ষোভে পরিপূর্ণ। আপনি নিশ্চয়ই মালিকের সাথে মনে মনে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হন। আপনার বাস্তবতা আপনার কল্পনারই প্রতিবিম্ব।

মহিলা স্বীকার করলেন যে, প্রতিদিন সকালে কাজে যাওয়ার পথে তিনি মালিক সম্পর্কে এমন সব কথা ভাবেন, যা তার সামনে বলার সাহস নেই। মহিলার মনে মনে তর্কবিতর্কের শক্তি ও তীব্রতাই তার প্রতি

মালিকের আচরণ নির্ধারণ করে দেয়। মহিলা বুঝতে পারলেন আমরা সবাই মনে মনে আলাপ করি। দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগ সময়ই আলাপটা পরিণত হয় বিতর্কে। অনুভূতির তীব্রতাই তাদেরকে অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন করে। এ ঘটনাগুলো তারাই তাদের মানসিক স্তরে প্রথম সৃষ্টি করেন। পরে বাস্তবে তার মুখোমুখি হন।

মহিলা যখন বুঝলেন যে, তিনি এতদিন কী করছিলেন। তখন তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে সম্মত হলেন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি আন্তরিকতার সাথে অবচেতন মনে তথ্যের পুনর্বিন্যাস করলেন যে, মালিকের সাথে তার সম্পর্ক অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং মালিক তার কাজের প্রশংসা করছেন। তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলেন এবং কল্পনা করতে থাকলেন যে, মালিক তার ভালো ডিজাইনগুলোর প্রশংসা করছেন এবং এর বিপরীতে সে-ও তার প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ভদ্রমহিলা আনন্দিতচিত্তে শিগগিরই আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন যে, তার দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল সকল সমস্যার মূল। তার প্রতি শিগগিরই মালিকের ব্যবহার পুরোপুরি পাল্টে যায়। মালিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে মহিলার নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে।

ডা. ম্যাক্সওয়েল মন্তব্য করেছেন যে, ভদ্রমহিলা তার কল্পনা শক্তিকে প্রয়োগ করে ক্রমাগত প্রত্যয়নের মাধ্যমে তার প্রতি মালিকের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এটাকে এভাবেও বলা যায় যে, তথ্য নয়, আমাদের কল্পনার মাধ্যমেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করি এবং আমাদের জীবনধারা পাল্টাই।

ইতিবাচক কথার প্রভাব সম্পর্কে এখন আমাদের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইতিবাচক কথা ও কল্পনা এবং প্রত্যয়ন বা বিশ্বাস দিয়ে এবং বার বার ইতিবাচক কথার পুনরাবৃত্তি করে আমরা বহু শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পুরোপুরি পরিবর্তন করতে পারি। যেমন-

১. অটোসাজেশনের পুনরাবৃত্তি করে রোগমুক্তি।

২. মানসিক উন্নয়ন ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন।

৩. ইতিবাচক কথা দিয়ে সন্তানদের মেধা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি।

৪. ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভ।

৫. কর্মক্ষেত্রে বসের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন ও বসের আনুকূল্য লাভ।

৬. ছাত্র/ ছাত্রীদের শিক্ষক/ শিক্ষিকার সাথে ভুল বুঝাবুঝির অবসান ও তাদের কাছ থেকে আনুকূল্য ও মমতা লাভ।

৭. ইতিবাচক কথা ও কল্পনার মাধ্যমে সুন্দর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি।

প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া

প্রত্যয়ন বা হলফ সবসময় আপনি নিয়মমাফিক মনের বাড়ির ড্রইং রুমে বসে করবেন এবং প্রত্যয়ন শেষে ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসবেন।

অটোসাজেশন বা প্রত্যয়নের নমুনা

আমার স্মৃতিশক্তি বাড়ছে। আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়ছে। আমার মনোযোগ ও প্রশান্তি বাড়ছে। আমার শরীর ও মন সবসময় সুস্থ থাকছে। অমূলক ভয়ভীতি ও নেতিবাচক চিন্তা বা নেতিবাচক কথার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে আমার মন ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি মুক্ত থাকছে। ইতিবাচক চিন্তা আমার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনছে। আমি যা চাই, ইতিবাচক চিন্তা দিয়েই তা পাচ্ছি। প্রতিদিন আমি সবদিক দিয়ে ভালো হচ্ছি, লাভবান হচ্ছি, সফল হচ্ছি। আমি সম্মানিত হচ্ছি। মর্যাদাবান হচ্ছি। আমি প্রতিভাবানদের মতো মস্তিষ্কের ডান ও বাম বলয়কে সমন্বিতভাবে, মনোশক্তি ও ধ্যানশক্তিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করে সাফল্য সৃষ্টি ও সৌভাগ্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছি। এখন থেকে চেতনার প্রতিটি স্তরে আমার মনের ওপর শুধুমাত্র আমারই নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

আমার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হচ্ছে। শ্রবণ শক্তি বাড়ছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় সজাগ হচ্ছে। ত্বকের লাবণ্য বাড়ছে। ত্বক সজীব হচ্ছে। আমি স্বাস্থ্যবান হচ্ছি, সুদর্শন হচ্ছি। আমি প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছি। আমার মন থেকে রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, হিংসা দূর হয়ে প্রকৃতির প্রতি, মানুষের প্রতি প্রেমভাব সৃষ্টি হচ্ছে। আমার প্রতি মানুষ ও প্রকৃতির আনুকূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সৌভাগ্য আমার পদচুম্বন করছে।

আমার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে। আমার ফুসফুস, হার্ট, লিভার, কিডনি, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় সবসময় যথাযথভাবে কাজ করছে। আমার হজম শক্তি বাড়ছে। আমার স্নায়ু ও মস্তিষ্ক সবসময় শান্ত, সজাগ ও সজীব থাকছে।

আমি শক্তিমান হবো, দীর্ঘায়ু হবো, প্রজ্ঞা ও অতিচেতনার অধিকারী হবো, সুখী হবো। আমি আমার অসীম শক্তিকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারব।

প্রত্যয়ন-১ : মুহূর্তে সজীব

মনের বাড়ির ড্রইং রুমে বসে মনে মনে বলুন, আমি এখন চমৎকার আরাম ও প্রশান্তি অনুভব করছি। মন আমার এখন হালকা ও ফুরফুরে। ০ থেকে ৭ গণনা করে যখন আমি এই চমৎকার প্রফুল্ল ও প্রশান্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় আসব, তখন আমি নিজেকে অত্যন্ত তরতাজা, প্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত অনুভব করব। আমি তখন পূর্ণ সজাগ, সতর্ক, হাস্যোজ্জ্বল ও উদ্যমী হয়ে উঠব। আমি যেহেতু অনন্ত জীবনের

অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই আমার কাছে জীবন হয়ে উঠবে গভীর অর্থবহ এবং মহান লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম। আমি প্রফুল্লচিত্তে পূর্ণ উদ্যমে পরিকল্পিত কাজগুলো সম্পন্ন করব। প্রতিটি কাজ তৃপ্তির সাথে উপভোগ করব।

প্রত্যয়ন-২ : পরীক্ষায় সাফল্য

আজ বা আগামীকাল পরীক্ষা চলাকালে আমি অত্যন্ত প্রশান্ত ও সজাগ থাকব। প্রশান্ত মনে আত্মপ্রত্যয়ের সাথে প্রতিটি প্রশ্নের দ্রুত সঠিক জবাব লিখব বা বলব। আমি যা যা পড়েছি তা হলে বসে অনায়াসে মনে করব। আমি যা পড়েছি, তার প্রতিটি অক্ষর প্রয়োজনে আপনা আপনিই মনে চলে আসবে। পরীক্ষাকালে আমি অনায়াসে আমার মেধার সর্বোত্তম প্রয়োগ করব।

প্রত্যয়ন-৩ : স্মৃতি

এই মুহূর্ত থেকে আমি যা দেখব এবং যা শুনব তার সবকিছুই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাথে সাথে পুরোপুরি মনে রাখব। কারণ মন সবসময় সবকিছু মনে রাখে। আমার স্মৃতি অত্যন্ত নিখুঁত। যা-ই আমি স্মরণ করতে চাই, তার সবটাই সাথে সাথে স্মরণ করতে পারব। আমার স্মৃতি এখন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুরোপুরি কাজ করবে।

প্রত্যয়ন-৪ : সঙ্গীতে সাফল্য

গানের বাণী ও সুর যা এখন শিখলাম, তা আমি হুবহু মনে রাখব। বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সময় আমার আঙুল অনায়াসে দ্রুত ও সঠিকভাবে চলাচল করবে। গান গাওয়া ও বাজনা বাজানোর সময় আমার সামর্থ্যের ওপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। গান গাইতে শুরু করা বা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করার সাথে সাথে অনায়াসে আমি আমার সহজাত সৃজনশীলতা, ঐকান্তিকতা, তাল-লয়ে সাবলীল দক্ষতা ও প্রকাশভঙ্গির নৈপুণ্য প্রদর্শন করব।

প্রত্যয়ন-৫ : খেলাধুলায় সাফল্য

আমি যখন খেলতে নামব, তখন আমি আমার শারীরিক সামর্থ্য ও মানসিক দক্ষতার সবচেয়ে ভালো পর্যায়ে থাকব। আমি সুনিপুণভাবে খেলব। আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে চমৎকার সমন্বয়, সুন্দর দম, সুনিপুণ কৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শন করব। আমি সবসময় ঠান্ডা, প্রশান্ত ও সতর্ক থাকব। নিজের ওপর আমার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। খেলার সাথে আমি পুরোপুরি একাত্ম থাকব। আমি বিজয়ী হবো।

প্রত্যয়ন-৬ : আত্মবিশ্বাস

এই মুহূর্ত থেকে আমি আমার নিজের ওপর পুরোপুরি নির্ভরতা ও বিশ্বাস স্থাপন করছি। আমি এখন জানি, নিজের জীবনকে বিকশিত করার জন্যে যে শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োজন, তা আমার মনের গভীরে পুরোপুরি জমা

রয়েছে। যোগ্যতা, সামর্থ্য ও সাহসের সার্বক্ষণিক ও সদাপ্রস্তুত উৎস হিসেবে আমি আমার মনের এই শক্তিভাণ্ডারকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করছি। প্রতিটি ব্যাপারে জ্ঞান ও মেধা এখন আমার হাতের মুঠোয়। আমি অনায়াসে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করব।

প্রত্যয়ন-৭ : বক্তৃতা প্রদান

আমি যখন মঞ্চে শ্রোতাদের সামনে দাঁড়াব তখন আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা ও সচেতনতার ওপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। আমি অত্যন্ত সহজ, শান্ত, স্বাভাবিক ও পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী থাকব। আমি যা বলতে চাই, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মনে চলে আসবে এবং সহজ সাবলীল ভাষায় তা প্রকাশ করব। ঠিক সময়ে আমি ঠিক কথাটি বলব। শ্রোতা ও দর্শকরা যে-কোনো প্রশ্নই করুক না কেন, আমি তার তাৎক্ষণিক যথার্থ জবাব দেবো। বক্তৃতাকালে আমাকে পুরোপুরি প্রশান্ত, প্রত্যয়ী ও প্রাণবন্ত দেখাবে। শ্রোতারা আমার বাগ্মীতায় মোহিত হয়ে যাবে এবং আমাকে অভিনন্দিত করবে।

প্রত্যয়ন-৮ : বদভ্যাস থেকে মুক্তি

০ থেকে ৭ গণনা করে মনের বাড়ির এই গভীর প্রশান্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় পৌঁছার সাথে সাথে আমার মন আমার সত্তাকে সৃজনশীল চিন্তা ও ধ্যান ধারণা দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলবে। বহতা নদীর মতো সবসময় প্রবাহিত এই সৃজনশীল চিন্তাধারা আমাকে ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করার ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত করবে। আমি এখন আমার নিজের জন্যে নতুন অভ্যাস গড়ে তুলছি। এই নতুন অভ্যাস আমার সামনে নিয়ে আসবে নতুন সুযোগ, আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে নতুন সম্ভাবনায়। সুখ সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে আমার সামনে। তখন নিত্য আনন্দলোকে বিচরণ করব আমি।

প্রত্যয়ন-৯ : দ্রুত পড়া

যখন আমি পড়ব, তখন আমি প্রশান্ত সজাগ ও মনোযোগী থাকব। যা পড়ব তা পুরোপুরি আত্মস্থ করার জন্যে প্রস্তুত থাকব। প্রতিদিন আমার পড়া দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকবে। আমি যা পড়ব, তা বুঝব ও স্মরণ রাখব। আমার মনও যে-কোনো সময় তা পুনরায় মনে করতে পারবে। আমি প্রতিটি লাইন, প্রতিটি প্যারাগ্রাফ এবং প্রতিটি পৃষ্ঠা ছবি তোলার মতো মুহূর্তে পড়ব। কারণ আমার মন মুহূর্তে প্রতিটি অনুভূতি/ ছবি ধারণ করে। আমার মন অনায়াসে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুরো পৃষ্ঠা দেখতে ও স্মরণ করতে পারে। আমি যা পড়ি তা পুরোপুরি স্মরণ রাখাই আমার মনের ধর্ম।

প্রত্যয়ন-১০ : ঘুমঘুম ভাব দূর করা

আমার এখন ঘুম ঘুম লাগছে। কিন্তু আমার এখন পুরোপুরি সজাগ ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আমি এখন পুরোপুরি সজাগ ও সতর্ক থাকতে চাই। আমি ০ থেকে ৭ গণনা করে যখনই চোখ মেলব তখনই পুরোপুরি সজাগ ও সতর্ক অবস্থায় পৌঁছে যাব এবং আগামী ... ঘণ্টা পর্যন্ত পূর্ণ সজাগ, সতর্ক, উৎফুল্ল ও প্রাণবন্ত অবস্থায় আমার কাজ সম্পন্ন করব।

প্রত্যয়ন-১১ : ৫ মিনিট ঘুমানো

আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। আমি এখন ৫ মিনিট ঘুমাব। এরপর আমি অত্যন্ত তরতাজা সজীব সতেজ অনুভূতি নিয়ে কাজ শুরু করব। আমি এখন ঘুমিয়ে পড়ছি। ৫ মিনিট পর নিজে নিজেই জেগে উঠব। তরতাজা অনুভূতি নিয়ে দিনের অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পন্ন করব।

প্রত্যয়ন-১২ : ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ

আমি ধনী হচ্ছি, বিত্তবান হচ্ছি, সৌভাগ্যবান হচ্ছি। প্রতিটি লেনদেনে সৎ থাকছি। অন্যের বিশ্বাস ও আমানত রক্ষা করছি। আমার যন্ত্রপাতি ও কারখানা ঠিকভাবে চলছে। লোকজন ভালোভাবে কাজ করছে। আমি ভালো দামে বেশি পরিমাণে কাজ পাচ্ছি। আমার কারখানায় সবসময় উৎপাদন চলছে। সুন্দর নিখুঁত জিনিস বানাচ্ছি। আমার পণ্য দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। সবসময় পণ্যের মান ঠিক রাখছি। বাজারে আমার গুডউইল প্রতিদিন বাড়ছে। সবসময় পুঁজি বাড়ছে। লোকজন অগ্রিম টাকা দিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রচুর টাকা জমা হচ্ছে। সৃষ্টির সেবায় আমি প্রচুর কাজ করছি।

প্রত্যয়ন-১৩ : হজমশক্তি বৃদ্ধি

আমি যা খাবো মজা করে খাবো। যা খাবো সব হজম হবে। পাকস্থলীতে তৈরি এসিড লোহা হজম করার শক্তি রাখে। তাই শাকসব্জি মাছ গোশ্ত যা-ই খাবো তা-ই হজম হবে।

প্রত্যয়ন-১৪ : মুহূর্তে মাথাব্যথা বিদূরণ

আমার মাথাব্যথা করছে বা আমার মাথায় একটু অস্বস্তি লাগছে। আমি মাথাব্যথা চাই না অথবা আমি মাথায় কোনো অস্বস্তি চাই না। আমি পুরোপুরি সুস্থ ও প্রাণোচ্ছল থাকতে চাই। আমি যখন ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় পৌঁছব তখন আমার মাথাব্যথা চলে যাবে। আমার মাথা অত্যন্ত হালকা ও ফুরফুরে লাগবে। আমি পুরোপুরি সুস্থ, সজীব ও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠব।

প্রত্যয়ন-১৫ : নামাজে মনোযোগ বৃদ্ধি

আমি নিয়মিত নামাজ পড়ব। নামাজের নিয়ত করার সাথে সাথে আমার মন সকল পার্থিব চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আমার চিন্তা ও আমার চেতনা একান্তভাবে আল্লাহর প্রতি রুজু হবে। নামাজের মধ্যেই আমি নিজেকে আমার প্রভুর কাছে পুরোপুরি সমর্পণ করব এবং তার অপার করুণা ও রহমত লাভ করব।

প্রত্যয়ন-১৬ : মেডিটেশনে মনোযোগ বৃদ্ধি

আমি নিয়মিত মেডিটেশন করব। যত মেডিটেশন করব তত আমার মনোযোগ বাড়বে, তত গভীর ধ্যানাবস্থায় প্রবেশ করব। মহাচেতনার সাথে আমার চেতনা একাত্ম হবে। ফলে নিজের ও মানবতার কল্যাণে যা চাই তা-ই পাব।

প্রত্যয়ন-১৭ : হাঁটতে হাঁটতে শক্তি লাভ

মর্নিং ওয়াক বা বিকেলে হাঁটতে বের হলে মনে মনে বলতে থাকুন, Live long, Happy strong, growing young. অথবা Live long, Happy strong, stay young.

প্রত্যয়ন-১৮ : জ্ঞান ও আত্মিক শক্তি

আমি জ্ঞানী হচ্ছি। ধ্যানী হচ্ছি। নিয়মিত ইবাদত/ উপাসনা/ প্রার্থনা করছি। প্রতিটি কাজ স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে করছি। সৃষ্টির সেবায় আমার মন ও আত্মা সত্যের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। আমি স্রষ্টায় সমর্পিত।

প্রত্যয়ন-১৯ : দেশের উন্নতি

আমি এক মহান জাতির উত্তরসূরি। দুনিয়ার সেরা জাতিতে পরিণত হওয়ার গুণাবলি ও যোগ্যতা স্রষ্টা আমাদেরকে দিয়েছেন। দল মত ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে আমরা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে প্রো-অ্যাকটিভ, সৎ, সহনশীল, উদার, সমমর্মী, সৃজনশীল, কর্মঠ, সময়ানুবর্তী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছি। দেশকে ভালবাসছি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ জাতির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। সৃষ্টির কল্যাণে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছি।

আত্ম প্রত্যয়ন

আমি জানি, প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি শপথ করছি, আমি এখন থেকে যা করব তা ভালোর জন্যে করব, কল্যাণের জন্যে করব, সাফল্যের জন্যে করব।

আমি এখন পুরোপুরি প্রো-অ্যাকটিভ । তাই নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে সময়ানুবর্তিতার সাথে বিবেক ও প্রজ্ঞার নির্দেশ অনুসারে কাজ করব। প্রতিটি এপয়েন্টমেন্ট ও ওয়াদা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকব। ঈমানদারীর সাথে আমার প্রতিটি দায়িত্ব পালন করব। যে কাজ আজ করা যায় তা আজই সম্পন্ন করব। আমি যা পড়ব, যা শুনব, তার প্রয়োজনীয় সব অংশ অনায়াসে মনে রাখব। আমার মন ও চিন্তাধারা স্বচ্ছ, প্রশান্ত ও হাস্যোজ্জ্বল। আমি সবার সাথে সহজভাবে মিশব ও বন্ধুসুলভ আচরণ করব। অন্যের কাজ, সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ভ্রান্তির প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি সহনশীল। তাদের কাজগুলোকে যতদূর সম্ভব সমঝোতা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখব। কোনো ক্ষোভ ও ঘৃণা যাতে আমার সিদ্ধান্ত ও কাজকে প্রভাবিত না করে, সে ব্যাপারে সবসময় সজাগ থাকব। চেতনার প্রতিটি স্তরেই আমি আমার দেহের ওপর, ইন্দ্রিয়ের ওপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখব। আমি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করব। কারণ আমি জানি, আমি যা চাই তা-ই পাব। আমি অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আমার প্রতিটি কাজ ও চিন্তায় এই ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ ঘটবে। হতাশা ও নেতিবাচক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মুক্ত রাখব।

আমি সবসময় হাসিমুখে অন্যদের সম্ভাষণ জানাব, যখনই সম্ভব হাসতে চেষ্টা করব এবং দিনে অন্তত কয়েকবার হাসব। আমি সবসময় ধীরস্থির ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করব। কোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেও আমি ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করব। যে-কোনো প্রতিকূলতার মুখে আমি আমার বিশ্বাসে অটল থাকব। কারণ আমি জানি বিশ্বাসীরাই বিজয়ী হয়।

আমি জানি পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে। আমি আত্মবিশ্বাসী, আমি সাহসী, আমি নির্ভীক।

আমি পারব, আমি করব, উদ্যমী হয়ে কাজকে ভালবেসে আমি সফল হবো। আমি আমার মনের সকল শক্তি ও অর্জিত সাফল্যকে জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করব।

পারিবারিক প্রত্যয়ন

সন্তান হিসেবে আমি বাবা-মার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও মমতাসহ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছি। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমি আমার স্ত্রী-স্বামীর প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত থাকছি। শ্রদ্ধা, মমতা, ভালবাসা দিয়ে তার জীবন আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছি। মা-বাবা হিসেবে সন্তানের শিক্ষা ও মানবীয় গুণাবলী বিকাশে প্রয়োজনীয় সময় ও মনোযোগ দিচ্ছি। ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী ও বন্ধুদের কল্যাণ কামনা করছি এবং তাদের ভালো কাজে সহযোগিতা করছি। আমার পরিবারের সবার মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা বিকশিত হচ্ছে। আমার পরিবার এক আদর্শ, সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবারে রূপান্তরিত হচ্ছে।

কোয়ান্টাম প্রত্যয়ন

আমি এক অনন্য মানুষ। আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম। সারা পৃথিবী আমার। যেখানে দরকার সেখানে যাব। যা প্রয়োজন তা-ই নেব। যা চাই, তা-ই পাব। আমি প্রো-অ্যাকটিভ। আমি সবসময় বিবেক ও প্রজ্ঞার নির্দেশ অনুসারে কাজ করব। ব্রেনকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করব। সকল প্রতিকূলতার মুখে নিজ বিশ্বাসে অটল থাকব। আমি নিয়মিত মেডিটেশন করব। নিজেকে ভালবাসব। মানুষকে ভালবাসব। প্রকৃতিকে ভালবাসব। জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ করব।

অধ্যায়-১০

আত্মবিকাশী প্রোগ্রাম-২

মনছবি

এক তরুণী। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করে ভাবছে কী করবে। সে মনছবি দেখল একটি চাকরির। এমন চাকরি যেখানে কাজ কম কিন্তু বেতন বেশি। সে নিয়মিত মনছবি দেখতে লাগল আর এ ধরনের কাজ যে সব প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যেতে পারে, সেখানে ডাকযোগে বায়োডাটা পাঠিয়ে দিল। দেড় মাসের মধ্যে একটি বিদেশী দূতাবাসে চাকরি হয়ে গেল তার।

এক ছাত্র। বিদেশে পড়াশুনা করতে চায়। মনছবি দেখতে লাগল সেভাবে। কাগজপত্র সংগ্রহ করে ভিসার জন্যে দূতাবাসে দাঁড়াল। সেদিন নতুন ভিসা পেয়েছিল মাত্র দুজন। তার মধ্যে সে একজন।

এক মহিলা ডেন্টাল সার্জন। মনছবি করল বিদেশে চাকরির জন্যে। তিন মাসের মধ্যে ডেন্টাল সার্জনের কাজ নিয়ে চলে গেল সৌদি আরবে।

এক ইঞ্জিনিয়ার। সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার মনছবি দেখতে লাগল। ডিভি ভিসা পেয়ে গেল। ভিসা পাওয়ার পর মনছবি দেখতে লাগল সমমানের চাকরি, যাতে নিজের প্রকৌশল জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারেন। দেশে তিনি কাজ করতেন বিদেশী প্রতিষ্ঠানে। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার দেড় মাসের মধ্যে একই প্রতিষ্ঠানে আগের চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরি হয়ে গেল তার।

এক কুমারী। জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত। দেশের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক বললেন, স্কিন ক্যান্সার। এ রোগ ভালো হওয়ার নয়। আর এ রোগ নিয়ে বিয়ে করা যাবে না। ফলে মারাত্মক হতাশায় আক্রান্ত হলো তরুণী। বড় বোনের পরামর্শে মেডিটেশন শুরু করল। মনছবি দেখতে লাগল ছোট একটি সংসারের। এমন এক স্বামীর যে সবকিছু জেনেই গ্রহণ করবে তাকে। একমাস দুমাস করে ছয় মাস পর হয়ে গেল। নিয়মিত মনছবি দেখতে দেখতে মনছবিই তার কাছে বিশ্বাস ও বাস্তবতা বলে মনে হতে লাগল। এরই মধ্যে এক যুবক প্রেমে পড়ে গেল তার। মেয়েটি তাকে তার বাস্তব অবস্থার কথা জানাল। ডাক্তার বলেছেন, তার স্কিন ক্যান্সার আর বিয়ে করতে না করেছেন। যুবক নাছোড়বান্দা। তার সাফ কথা, 'বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীর যদি স্কিন ক্যান্সার হতো তাহলে আমি কি এজন্যে তাকে ছেড়ে যেতাম।' মেয়েটি এরপর তাকে অভিভাবকের মাধ্যমে প্রস্তাব দিতে বলল। অভিভাবকরা এলেন প্রস্তাব নিয়ে। মেয়ের অভিভাবকরা তাদের জানালেন ডাক্তারের

মন্তব্য। ছেলের অভিভাবকরা বললেন, সংসার করবে ছেলে। তার যেহেতু আপত্তি নেই। আমাদের তাই এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই। বিয়ে হয়ে গেল তাদের। বছর ঘুরতেই ফুটফুটে বাচ্চা এল তাদের সংসারে। খুব সুখী তারা।

এগুলো কোনো গল্প নয়। সাম্প্রতিক সময়ে ঘটা হাজার হাজার বাস্তবতার কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা মাত্র। আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে? তাহলে আসুন ইতিহাসের দিকে তাকাই। দেখুন মনছবি কীভাবে যুগে যুগে নতুন বাস্তবতা নির্মাণ করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা।শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের কারাগারে বন্দি ছিলেন ২৯ বছর। কারাগারের অতি নির্জন সেলে রাখা হয়েছিল,যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছত না। কারাগার থেকে মুক্তির পর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কারাগারে কী করতেন আপনি?' তিনি বললেন,'মনছবি। সবসময় স্বপ্ন দেখেছি মুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা শাসন করছে। আর আমি তার নেতৃত্ব দিচ্ছি।' ম্যান্ডেলা আলোচনার টেবিলে শ্বেতাঙ্গদের পরাজিত করে কৃষ্ণাঙ্গ শাসন কায়েম করেন। আর তিনি হন প্রথম প্রেসিডেন্ট, যা ৭০-এর দশকে ছিল এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

কৃষক পরিবারের সন্তান মাও সে তুং। শোষিত বঞ্চিত চীনবাসীর মুক্তির মনছবি দেখলেন। মনছবি বাস্তবায়নের পথে এল বাধার পর বাধা। লং মার্চ-এ তার সঙ্গীদের শতকরা ৯০ জন নিহত হলেন। কিন্তু তিনি আপন মনছবিতে বিশ্বাসে অটল। দুই শতাব্দীর বঞ্চনা থেকে মুক্ত করলেন চীনকে। আজকে চীন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির অধিকারী। আর আগামী শতকের পরাশক্তি।

মাহাথির মোহাম্মদ। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালে মনছবি দেখলেন অনগ্রসর মালয়েশিয়ায়, যেখানে পঞ্চাশ বছরের পুরনো কোনো ভবন নেই, সেখানে ২০ বছরের মধ্যে গড়ে তুলবেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন। ১৯৯৫ সালে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন নির্মিত হলো মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে। কৃষি প্রধান মালয়েশিয়া পরিণত হলো শিল্প পণ্য রপ্তানীকারী দেশে।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় মনছবি দেখলেন, এমন এক যানবাহন নির্মাণ করবেন, যা আকাশে উড়বে। বিজ্ঞানীরা তাদের পাগল বলল। কিন্তু তারা মনছবির বিশ্বাসে অটল থেকে নীরবে কাজ করে গেলেন। বিমান নির্মিত হলো। সভ্যতার চেহারা পুরোপুরি পাল্টে গেল।

ফিলিস্তিনীরা মনছবি দেখল মুক্তির। এক পর্যায়ে তারা শুরু করল ইন্তেফাদা। সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং সবচেয়ে নৃশংস ইসরাইলী বাহিনীর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনী কিশোররা প্রয়োগ করল প্রস্তর যুগের অস্ত্র ইটের টুকরো। ফিলিস্তিনী কিশোররা ইহুদী সৈন্য দেখলেই ইটের টুকরো মেরে দৌড় দিত। নৃশংস অত্যাচারের মুখেও অব্যাহত রাখল ইন্তেফাদা। ইসরাইলীরা বাধ্য হলো আলোচনার টেবিলে আসতে। ফিলিস্তিনীরা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায়

এগিয়ে গেল এক ধাপ।

পেশোয়ারের ফল বিক্রেতা ইউসুফ। মনছবি দেখলেন চলচ্চিত্রের নায়ক হবেন। এলেন বোম্বে। পরিণত হলেন কিংবদন্তীর নায়ক দিলীপ কুমারে।

১৯৯৪ সালে ২০ বছর পর জর্জ ফোরম্যান মুষ্টিযুদ্ধের খেতাবী লড়াইয়ে জয়ী হলেন। ১৯৭৪ সালে মোহাম্মদ আলীর হাতে নক আউট হয়ে হেভিওয়েট শিরোপা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি। ২০ বছর পর ১৯৯৪ সালে ৪৫ বছর বয়সে ২৬ বছর বয়েসী মাইকেল মুরারকে পরাজিত করে বক্সিং-এ খেতাবী লড়াই জেতার মতো অসম্ভবকে কীভাবে সম্ভব করলেন? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'মনছবি'। ২০ বছর ধরে বিজয়ের এই ছবিই তো আমি সবসময় দেখেছি। বয়স বাড়লেই মানুষ তার স্বপ্ন বিসর্জন দেয় না। আপনি মনে প্রাণে যা চান তা পাবেনই।

এভাবে এক এক করে ইতিহাসের যত সফল মানুষকে আপনি দেখবেন, তাদের সাফল্যের পেছনে রয়েছে মনছবি। মনছবি হচ্ছে ভবিষ্যতের কল্পনা বা স্বপ্ন এবং বিশ্বাস। আসলে কল্পনা বা স্বপ্ন যখন বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় তখনই তা পরিণত হয় মনছবিতে অর্থাৎ ভবিষ্যতের বাস্তবতায়। এরা কেউ সচেতনভাবে আবার কেউ সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় মনছবি দেখেছেন।

ঔপন্যাসিক কূর্ট ভনেগার্ট চমৎকারভাবে বলেছেন কথাটা, 'আমরা নিজেদের সম্পর্কে যা কল্পনা করি, মনে মনে যে ছবি আঁকি, আমরা তা-ই।' প্রতিনিয়ত আমরা নিজের সম্পর্কে মনের ভেতরে যে ইমেজ তৈরি করছি, মনে মনে নিজের যে ছবি আঁকছি বাস্তব জীবনেও আমরা তাতেই পরিণত হচ্ছি। কারণ আপনি আপনার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে যা সত্য বলে মনে করছেন, পারিপার্শ্বিকতার যে ছবি মনে মনে আঁকছেন তাতে আপনার অনুভূতি, আচরণ ও কর্মতৎপরতা প্রভাবিত হচ্ছে। কারণ ব্রেনের ভাষা হচ্ছে ছবি বা ইমেজ। আমাদের সাফল্যের প্রক্রিয়া সক্রিয় হয় প্রধানত আমাদের কল্পনা দ্বারা। কারণ কল্পনা আমাদের লক্ষ্যের ছবি মনের মুকুরে এঁকে দেয়। আপনি যা হতে চান তার সুস্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে গেঁথে দিন, সবসময় সে ছবি মনে ধরে রাখুন। এ ছবিই আপনার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি পাল্টে দেবে। কারণ আপনি যা সত্য বলে কল্পনা, চিন্তা ও বিশ্বাস করেন, আপনার নার্ভাস সিস্টেম সেভাবেই প্রতিটি কাজ করবে।

আমাদের প্রাচীন সাধকরা হাজার হাজার বছর আগেই মনছবির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং আত্ম উন্নয়নে ও মানবতার কল্যাণে তা ব্যবহার করে গেছেন। এখনো সাধকরা মনছবিকে সেভাবেই ব্যবহার করে আসছেন। আত্ম উন্নয়ন ও সাফল্যের হাতিয়ার হিসেবে অবচেতন মনের পুরো শক্তিকে ব্যবহার করার জন্যে আপনিও মনছবিকে নির্ভুল লক্ষ্যভেদী অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারেন।

আত্ম উন্নয়ন ও সৌভাগ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ ও সাফল্য লাভে মনছবি (Mental picture) ব্যবহার

করার সুবিধা অনেক। যেমন-

১. মস্তিষ্ক ও নার্ভাস সিস্টেম ছবির ছাপ দীর্ঘদিন মনে রাখতে ও সে অনুসারে কাজ করতে পারে।

২. মনছবি হচ্ছে এমন একটি দৃশ্য, যা মনের পর্দায় প্রতিফলিত হয়। আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়া প্রধানত মনের পর্দায় প্রতিফলিত ছবিগুলোর বিশ্লেষণ মাত্র। আর মেডিটেশন লেভেলে বা মনের বাড়িতে মনছবির ছাপ হয় আরো দীর্ঘস্থায়ী।

৩. মনছবি মনকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও নির্ভুল গাইডেন্স সিস্টেম প্রদান করে।

৪. মনছবি লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশিকা প্রদান করে।

৫. মনছবি ইতিবাচক কর্মসূচি অনুসরণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে।

৬. মনছবি চেতনার উচ্চতর স্তরের সাথে বিরাজমান স্তরের সংযোগ ঘটায়।

৭. মনছবি দিয়েই মানসিক স্তরের জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

৮. মনের মাঝে মনছবির ছাপ একবার এঁকে দিতে পারলে তা অবিরাম কাজ করে যায়।

৯. মনছবি আমাদের চিন্তার উত্তরণ ঘটায় এবং আমরা সচেতন না থাকলেও আমাদের প্রয়োজনীয় এনার্জি ও জ্ঞান সরবরাহ করে। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে নীরবে সার্বিক সহায়তা দেয়।

১০. আমরা যা জানি অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের শতকরা ৮৩ ভাগই হচ্ছে চোখ দিয়ে দেখা জ্ঞান অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ছবির জ্ঞান। তাই সাফল্যের পথ নির্দেশনার জন্যে মনছবি এত গুরুত্বপূর্ণ। মনছবিকে এককথায় বলা যেতে পারে সাফল্যের নীল নকশা।

মনছবির শক্তি

আমরা এখন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছি মনছবি কত ফলপ্রসূ হতে পারে। মনছবি কোনো ভোজবাজি বা জাদু নয়। বরং এটি হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি।

ব্রেন ও নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে আমাদের মনোদৈহিক চালিকা শক্তি। ব্রেন ও নাভার্স সিস্টেম একটা স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার ও নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, যা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রাপ্ত নেতিবাচক তথ্যের আলোকে ইতিপূর্বে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে প্রয়োজনীয় পথ পরিবর্তন বা সংশোধন করে।

আধুনিক প্রযুক্তি থেকে এর একটি উদাহরণ হচ্ছে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যভেদী স্ব-নিয়ন্ত্রিত মিসাইল (Self guided missile)। এই মিসাইলের টার্গেট আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে। যখন এ মিসাইল সঠিক পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন এর কোনো দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন থাকে না। এটা নিজের পথে এগিয়ে চলে এবং ইতিবাচক তথ্য (Positive feedback) দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু যখনই সে তার লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু

করে তখনই সে প্রাপ্ত নতুন তথ্য (Negative feedback) দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ মিসাইলের গাইডেন্স সিস্টেম যখন খবর পেল যে সে নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বাম দিকে সরে গেছে, তখন এর পথ-সংশোধনী যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে একে ডান দিকে পরিচালিত করে। ডান দিকে যেতে গিয়ে যদি আবার বেশি ডানে চলে যায় তাহলে আবার তা বাম দিকে গতি পরিবর্তন করে। মিসাইলটি সামনের দিকে অগ্রসর হয়েই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। সামনে চলতে গিয়ে সে ভুল করে এবং প্রতিনিয়ত ভুল সংশাধন করেই অগ্রসর হয়। সবশেষে সে টার্গেটে পৌঁছে। এখানে উল্লেখ্য যে, যখন সে ভুল পথে বা ব্যর্থতার পথে অগ্রসর হয়, তখনো সে তাকে ব্যর্থতা বলে মনে করে না, সামনে এগুতে থাকে, শুধু গতিপথ সংশোধন করে নেয়।

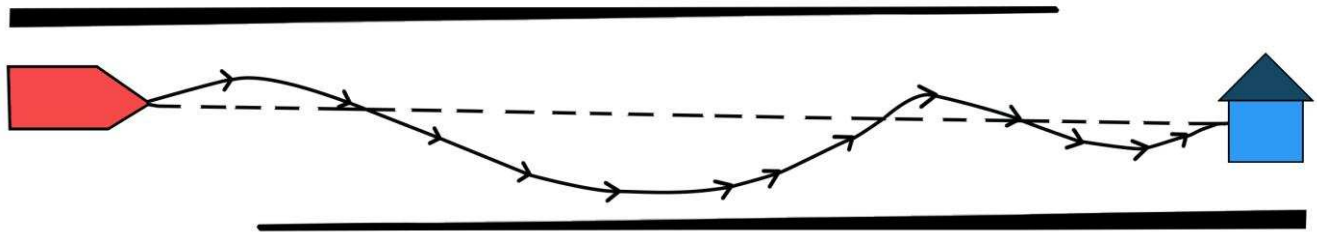

মনছবিও কাজ করে স্ব-নিয়ন্ত্রিত মিসাইলের মতো। সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যের মনছবি অবচেতন মনে বসিয়ে দিন। অবচেতন মন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে দিবানিশি কাজ করে যাবে। প্রয়োজনে পথ সংশোধন করবে। প্রয়োজনে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দেবে। আরো চিন্তা গবেষণায় আপনাকে নিয়োজিত করবে। দুর্দমনীয় আগ্রহ ও উদ্যম সৃষ্টি করবে। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে যা যা করা দরকার তা করার জন্যে ভেতরেই একটা তাড়না সৃষ্টি করবে। আপনাকে নিয়ে যাবে লক্ষ্য পানে।

মনছবির প্রক্রিয়া

মনছবি তৈরির গুরুত্ব আপনি অনুধাবন করতে পেরেছেন। আপনি এখন জানেন মনছবি হচ্ছে আপনার ভবিষ্যৎ সাফল্যের ব্লু-প্রিন্ট বা নীল নকশা। আপনাকে তাই নকশাকে নিখুঁত, নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে এবং মনের গভীরতম প্রদেশে তা প্রোথিত করতে হবে। এজন্যে প্রথমে নির্দিষ্ট নিয়মে মনের বাড়ির ড্রইংরুমে যান। আপনার লক্ষ্যের মনছবি ফুটিয়ে তুলুন।

মনছবি আপনি ড্রইংরুমে কোয়ান্টাম স্ক্রিনে দেখতে পারেন বা নিজের চারপাশে ছবির সবকিছু মিলিয়ে নিজেকে দেখতে পারেন।

মনছবি যাতে কার্যকরভাবে আপনার মনে গেঁথে যেতে পারে, সেজন্যে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন-

১. কল্পনায় আপনি যে মনছবি তৈরি করলেন, তাকে যতটুকু সম্ভব বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে।

খুঁটিনাটি প্রতিটি জিনিস সংযোজিত করে ছবিকে পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত করে তুলতে হবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সবগুলো অনুভূতিকে কাজে লাগিয়েই আপনার পক্ষে তা করা সম্ভব। ছবির পারিপার্শ্বিকতার সবকিছু বিস্তৃত ও জীবন্ত করে তোলা প্রয়োজন। কারণ ছবিকে জীবন্ত বা বাস্তব করে তুলতে পারলেই আপনার নার্ভাস সিস্টেম একে বাস্তব বলে গ্রহণ করবে।

২. মনের বাড়িতে মনছবি গড়ার সময় আপনি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে কাজ করে যান। আপনার অতীতের কার্যাবলির কোনো গুরুত্ব নেই এখন। অন্যসময় আপনি কেমন আচরণ করেছিলেন, তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি যা হতে চান, সেভাবে যদি আপনি নিজেকে ক্রমাগত কল্পনা করতে থাকেন, তবে আপনার নার্ভাস সিস্টেম এই সত্যকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করবে। আপনি যা হতে চান তা আপনি হয়ে গেছেন হিসেবেই নিজেকে চিত্রিত করুন। আপনার এই পরিবর্তিত চিত্র দেখে কেমন লাগছে? মুহূর্তের জন্যে নিজেকে যদি অনিশ্চিত মনে হয় তাহলে আরো ধীরস্থির ও বুদ্ধিমত্তার সাথে নতুন ভূমিকায় অভিনয় করলে কেমন লাগত তা কল্পনা করুন। মনে রাখতে হবে, আপনার চেষ্টা হবে নতুন ভূমিকায় নিজেকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক দেখার চেষ্টা করা।

৩. মনছবি করার সময় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন আপনার অনুভূতির ওপর। অনুভব করুন আপনি লক্ষ্য অর্জন করে যা হতে চান বা যা পেতে চান, তা হয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে সাফল্যের মূল রহস্য হচ্ছে, 'নিয়ন্ত্রিত কল্পনা ও দীর্ঘস্থায়ী একাগ্র মনোযোগ।'

প্রশ্ন করতে পারেন, বিদেশ ভ্রমণের জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা আপনার নেই। মনছবি কি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যথেষ্ট? মনে করুন, আপনি ধারাবাহিকভাবে কল্পনা করতে সক্ষম এবং লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে, এ অনুভূতি বজায় রাখতে কোনো বেগ পেতে হয় না। এখন কি আপনার কল্পনাই বাস্তব হয়ে দাঁড়াবে? লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার অনুভূতি বজায় রাখার মতো পর্যাপ্ত ক্ষমতা আপনার কল্পনায় আছে কি? আপনার কল্পনা কি ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করার যোগ্যতা রাখে?

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডা. ম্যাক্সওয়েল মলজ সুনিশ্চিত যে, একটা ধারণা (মিথ্যা হলেও) যদি অব্যাহত থাকে তাহলে তা লক্ষ্য প্রসব করবে। তার মতে, আমাদের সকল যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা ও কাজের ব্যর্থতার প্রধান কারণই হচ্ছে ধারাবাহিক কল্পনার অভাব।

৪. আপনাকে অবশ্যই আপনার কল্পনাকে ব্যবহার করতে হবে অংশগ্রহণকারী হিসেবে, দর্শক হিসেবে নয়। কল্পনায় আপনাকে অবশ্যই সেখানে চলে যেতে হবে। এটাকে ফ্যান্টাসি মনে করবেন না। অভিজ্ঞতা একে সত্য বলেই অভিহিত করেছে। আপনি যখন কোনো লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা করেন, তখন তা সম্ভাবনা হিসেবে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে। আর আপনি যদি লক্ষ্য থেকে চিন্তা করেন তবে তা নিশ্চিত বাস্তবে পরিণত হয়। সকল 'অলৌকিকত্বে'র সূচনাই হচ্ছে নিশ্চিত কল্পনা এবং লক্ষ্যস্থল থেকে চিন্তাতরঙ্গ নিক্ষেপ। আমরা একে অলৌকিক

বলব না, কারণ কল্পনার ক্ষমতা সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই, তারাই একে অলৌকিক বলতে পারে।

৫. মনের বাড়িতে ভবিষ্যৎই বর্তমানে পরিণত হয়। বুদ্ধি ও আবেগ দিয়ে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারলে আপনার ভবিষ্যৎই বর্তমানে পরিণত হতে পারে। মনছবি সম্পর্কে চিন্তা না করে আমরা যখন মনছবি থেকে চিন্তা করি তখন আমাদের ছবিই বাস্তবে পরিণত হয়। অবশ্য যুক্তি দিয়ে আপনি তা কখনোই পারবেন না। প্রকৃতিগত কারণেই যুক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কল্পনার সেই বাধ্যবাধকতা নেই। কল্পনা দিয়েই মানুষ যুক্তির বাঁধন ও ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে। ডা. মলজ বলেছেন, সাফল্যের অবস্থান থেকে যিনি চিন্তা করতে পারেন, তাকে কেউ থামাতে পারে না। তিনি কী ছিলেন বা তিনি এখন কী তা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি কী চান তা-ই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি জানেন কল্পনার ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে তার মনছবিই বাস্তব হয়ে দাঁড়াবে।

৬. মনের বাড়িতে কল্পনাকে সবসময়ই নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী করুন। আপনি নিজে যা, তার অনুকূল পরিস্থিতিই আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। প্রকৃতির আইন হচ্ছে, 'মানুষ নিজের কাছ থেকে যা বিকিরণ করে, তা-ই তার দিকে বিকিরিত হয়।' তাই আপনি লক্ষ্য অর্জন করেছেন, এই অনুভূতি যদি ধরে রাখতে পারেন, তাহলে এর সাথে জড়িত সবকিছু আপনার কাছে আসবে।

৭. ক্রমাগত মেডিটেশনের ফলে আপনি একটা মহাসত্য উপলব্ধি করতে পারবেন। এ সত্য হচ্ছে- আপনার চারপাশে যে তৎপরতা দেখতে পাচ্ছেন, তা আমাদের ভেতরের মানসিক তৎপরতারই দৃশ্যমান রূপ, আমাদের পারিপার্শ্বিকতা আমাদের মনেরই প্রতিফলন। আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে, আপনার জগৎ হচ্ছে আপনার মানসিক তৎপরতারই দৃশ্যমান রূপ, তখন আপনি আপনার কল্পনার শক্তিকে কিছুতেই অপচয় করবেন না। একে পুরোপুরি নিজের ও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করবেন। তাই নিয়মিত মনছবি দেখুন এবং আপনার লক্ষ্য অর্জিত হলে যে সাফল্যের অনুভূতি সৃষ্টি হতো, তাতে নিজেকে প্লাবিত করুন। এই প্রক্রিয়া কাজ করে জাদুর মতো। এর মাধ্যমেই আপনি রচনা করবেন নতুন বাস্তবতা।

৮. জীবনের সবচেয়ে ধ্রুব সত্য হচ্ছে, 'আপনি বাস্তবে যা চান, কল্পনায় তা পেতে পারেন।' সবসময় কল্পনায় এই পাওয়ার অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে লালন করলে আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পরিণত হবে বাস্তবতায়।

৯. মনছবি কার্যকর হওয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে, আপনার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এই অনুভূতির ওপর ক্রমাগত অখণ্ড মনোযোগ দেয়া এবং এ ব্যাপারে কোনো বাজে চিন্তা বা নেতিচিন্তাকে প্রশ্রয় না দেয়া। ক্রমাগত মনোযোগ দেয়ার ওপর নির্ভর করছে আপনার অগ্রগতি। কারণ যে চিন্তার ব্যাপারে আপনি মনোযোগী এবং যা আপনার সচেতনতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, সে অনুসারেই আপনি কাজ করে থাকেন।

মূর্খরা একে ফ্যান্টাসি মনে করতে পারে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মানব সভ্যতার সকল পরিবর্তন ও অগ্রগতি

সূচিত হয়েছে প্রতিভাবানদের দ্বারা। আর এরা কখনো বিরাজমান অবস্থাকে মেনে নিতে পারে নি। পরিবর্তনের ক্রমাগত কল্পনাই পরিকল্পনার রূপ নিয়ে বাস্তবতার ছোঁয়া পেয়েছে। (অবশ্য আপনি যখন আপনার মনোযোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাবেন, কল্পনার ওপর অখণ্ড মনোযোগ দিতে যাবেন, তখন অনুভব করবেন আসলে আপনার মনোযোগ কত বিক্ষিপ্ত। তাই বিক্ষিপ্ত মনোযোগকে একাগ্র করার জন্যে মনোযোগ অধ্যায়ে দেয়া অনুশীলনগুলো করুন) ।

১০. মনোযোগের শক্তি আপনার কল্পনায় প্রাণ সঞ্চার করবে। অর্থাৎ আপনার মনোযোগের মাত্রার সরাসরি আনুপাতিক হারে কল্পনা কাজ করতে সক্ষম হবে। তাই সফলভাবে আপনার মনোযোগকে নিয়ন্ত্রিত, একাগ্র ও অখণ্ড করতে হবে।

১১. মনছবির কার্যপ্রক্রিয়া হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম নিয়ন্ত্রণকারী অবচেতন মনের সামগ্রিক তথ্যের পুনর্বিন্যাস। ক্রমাগত মনছবির প্রতিফলন ও লক্ষ্য অর্জনের অনুভূতি লাভের পর আপনি নিজেই অনুভব করবেন সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনি ভিন্নভাবে আচরণ করছেন।

যারা ব্যর্থ তাদের নিজেকে অসফল ও অপূর্ণাঙ্গ ভাবতে কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কারণ কল্পিত ও বাস্তব অনেক ব্যর্থতা তিনি তার স্মৃতিতে জড়ো করে রেখেছেন। এই স্মৃতিগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মধ্যে অসফল হওয়ার অনুভূতি বা ভাবনা সঞ্চারিত করছে। অবচেতন মনে নেতিচিন্তার বিন্যাসের ফলেই তা হয়েছে। একইভাবে ইতিবাচক চিন্তাকে নতুনভাবে বিন্যাস করলে অবচেতন মন তার জন্যে সৃষ্টি করবে নতুন ব্যক্তি ইমেজ। কারণ ভয় বা আশঙ্কা যেমন বাস্তবে পরিণত হতে পারে, তেমনি শুভ পরিবর্তন বা সাফল্যের প্রত্যাশাও হতে পারে ফলপ্রসূ। কারণ সাফল্যের প্রত্যাশাও স্বঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীর মতো আপনার দেহ, মন ও অনুভূতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। তাই সৃজনশীল ও ইতিবাচক মনছবি-স্বাস্থ্য, সুখ ও সাফল্যের কাল্পনিক ছবি প্রত্যাশিত সাফল্য বয়ে আনতে সক্ষম।

১২. আপনি কীভাবে মনছবির লক্ষ্যে পৌঁছবেন তা সচেতন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। আপনি যখন লেভেলে থাকবেন অবচেতন মন আপনাকে বলে দেবে আপনার কীভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। অবচেতন হচ্ছে আলাদীনের দৈত্য, আপনার দেয়া মনছবির বাস্তব রূপায়ণে কর্মসূচি ঠিক করার ভার আপনি তার ওপর নিশ্চিত মনে ছেড়ে দিতে পারেন।

মনছবির কার্যকারিতার পাঁচটি শর্ত :

১. লক্ষ্য স্থির-লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হতে হবে।

২. লক্ষ্যের যৌক্তিকতায় পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

৩. লক্ষ্য অর্জনের অনুভূতি বিকিরণ। দর্শক হিসেবে নয়, মনছবির নায়ক হিসেবে পুরো ছবিকে দেখতে হবে।

৪. মনছবির সাথে সার্বক্ষণিক একাত্মতা অর্জন।

৫. লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নীরবে কাজ করা।

মনের গহীনে মনছবি স্পষ্টভাবে বসিয়ে দিন। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে তা দিবানিশি কাজ করবে। প্রয়োজনে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেবে। উৎসাহ উদ্যম ও তাড়না সৃষ্টি করবে। যদি কারো মধ্যে মনছবির লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের তাড়না সৃষ্টি না হয়, তবে বুঝতে হবে তিনি যা করছেন তা মনছবি নয়। তা হচ্ছে আকাশ কুসুম কল্পনা। তিনি তার কল্পনাকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে পারেন নি।

অটল বিশ্বাস নিয়ে মনছবি নির্মাণ ও লক্ষ্যস্থল থেকে নিক্ষিপ্ত চিন্তাতরঙ্গই সাফল্যকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। সবসময় সাফল্যের অনুভূতি বিকিরণ করুন। তাহলে সাফল্যের অনুকূল পরিস্থিতি আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা করলে তা সম্ভাবনারূপে বিরাজ করে আর লক্ষ্যস্থল থেকে চিন্তা করলে তা বাস্তবে পরিণত হয়। সকল অলৌকিকত্বের মূল রহস্য এখানেই।

ভুল ধারণা

অনেকের মধ্যে একটা মস্ত ভুল ধারণা কাজ করছে যে, মনছবির এই প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র দরবেশ, সাধু-সন্তরাই সফল হতে পারেন। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া প্রযোজ্য নয়। অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে, প্রকৃতির এই আইন সবার জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন মাধ্যাকর্ষণ আইনের প্রয়োগ সার্বজনীন, তেমনি সার্বজনীন মনছবির প্রক্রিয়া। অবচেতন মন কম্পিউটারের মতো আপনার দেয়া তথ্য, ছবি ও অনুভূতির প্রেক্ষিতেই প্রোগ্রামিং করবে। আপনি তাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে দিন। পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন বলে সবসময় কল্পনা করুন। লক্ষ্যে পৌঁছাটা হবে তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মনছবির প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়-

১. আপনি বাস্তবে যা চান তা প্রথমে কল্পনায় লাভ করুন। কল্পনায় পাওয়ার এ অভিজ্ঞতা ক্রমাগত বজায় রাখুন। কল্পনাকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করুন। তাহলে আপনার কল্পনাই বাস্তবে পরিণত হবে।

২. পুরো প্রক্রিয়াটাই করবেন গোপনে, নীরবে। আপনি ভবিষ্যতের কী ছবি দেখছেন তা শুধু আপনি জানবেন। কাউকে বলবেন না। বাস্তব ঘটনা যখন ঘটবে তখন সবাই তা দেখবে। আপনার পরিবর্তনের কথা অন্যরা বলাবলি করবে। কিন্তু পুরো ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আপনি এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবেন না।

মনছবির প্রয়োগ

আপনি শুনে হয়তো অবাক হবেন। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে আমাদের কল্পনা ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হলে ইচ্ছা পরাজিত হয়। জয় হয় কল্পনার। আমরা অনেক কিছু করতে দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করার পরও তা করি না বা অনেক জোরালো প্রতিজ্ঞা করেও তা রাখতে পারি না। এটা হয় প্রধানত কল্পনাশক্তির সাথে এর দ্বন্দ্বের কারণে। লক্ষ্য অর্জনে কল্পনা তথা মনছবিকে ব্যবহার না করাও হতে পারে ব্যর্থতার কারণ। অনেকে ভাবেন নিয়মিত ব্যায়াম করব বা সকালে হাঁটব সুস্বাস্থ্যের জন্যে। কিন্তু দেখা গেছে, কয়েকদিন পরে হাঁটা ছেড়ে দেন। অনেকে সিগারেট বা ড্রাগ বা এলকোহল কতবার ছেড়ে কতবার যে ধরেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অথবা প্রতিজ্ঞা করেছেন ডায়েটিং করে ওজন কমাবেন, দুই কেজি কমানোর পর দেখা গেছে ৩ কেজি বাড়িয়ে ফেলেছেন। খুব দৃঢ়তার সাথে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, জীবনে আর কখনো হঠাৎ করে রেগে গিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে পরে অনুতাপ করবেন না। কিন্তু দেখা গেছে প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই রয়ে গেছে। একইভাবে রাগারাগির পুনরাবৃত্তি করেছেন আপনি। ভেবেছেন নার্ভাস হবেন না, কিন্তু ভাবনায় কাজ হয় নি। চাচ্ছেন আরো সক্রিয় হতে। কিন্তু দেখা গেল আলস্য কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। এ ধরনের ক্ষেত্রসহ জীবনের বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ হচ্ছে কল্পনা বা মনছবিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা। অথচ মনছবিকে ব্যবহার করে এ কাজগুলো অনায়াসেই সম্পন্ন করা যায়।

১. বেকারত্ব অবসানে

বেকার ঘুরছেন। কী করবেন ঠিক করতে পারছেন না? চাকরি করবেন না ব্যবসা করবেন, তা-ও বুঝতে পারছেন না? চাকরির দরখাস্ত করছেন, কিন্তু ইন্টারভিউ কার্ডই পাচ্ছেন না? অথবা ইন্টারভিউ দিলেও অভিজ্ঞতার অভাবে আপনাকে নেয়া হচ্ছে না। অথবা মামার জোর নেই বলে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন নীরবে কাজ করে যান। প্রথমে বর্তমান অবস্থার বিবরণ একটা কাগজে লিখুন। পরে যা চান তার বিবরণ লিখুন। যে প্রতিষ্ঠানে চাকরির চেষ্টা করছেন, সে প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা লিখুন। যে কর্মকর্তার আনুকূল্য পেলে আপনার চাকরি হতে পারে সে কর্মকর্তার নাম-ধাম লিখুন। (সম্ভব হলে কর্মকর্তার সাথে দেখা করুন। দেখা করার সময় তার চেহারার সবকিছু খুঁটিনাটি মনে রাখুন।) এমনভাবে লিখুন, যাতে পুরো জিনিসটাই একটা চিত্রে ধরা পড়ে।

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির ড্রইং রুমে যান।

২. এবার মনছবি দেখুন। খুঁটিনাটিসহ পরিপূর্ণ দৃশ্য তুলে ধরুন একেবারে ভিডিও ছবির মতো। দেখুন আপনি খুব স্মার্টভাবে বিনয়ের সাথে কর্মকর্তার কাছে চাকরির আবেদনপত্র দিয়েছেন। তিনি আবেদনপত্র উল্টেপাল্টে দেখে পরে আসার জন্যে বললেন। আপনি পরে গিয়ে জানলেন যে, আপনাকে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে

হাজির হতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে আপনি হাজির। সবাই আপনাকে দেখে উৎফুল্ল হয়েছেন। সবার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিচ্ছেন আপনি। কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে আপনার ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাদের নির্দেশে আপনার জন্যে নিয়োগপত্র টাইপ করা হচ্ছে। পদস্থ কর্তা নিয়োগপত্র সই করেছেন। নিয়োগপত্র আপনার নামে পাঠানো হচ্ছে। আপনি বাসায় নিয়োগপত্র পেয়েই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। আপনার আপনজনরা আপনাকে অভিনন্দিত করছে। আপনি নিয়োগপত্র নিয়ে অফিসে গিয়েছেন। কাজে যোগদান করেছেন। আপনার জন্যে নির্ধারিত চেয়ার টেবিলে গিয়ে বসেছেন। আপনার জন্যে নির্ধারিত কাজ বুঝে নিচ্ছেন। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে কাজ করতে শুরু করেছেন।

[পুরো ছবিটা আপনাকে সকল ইন্দ্রিয়যোগে অনুভব করতে হবে। বাস্তবে চাকরি পেলে আপনার মধ্যে যে অনুভূতি হতো, মনছবি দেখার সময় নিজের মধ্যে সে অনুভূতিগুলো পুরোপুরি নিয়ে আসুন। চাকরি পেলে পিতা-মাতা, ভাই-বোনের মুখে আনন্দের অনুভূতি দেখলে আপনার মধ্যে যে ভাবের উদয় হতো, পুরোপুরি সে ভাব নিয়ে আসুন। চাকরির জন্যে প্রিয়জনরা মিষ্টিমুখ করালে আপনার মধ্যে যে অনুভূতি আসত, তাকেও সম্পৃক্ত করুন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সাথে। চাকরি পাওয়ায় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আপনার মর্যাদা যেভাবে বেড়ে গেছে, তাও অনুভূতির সাথে পরিপূর্ণভাবে মিশিয়ে দিন। ঘটনার সাথে ইন্দ্রিয়গুলোকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলুন, যেন আপনার অবচেতন মন পুরো ঘটনাকেই বাস্তব বলে মনে করে। আমরা আগেই জেনেছি, অবচেতন মন বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারে না।

সেজন্যে আমরা সিনেমায় কোনো বিয়োগান্ত বা করুণ দৃশ্য দেখেও কেঁদে ফেলি বা কোনো উত্তেজক দৃশ্য দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠি। যদিও জানি যে আমরা অভিনয় দেখছি মাত্র। তাই বেকারত্ব অবসানে নিজের যে রূপ আপনি দেখতে চান, সে ছবিকে হৃদয়ে ও ইন্দ্রিয়ে পুরোপুরি গেঁথে ফেলুন। আপনি যে চাকরি পেয়ে গেছেন, এটাই সবসময় মনে করতে থাকুন। জাগ্রত অবস্থায়ও আপনি একজন চাকরিজীবীর মতো আচার-আচরণ করুন। বাস্তবে ভান করুন আপনি চাকরি পেয়ে গেছেন, চাকরির বেতন পেয়ে কী কী করছেন, তা-ও কল্পনার চোখে দেখতে থাকুন। সবসময় পূর্ণ অনুভব ও একাত্মতার সাথে চাকরি পাওয়ার মনছবি দেখুন। পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চয়তার সাথে মনছবি দেখুন। ধাপে ধাপে কী করবেন আপনার অবচেতন মনই তা আপনাকে বলে দেবে।]

৩. প্রতিদিন দুই বার বিরতিহীনভাবে এই অনুশীলন করে যান। কখনোই আলস্য ও গাফলতিকে প্রশ্রয় দেবেন না। মনের বাড়িতে নিজেকে দেয়া সকল অটোসাজেশনসহ অনুশীলনী করে যান। বাস্তবে চাকরি পাওয়াটা এখন আপনার জন্যে সময়ের ব্যাপার মাত্র।

২. ব্যবসায় আয় বৃদ্ধি

ব্যবসা শুরু করেছেন। কষ্ট করে পুঁজি সংগ্রহ করেছেন। দোকান দিয়েছেন। কিন্তু আপনার দোকানে ক্রেতা

তেমন আসছে না। এলেও দাম-দস্তুর করে চলে যাচ্ছে। কেনাকাটা একেবারে হতাশাব্যঞ্জক। লাভ তো দূরের কথা দৈনন্দিন খরচই উঠছে না। হাঁ, এ অবস্থা দূর করে অচিরেই আপনার প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে মনছবির বদৌলতে। প্রথমে এখনকার অবস্থা লিপিবদ্ধ করুন। পরে আপনার দোকানে কেনাকাটা বাড়ছে, কী কী দ্রব্যের কেনাকাটা বাড়ছে, তা লিপিবদ্ধ করুন। এবার-

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির ড্রইং রুমে যান।

২. এবার মনছবি দেখুন আপনি হাসিমাখা মুখে দোকানে বসে আছেন। ক্রেতার ভিড়ে দোকান একেবারে জ্যাম। কাকে আগে মাল দেবেন, কাকে পরে দেবেন, তা নিয়েই সমস্যা। আপনার ক্যাশ বাক্স টাকায় ভরে উঠেছে। আপনি পূর্ণ তৃপ্তির সাথে ব্যবসায় মন দিয়েছেন।

[১নং উদাহরণে বর্ণিত পদ্ধতির মতো বাস্তবে এ ঘটনা ঘটলে আপনার যে অনুভূতি হতো, তা পুরোপুরি সবগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করুন এবং ঘটনার সাথে নিজেকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করুন। নিজেকে পুরোপুরি সফল ভাবুন।]

৩. প্রতিদিন বিরতিহীনভাবে দুই বার এই অনুশীলন করে যান। ফলাফল দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।

৩. বিক্রি বৃদ্ধি

সেলসম্যান বা সেলস প্রতিনিধির কাজ করছেন। বিক্রিতে আপনার জন্যে নির্ধারিত টার্গেট কিছুতেই পুরো করতে পারছেন না। চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু যেখানেই যাচ্ছেন, আশানুরূপ সহযোগিতা পাচ্ছেন না। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেও আপনার তেমন কোনো সময় লাগার কথা নয়। আগের নিয়ম অনুসারে প্রথমে একটা কাগজে বর্তমান অবস্থা লিখে ফেলুন। তারপর যা চাচ্ছেন, তা বিস্তারিত লিখুন। যাদের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাচ্ছেন না, তাদের নাম-ধাম লিখে ফেলুন।

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির ড্রইং রুমে বসুন।

২. এবার মনছবি দেখুন আপনি হাসিমাখা মুখ নিয়ে কেমন চমৎকার এক দোকান থেকে আরেক দোকানে যাচ্ছেন। সবাই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আপনার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। সবাই তা রাখছে। আপনি বিক্রির টার্গেট অতিক্রম করেছেন। কোম্পানির মালিক আপনাকে বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছেন।

[১নং অনুশীলনীর বর্ণিত পদ্ধতির মতো বাস্তবে এ ঘটনা ঘটলে আপনার যে অনুভূতি হতো, তা পুরোপুরি সবগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করুন এবং ঘটনার সাথে পুরোপুরি নিজেকে সম্পৃক্ত করুন। নিজেকে সফল ভাবুন।]

৩. প্রতিদিন দুই বার বিরতিহীনভাবে এই অনুশীলন করে যান।

৪. ব্যক্তি ইমেজ বাড়ানো : উন্নতি

আপনি আপনার বসের সামনে গেলেই নার্ভাস হয়ে যান। গলা শুকিয়ে আসে। আপনার কাজের যৌক্তিকতা নার্ভাসনেসের কারণে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না বলে অহেতুক বকা খান। এমনকি আপনার প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা বা ইনক্রিমেন্টের কথা বলতে না পারায় তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আপনি কি এ অবস্থা থেকে সত্যিই পরিবর্তন চান? মনকে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করুন সে আসলেই অবস্থার পরিবর্তন চায় কিনা? উত্তর হাঁ-সূচক হলে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ুন। প্রথমে বর্তমান অবস্থার কথা লিখুন। তারপর ভবিষ্যতে যা চান তা বিস্তারিত লিখুন। এমনভাবে লিখুন যাতে পুরো বিষয়টিই একটি চিত্রে ধরা পড়ে। এবার নিচের প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন-

১. মনের বাড়ির ড্রইংরুমে যান।

২. এবার মনছবি দেখুন। খুঁটিনাটিসহ পরিপূর্ণ দৃশ্য দেখুন। একেবারে ভিডিও ছবির মতো। দেখুন আপনি খুব স্মার্টভাবে (অবশ্যই বিনীতভাবে) বসের রুমে প্রবেশ করছেন। তাকে সালাম দেয়ার পর তার অনুমতি নিয়ে বসেছেন। কুশল জিজ্ঞেস করছেন। আপনার মধ্যে কোনো নার্ভাসনেস বা জড়তা নেই। আপনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। খুব বিনয়ের সাথে কিন্তু স্পষ্টভাবে আপনি আপনার বক্তব্য তুলে ধরছেন। আপনার পেশাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদির কথা তার কাছে বলছেন। দেখুন তিনি আপনার কথা শুনছেন, উপলব্ধি করছেন এবং তার সম্মতি প্রকাশ করছেন। পদোন্নতির ব্যাপারেও একইভাবে নিজের কথা বলুন। দেখুন তিনি পদোন্নতিতে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। এরপর দেখুন আপনি ইনক্রিমেন্ট বা পদোন্নতির (যেটাই আপনার লক্ষ্য হয়) চিঠি পেয়েছেন। আপনার পদোন্নতি হয়ে গেছে। সবাই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আপনি নিজেও অত্যন্ত তৃপ্ত।

[পুরো মনছবিটা আপনাকে সকল ইন্দ্রিয়যোগে অনুভব করতে হবে। বাস্তবে পদোন্নতির পত্র পেলে আপনার মধ্যে যে অনুভূতি হতো মনছবি দেখার সময় নিজের মধ্যে সেই অনুভূতিগুলো পুরোপুরি নিয়ে আসুন। সবাই পদোন্নতির জন্যে অভিনন্দন জানালে আপনার যে অনুভূতি হতো তা অনুভব করুন। সকল ইন্দ্রিয়যোগে ব্যাপারটাকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলুন, যেন আপনার অবচেতন মন পুরো ঘটনাকেই বাস্তব বলে মনে করে। তাই নিজের যে রূপ আপনি ভবিষ্যতে দেখতে চান, সে মনছবিকে হৃদয়ে ও ইন্দ্রিয়ে পুরোপুরি গেঁথে ফেলুন। যখনই সুযোগ পান আপনি যে ধরনের ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে চান, সে ধরনের ব্যক্তিত্বের ভান করুন। সময় পেলেই পূর্ণ অনুভব ও একাত্মতার সাথে নতুন সৃষ্ট মনছবি দেখুন। পরবর্তী কার্যপ্রণালী অবচেতন মনই আপনাকে বলে দেবে।]

৩. প্রতিদিন দুই বার বিরতিহীনভাবে এই অনুশীলন করে যান।

৫. বিদেশ যাত্রায় ভিসা লাভ

পড়াশুনা, চাকরি বা ভাগ্যের অন্বেষণে বিদেশে যেতে চান? নিয়মমাফিক কাগজপত্র সব তৈরি করার পর ভিসা অফিসারের খেয়ালিপনার শিকার হচ্ছেন? অথবা একটা না একটা খুঁটিনাটি অজুহাতে আপনার ভিসা পাওয়ার ব্যাপারটা পিছিয়ে যাচ্ছে? তৈরি করে ফেলুন মনছবি। প্রথমে বর্তমান অবস্থার কথা কাগজে লিখুন। তারপর আপনি যা চান তার পুরো বিবরণ এমনভাবে লিখুন যাতে তাকে একটা চিত্রে পরিণত করা যায়।

১. মনের বাড়ির ড্রইংরুমে যান।

২. এবার মনছবি দেখুন আপনি সকল কাগজপত্র নিয়ে ভিসার জন্যে গেছেন। কাউন্টারে আপনার ডাক পড়েছে। ভিসা অফিসার প্রফুল্লচিত্তে আপনার কাগজপত্র দেখছেন। আপনাকে সৌজন্যমূলক দুয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করছেন। সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে বলেছেন বিকেলে এসে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে। বিকেলে যাওয়ার পর পাসপোর্ট হাতে নিয়ে দেখলেন এক বছরের ভিসা পেয়ে গেছেন আপনি। আপনি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন। [১নং অনুশীলনীতে বর্ণিত পদ্ধতির মতো বাস্তবে এ ঘটনা ঘটলে আপনার যে আনন্দানুভূতি হতো, তা সবগুলো ইন্দ্রিয় ও পূর্ণ আবেগ দিয়ে অনুভব করুন। পূর্ণ আবেগ দিয়ে ঘটনার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন। ভিসা পেয়ে যাওয়ার পুরো অনুভূতি নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করুন। মনে মনে আনন্দিত হোন, উল্লসিত হোন।]

একনাগাড়ে ৪০ দিন অনুশীলন করে যান। ৪০ দিন করার পর আপনি বাস্তবে ভিসার জন্যে হাজির হোন। কোনো কাগজের অভাব থাকলে তা নিয়ে আবার হাজির হোন। কিন্তু সবসময় অনুশীলনী অব্যাহত রাখুন। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন চমৎকারভাবে। তিনি একটি বড় দেশের দূতাবাসে ভিসার আবেদন করে বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু মনছবির অনুশীলন ছাড়েন নি। পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তা করে গেছেন। ৫ম বারে তিনি ভিসা লাভে সফল হন।

মনছবির প্রয়োগে কীভাবে সফল হওয়া যায়, তা এই আলোচনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে আপনার কাছে। এই অনুশীলনীগুলোর আলোকে সাদৃশ্য যে-কোনো বিষয়ে আপনার মনছবি তৈরি করে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

উপসংহার

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, সফল হতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন হচ্ছে মনছবি। অর্থাৎ যে লক্ষ্য আপনি অর্জন করতে চান, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। লক্ষ্যের সাথে নিজেকে পুরোপুরি একাত্ম করতে হবে। অন্তরে লক্ষ্যকে সবসময় প্রজ্বলিত রাখতে হবে। আপনার সমগ্র কল্পনা, চিন্তা ও অনুভূতিকে এই লক্ষ্যের সাথে একাত্ম করতে হবে। অর্থাৎ মানসিকভাবে নিজেকে সাফল্যের

সাথে শনাক্ত করতে হবে।

সফল হওয়ার জন্যে, সাফল্যের সাথে নিজেকে শনাক্ত করার জন্যে, মনছবি করার পরই প্রয়োজন সাফল্যের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। অর্থাৎ সাফল্য গ্রহণ করার উপযুক্ততা অর্জনে নিজেকে পুরেপুরি সাফল্যের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত হতে হবে। যা পেতে চান নিজেকে তা পাওয়ার যোগ্য করার জন্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাজ ও মনোযোগ প্রদানে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করতে হবে।

মনছবি যত দূরবর্তী বা যত কঠিন হোক না কেন আপনি যদি আপনার মনকে লক্ষ্যের জন্যে প্রস্তুত করতে পারেন এবং সকল প্রয়াসকে সেই লক্ষ্যে নিবেদিত করতে পারেন, আপনি সফল হবেনই। সাফল্যের প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনি ক্রমান্বয়ে বিকশিত হবেন।

সাফল্যের ফুল সবসময় প্রাকৃতিক নিয়মেই ক্রমান্বয়ে প্রস্ফুটিত হয়। একটি ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় আরেকটি ধাপের দিকে। তাই আপনাকে প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুরু করতে হবে। যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করতে হবে। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবেন মনছবির চূড়ান্ত লক্ষ্যপানে। আপনি প্রথম কাজটি প্রথম করলেই আপনার অচেতন মন পরবর্তী ধাপে করণীয় সম্পর্কে সচেতন মনে তথ্য ও উদ্দীপনা প্রেরণ করবে।

তবে চূড়ান্ত লক্ষ্যের মনছবিকে সবসময় মনের সামনে রাখতে হবে। সে পর্যায়ে নিজেকে উত্তীর্ণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণ, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অর্জনের প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, প্রতিটি সফল মানুষ নিজের জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে এই প্রাকৃতিক নিয়মকেই কাজে লাগিয়েছেন।

মনছবির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি। বড় চিন্তা করতে গিয়ে সুদূরপ্রসারি লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে ছোট ছোট কাজ, ছোট ছোট পথের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি না। আমরা বুঝতে পারি না ছোট ছোট ইটই হচ্ছে বিশাল ভবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী, পায়ে চলা পথই গিয়ে মেশে রাজপথে, ছোট ঝর্নাই নদী হয়ে পৌঁছে যায় বিশাল মহাসমুদ্রে। প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজ প্রতিদিন সমাপ্ত করলে মাস-বছর-যুগ শেষে তা-ই পরিণত হয় বিশাল সাফল্যে।

আমরা যদি শতাব্দী প্রাচীন বট গাছের দিকে তাকাই, তাহলে এর ডাল-পালা-কাণ্ড-মূল আমাদের মোহিত করে। কিন্তু যে বীজ থেকে এই মহীরুহ সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা একবার ভাবুন। একটি বট গাছের ফল কাকের পেটে গিয়ে বিষ্ঠা আকারে এই মাটিতে পতিত হয়েছিল বীজটি।

দিন, মাস, বছর পার হয়ে বিষ্ঠার মাঝে নির্গত ছোট বীজটিই দিগন্ত আচ্ছন্নকারী শতাব্দীর মহীরুহে পরিণত

হয়েছে। আসলে জন্মগ্রহণ করেই কেউ সফল হয় না, সিঁড়ি বেয়েই একজন ধাপে ধাপে সাফল্যের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছায়। আর মনছবি হচ্ছে সাফল্যের বীজ। আসলে বাস্তবতার আগে প্রয়োজন ধারণার। ধারণার সাথে বিশ্বাস, একাগ্রতা ও দৃঢ়তা যুক্ত হয়েই সাফল্য আসে।

অধ্যায়-১১

কল্পনা : মনের চালিকা শক্তি

কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যেতে কার না ভালো লাগে। এমন কে আছেন যিনি আকাশ-কুসুম কল্পনায় মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে না ফেলেন। কল্পনাবিলাসী বলে বদনাম রয়েছে এমন লোকের সংখ্যাও তো নেহাত কম নয়। পড়তে বসে কল্পনায় হারিয়ে গিয়ে পিতা-মাতার গালমন্দ খায় নি এমন ছেলে-মেয়ের সংখ্যা নেহাতই কম বলা চলে।

কল্পনা একটা গুণ হিসেবে আমাদের সমাজে একেবারে অবহেলিত। কল্পনা আমাদের সমাজে গণ্য হয় এক পরিত্যাজ্য বিষয় হিসেবে। কল্পনা আর আকাশ-কুসুম অলীকতাকে (Fantasy) এক করে দেখা হয় অথচ মানব সভ্যতার আজকের অগ্রগতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কল্পনা। মানুষ কল্পনা করতে না পারলে কিছুই সৃষ্টি করতে পারত না, বানাতে পারত না, আবিষ্কার করতে পারত না। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সবই মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। তাই বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, 'জ্ঞানের চেয়েও কল্পনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

অভিধানে কল্পনার সংজ্ঞা হচ্ছে, মনের ছবি তৈরির ক্ষমতা। চোখের সামনে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও কোনো কিছুর মানসিক চিত্র (Mental image) তৈরির প্রক্রিয়া; স্মৃতি থেকে ছবি পুনরায় তৈরির মানসিক ক্ষমতা, মনের পুনঃসৃজন ক্ষমতা। কল্পনার অর্থ অভিধানে যা-ই থাক না কেন-আমাদের বাস্তব জীবনে কল্পনা হচ্ছে বাস্তবতার তোরণ। কল্পনাশক্তি আছে বলেই আমরা যা চাই তা করতে পারি, যা চাই তা হতে পারি।

আমাদের বস্তুনিষ্ঠ জীবনও মূলত প্রভাবিত হচ্ছে কল্পনা বা কল্পদৃষ্টি বা কল্পচিত্র দ্বারা। একজন কেমিস্ট রাসায়নিক অণুগুলো কীভাবে একটা অন্যটার সাথে সংযুক্ত হয়েছে তা দেখার জন্যে কল্পচিত্র (Imagery) ব্যবহার করে থাকেন।

একজন ফ্যাশন ডিজাইনার পোশাক তৈরির আগেই মডেলের গায়ে তা পরালে কেমন লাগবে তা কল্পনায় দেখে নেন। একজন শিল্পীর ছবির পুরোটাই আসে কল্পনা থেকে। একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী সাব-এটমিক পার্টিকেলের জগৎকে বোঝার জন্যে কাল্পনিক মডেল তৈরি করেন।

দাবাড়ু খেলার কৌশল নির্ধারণেও ব্যবহার করেন কল্পচিত্র। পরিবহন কর্মকর্তারা কোনো কিছু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে কীভাবে স্থাপন করবেন, তা আগেই কল্পনা করে নেন। একজন সফল ডাক্তার রোগীকে অপারেশন করার আগেই কল্পনায় দেখে নেন পুরো দৃশ্যটা।

তাই ড. কার্ল গুস্তব ইয়াং বলেছেন, 'কল্পনার কাছে আমাদের ঋণ কখনো শোধ হওয়ার নয়।'

সত্যিকার অর্থে মেন্টাল ইমেজ বা মনের ছবি হচ্ছে একটি বস্তু বা বিষয়ের অনুকরণে মনের তৈরি ছবি। আপনার একান্ত কল্পনার জগতে আপনি বাস্তবে সামনে নেই এমন জিনিসের যেমন চিত্র দেখতে পান, তেমনি শুনতে, গন্ধ শুঁকতে, স্বাদ গ্রহণ ও অনুভব করতে পারেন।

আপনি একটি গাঁদা ফুল বা গোলাপ ফুল হাতে ধরে না রেখেও কল্পনায় পুরোপুরি এর ছবি আঁকতে পারেন। বস্তু বা পদার্থ ছাড়াও মনের কল্প ছবি বর্ণনা করতে পারে স্বাধীনতা, মুক্তি, সৌন্দর্য বা আনন্দের স্বরূপ।

মনের ছবি তৈরির ক্ষমতা একেকজনের একেক রকম। যেমন এসি জেনারেটর ও ফ্লুরোসেন্ট বাতির আবিষ্কারক নিকোলাস তেসলার মনের ইমেজ তৈরির ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি মনের চোখে নিয়মিত সব জটিল জটিল যন্ত্রপাতির ত্রিমাত্রিক ইমেজ দেখতেন। যন্ত্রপাতিগুলো খুঁটিনাটি সবকিছু নিয়ে পরিপূর্ণ এবং ব্লু-প্রিন্টের মতো সুস্পষ্ট।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে তেসলা এই যন্ত্রপাতিগুলোর কার্যকারিতা মনে মনেই টেস্ট করতেন। কয়েক সপ্তাহ মনের মধ্যেই চালিয়ে এর পার্টসগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করতেন। বিজ্ঞানী তেসলা অবশ্য ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর কল্পচিত্রকর।

মনে দেখা ছবি তার কাছে চোখে দেখা ছবির মতোই ছিল উজ্জ্বল। যার ফটোগ্রাফিক মেমোরি রয়েছে, শুধুমাত্র তার পক্ষেই এত সুস্পষ্ট কল্পচিত্র তৈরি সম্ভব। যার ফটোগ্রাফিক মেমোরি রয়েছে এমন যে-কেউ সংবাদপত্রের পাতার ওপর কয়েক সেকেন্ড দৃষ্টি বুলিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পুরো পৃষ্ঠাটাই মনের চোখে পড়ে যেতে পারেন। এদের মনের ছবিও হয় নিখুঁত ও দীর্ঘস্থায়ী।

আমরা জানি, কল্পনা জ্ঞানের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। এখন দেখুন না আপনি কতটুকু ভিজুয়ালাইজ করতে পারেন! আপনার মনে সৃষ্ট ইমেজ কী সুস্পষ্ট ও স্থায়ী, না অস্পষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী? ইমেজটি কি ত্রিমাত্রিক বাস্তব না টেলিভিশনের ছবির মতো ফ্ল্যাট?

রঙ কি আপনি স্পষ্ট দেখতে পান? না আপনার ছবি আসে সাদা-কালোতে? ভিজুয়ালাইজ করার সামর্থ্য জনে জনে ভিন্ন, কেউ কেউ একেবারে ত্রিমাত্রিক ছবি দেখেন। আবার কেউ কেউ কোনো ছবিই দেখেন না। কেউ কেউ চিন্তাই করেন ছবির মাধ্যমে। আবার কেউ কেউ মনের চোখে কিছুই দেখেন না, মনে মনে কথা বলেন মাত্র।

মনোবিজ্ঞানীরা ভিজুয়ালাইজ করার সামর্থ্যকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, স্পষ্টতা। অর্থাৎ ইমেজ কত উজ্জ্বল, স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত। দ্বিতীয়ত, স্থিরতা। অর্থাৎ ইমেজ কতটা স্থির ও নিশ্চিত অবস্থায় থাকে। আর দুটোই একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। স্পষ্টতা যোগ করতে পারলে আপনার ইমেজ হবে রঙিন, ত্রিমাত্রিক ও বাস্তব।

স্থিরতা যোগ করতে পারলে তা হবে স্থির ও সুনির্দিষ্ট।

মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস গ্যাল্টন কল্পনা শক্তির স্পষ্টতা পরীক্ষার জন্যে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করেছিলেন। এ প্রশ্নমালার জবাব দিয়ে আপনিও আপনার মনের ইমেজ তৈরির ক্ষমতা যাচাই করে দেখতে পারেন।

অনুশীলন : ভোজ

দৃশ্যটি কল্পনা করতে ২ মিনিট সময় ব্যয় করুন। দাওয়াত খাওয়ার জন্যে আপনি গেছেন কারো বাসায়। খাবার টেবিলে সমবেত মেহমানদের ভিজুয়ালাইজ করুন, পরিবেশ ভিজুলাইজ করুন, টেবিল সজ্জা, খাবারের স্বাদ ও কী কী আওয়াজ শুনেছেন ভিজুয়ালাইজ করুন। দুমিনিট সময়ে আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি ছবি তৈরি করুন। এবার মনে যে ছবি তৈরি হলো তার ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর জবাব লিখুন-

১. আপনার ছবি স্পষ্ট না অস্পষ্ট?

২. মূল দৃশ্যের চেয়ে ছবি কি উজ্জ্বল না অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল?

৩. পুরো দৃশ্যটা কি একই সাথে সুনির্দিষ্ট অবস্থায় ছিল না কোনো অংশ অন্য অংশের চেয়ে স্পষ্ট ছিল?

৪. ছবি কি রঙিন ছিল না সাদা কালোর শেডে ছিল?

৫. ছবি রঙিন হয়ে থাকলে রঙের মিশ্রণ কি সঠিক ছিল?

৬. পুরো খাবার ঘরের অখণ্ড ছবি কি আপনি তৈরি করতে পেরেছিলেন?

৭. আপনি কি আপনার খাবারের প্লেটের ছবি একইভাবে ধরে রাখতে পেরেছিলেন? যদি তা-ই হয় তাহলে কি প্লেটের ঔজ্জ্বল্য বেড়েছিল?

৮. আপনি কি খাবারের প্লেট ও আপনার মুখোমুখি যিনি বসেছিলেন, তাকে একই সাথে দেখতে পেয়েছিলেন?

৯. আপনি কি খাবারের ঘ্রাণ পাচ্ছিলেন?

১০. আপনি কি সবার পোশাক শনাক্ত করতে পারছিলেন?

অনুশীলনের পর কেমন অনুভব করছেন? সম্ভবত আপনার কল্পচিত্রের অংশবিশেষ স্পষ্ট ছিল। আর অংশবিশেষ অস্পষ্ট। হয়তো আপনি মেহমানদের চেহারা স্পষ্ট দেখেছেন, কিন্তু তৈজসপত্রের ধরন ভুলে গেছেন। খাবারের গন্ধ পেয়েছেন, কিন্তু স্বাদ অনুভব করতে পারেন নি। অথবা দাওয়াতের কোনো ইমেজ না দেখে শুধুমাত্র ধারণাকে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন।

মনে ছবি যত পরিষ্কারই আসুক, আমাদের মনের ছবি সঠিক হয় খুবই কম। প্রতিদিনের চির-পরিচিত যে-কোনো কিছুর ছবি আঁকতে যান, তাহলেই বুঝতে পারবেন আপনার মনের ছবির মধ্যে ফাঁক কতখানি!

মূল বস্তুকে আপনি কত গভীরভাবে দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, তার ওপরই নির্ভর করবে আপনার মনের

ছবি তৈরির ক্ষমতা। কোনো বস্তুকে পরবর্তী সময়ে সুস্পষ্ট ভিজুয়ালাইজ করতে চাইলে আপনি সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি বাস্তবে কী দেখছি। কয়েক মুহূর্ত ব্যয় করুন এর পুরো আকৃতি দেখতে। এটি কতটা উজ্জ্বল বা অন্ধকার? এর আকৃতি দেখে কী অনুভূতি হচ্ছে আপনার?

এই বস্তুটি আপনাকে অন্য কোনো কিছুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে কি? এবার বস্তুটিকে ভাগ ভাগ করে অংশ হিসেবে দেখুন। প্রতিটি অংশের বিশেষত্ব বুঝতে চেষ্টা করুন। নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন। একসময় দেখবেন বস্তুটি সম্পর্কে আপনার এক স্বচ্ছ ধারণা ও অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। কোনোকিছু যত দেখবেন, যত জানবেন, তত সহজে তার ছবি মনে সৃষ্টি করতে পারবেন।

মনে কোনো কিছুর সুস্পষ্ট ছবি তৈরি করতে চান? প্রথমে আপনার বিশ্লেষণলব্ধ জ্ঞানকে স্মৃতি থেকে বের করে নিয়ে আসুন। আপনার সামনে ছবিটিকে গড়ে উঠতে দিন। ভিজুয়ালাইজ করার অভ্যাস না থাকলে এটা প্রথমদিকে কষ্টকর মনে হতে পারে। কিন্তু আপনি নিজেকে ভিজুয়ালাইজ করার সময় দিন, দেখবেন উজ্জ্বল ও স্থির ছবি গড়ে উঠছে আপনার মনের চোখের সামনে।

মনের ছবির গুরুত্ব

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন- আত্মউন্নয়ন, মন-নিয়ন্ত্রণ, মনোশক্তির সৃজনশীল প্রয়োগের জন্যে ভিজুয়ালাইজ করার ওপর এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? উত্তর হচ্ছে, মনের শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্যে শিথিলায়নের পরেই ভিজুয়ালাইজ করার গুরুত্ব। কারণ যে লক্ষ্যকে আপনি সুস্পষ্টভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে পারবেন, আপনি তা অর্জনে সক্ষম হবেন। এমনকি ইচ্ছাশক্তি ও মনের ছবির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মনের ছবিই জয় লাভ করে। কারণ মনকে আমরা যে ছবিই দেখাই তা আমাদের বুদ্ধি, অনুভূতি ও শরীর তথা আমাদের সমগ্র সত্তাকে প্রভাবিত করে।

ভিজুয়ালাইজ বা কল্পনার গুরুত্বের অন্যতম কারণ হচ্ছে মনের ছবির সাথে আমাদের অনুভূতি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আমাদের আবেগ মনের ছবির (যেমন মায়ের ছবি, শিশুর ছবি, বিপরীত লিঙ্গের কারো ছবি, বন্ধুর ছবি) সাথে এমনভাবে সাড়া দেয় যেন ছবির মানুষটি সামনে রয়েছে।

তাই ঘর বা অফিস, বন্ধু বা পরিবারের সদস্য, আনন্দ, দুঃখ, স্মৃতি এবং প্রত্যাশার ছবি আমরা সারাদিনই মনের চোখে দেখতে পাই। আর এ ছবির সাথে আমাদের জীবনদৃষ্টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই মনের ছবি দিয়েই আমরা আমাদের জীবনদৃষ্টিকে পাল্টাতে পারি, জীবনকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারি। আর অনেকেই তা করেছেন।

যেমন, অলিম্পিক ক্রীড়াবিদ ব্রুস জেনার তার ড্রইংরুমে চার বছর ধরে একটা হার্ডল রেখেছিলেন। তিনি

যখনই এসে সোফায় বসতেন তখনই এই হার্ডলের দিকে তাকাতেন এবং কল্পনায় লাফ দিয়ে হার্ডল ডিঙ্গাতেন।

গলফার জ্যাক নিকলাউস গলফ বলে শট মারার আগে মনের ভিডিওতে বল কোথায় নিতে চান এবং কীভাবে নিতে চান পুরোটাই দেখে নিতেন। কল্পনার এই ছবি তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতার উৎকর্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আপনার ভিজুয়ালাইজ করার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে নিয়মিত মনের ছবি তৈরির চর্চা করুন। চোখ দিয়ে যা দেখতে পান তা-ই ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করুন। যেমন পরিচিত মুখ, পোশাক, বাড়ি, গাড়ি, পার্ক, ফুল, নিম গাছ, কলম, পেনসিল, দেয়ালের ছবি, দেয়ালের লিখন, মনোগ্রাম, বইয়ের প্রচ্ছদ, যা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা-ই ভিজুয়ালাইজ করুন। আশেপাশের সবকিছুর প্রতি আরো মনোযোগ দিন।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত বা দেখা জিনিস ভিজুয়ালাইজ করলে চারপাশে কী ঘটছে তা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনার বাস্তবতাবোধ হবে আরো গভীর।

কল্পনা শক্তি বাড়ানোর জন্যে

প্রতিদিন কিছুক্ষণ নিজেকে চিত্র বা নাট্য পরিচালক হিসেবে ভাবুন। কোনো বইয়ে গল্প পড়ছেন, ঘটনাকে ছবিতে পরিণত করতে মুহূর্ত সময় নিন। সেটিং, চরিত্র এবং অ্যাকশন ভিজুয়ালাইজ করুন। দেখুন, পুরো ঘটনা যেন আপনার সামনে ঘটছে। পত্রিকায় কোনো খবর পড়ার সময় ভিজুয়ালাইজ করুন খবরে কী ঘটছে। কোনো নেতার বক্তৃতা করার সময় মনের কানে তার মুখেই বক্তৃতা শুনুন। ঝড়ের খবর পড়ছেন, কল্পনা করুন আপনি ঝড়ের মধ্যে পড়লে কী হতো। লঞ্চ ডুবির খবর পড়ছেন, নিজেকে ভিজুয়ালাইজ করুন ডুবন্ত লঞ্চে। যা পড়েছেন, তা মনে রাখার ক্ষমতা বাড়তে দেখে আপনি নিজেই অবাক হবেন।

দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টার ফলে আপনার ছবি তৈরির ক্ষমতা বেড়ে যাবে। কখনো কখনো মনে হবে ছবিগুলো আসছে আস্তে আস্তে, কখনো তা আসবে খণ্ড খণ্ড ভাসা ভাসা। আবার কখনো ছবি আসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, একই সাথে ঝলমলে রঙে, মনে হবে যেন একেবারে বাস্তব ও জীবন্ত। উপলব্ধির এক নতুন স্বাদ পাবেন আপনি। আপনার কল্পনাকে ট্রেনিং দিন যাতে আপনি যা দেখলেন, শুনলেন, স্পর্শ করলেন, ঘ্রাণ নিলেন, স্বাদ নিলেন, তার সবকিছুর কার্বন কপি সে তৈরি করে দিতে পারে মুহূর্তে।
আপনি মনে রাখবেন আপনার ভিজুয়ালাইজ চর্চার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুস্পষ্ট 'মনছবি' তৈরি করা। আর একবার সুস্পষ্ট 'মনছবি' তৈরি করতে পারলে যে-কোনো লক্ষ্য অর্জনে আপনার অবচেতন মনকে কাজে লাগাতে পারবেন আলাদীনের দৈত্যের মতো। এবার তাহলে বাস্তব অনুশীলন শুরু করুন-

কল্পনা ১ : বাস্তবের প্রতিচ্ছবি

শান্তভাবে বসুন। নিয়মমাফিক মনের বাড়িতে যান এবং নিচের প্রতিটি জিনিস ভিজুয়ালাইজ করুন। আপনি যতটা স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে চাচ্ছেন, ততটা স্পষ্ট ছবি না এলে অস্থির হবেন না। জোর করে ছবি আনতে চেষ্টা করবেন না বরং ইমেজ বা ছবি দেখার ধারণার ওপর মনোযোগ ফোকাস করুন। আপনি জানেন যে, নিচের প্রতিটি জিনিসেরই একটা আকার, আয়তন, রঙ ও অবয়ব রয়েছে। প্রথমে আকারের দিকে মনোযোগ ফোকাস করুন। তারপর ধীরে ধীরে বাকি বিষয়গুলো অবলোকন করুন। ইমেজগুলো স্পষ্ট ও স্থির হতে দেয়ার জন্যে সময় নিন।

১. কোনো বন্ধু/বান্ধবীর মুখ

২. ছোটবেলার বন্ধু/বান্ধবী

৩. একটা গরু

৪. একটা দৌড়রত বাছুর

৫. আপনার টুথ ব্রাশ

৬. আপনার টুপি

৭. খেজুর গাছ

৮. আখ

৯. উড়ন্ত চিল

১০. দেবদারু গাছ

১১. কচু পাতার পানি

১২. শরতের মেঘ

১৩. সৈকতে সূর্যোদয়

কল্পনা ২ : স্রেফ কল্পনা

আপনার দেখা জিনিসের ইমেজ এবং না দেখা জিনিসের ইমেজে কী পার্থক্য হয় দেখুন। কল্পনায় ছবি তৈরি করুন-

১. সিন্দাবাদের ভূত ২. সাদ্দাদের বেহেশত ৩. হনুমানের পর্বত বহন ৪. দৈত্যের বাড়ি ৫. পঙ্খীরাজ ঘোড়া ৬.

মধুর নহর ৭ দশ মাথা তাল গাছ।

কল্পনা ৩ : রঙধনু

১. বেগুনি রঙের ৭টি জিনিস ভিজুয়ালাইজ করুন (বেগুন, শিমফুল...)।

২. নীল রঙের ৭টি জিনিস ভিজুয়ালাইজ করুন (নীল, নীল ফুল, নীল পর্দা, নীল গাড়ি...)।

৩. আকাশী রঙের ৭টি জিনিস ভিজুয়ালাইজ করুন (আকাশ, আকাশী পর্দা, প্রচ্ছদ...)।

৪. সবুজ রঙের ৭টি জিনিস ভিজুয়ালাইজ করুন (গাছ, কাঁচা লঙ্কা...)।

৫. হলুদ রঙের ৭টি জিনিস ভিজুয়ালাইজ করুন (গাঁদা ফুল, হলুদ বাটা...)।

৬. কমলা রঙের ৭টি জিনিস ভিজুয়ালাইজ করুন (কমলা, কমলা রঙের গাড়ি...)।

৭. লাল রঙের ৭টি জিনিস ভিজুয়ালাইজ করুন (লাল গোলাপ, লাল ঝাণ্ডা...)।

কল্পনা ৪ : চেহারা

গতকাল যাদের সাথে কথা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের চেহারা এক এক করে ভিজুয়ালাইজ করুন-দেখতে কেমন? মুখের গড়ন কেমন? চোখের রঙ কেমন? চুলের রঙ? কী কাপড় গায়ে ছিল? নাক কেমন ছিল? কীভাবে কথা বলেছিল? কে কে হেসেছিল?

কল্পনা ৫ : রক্ত গোলাপ

বিশাল গোলাপ কল্পনা করুন যা টিলার চেয়েও বড়। বিভিন্ন দিক থেকে তা দেখুন। বিভিন্ন দূরত্ব থেকে দেখুন। গোলাপের পাপড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যান। প্রজাপতির মতো এক পাপড়ি থেকে আরেক পাপড়িতে উড়ে যান।

কল্পনা ৬ : ধারণার চিত্র

ভিজুয়ালাইজ করুন সৌন্দর্যের ধারণাকে। আপনি কী পরিচিত সুন্দর কোনো কিছুর ছবি দেখেছেন? না আপনি সৌন্দর্যের কোনো বিমূর্ত চিত্র দেখতে পাচ্ছেন? আপনি কি সৌন্দর্যের ধারণার সাথে আওয়াজ, সুর, গন্ধ, বর্ণ ও অনুভূতিকে যোগ করেছেন? একইভাবে আপনি পরিবর্তন, এনার্জি, শান্তি, শৃঙ্খলা, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ও ভিজুয়ালাইজ করতে পারেন।

কল্পনা ৭ : শ্রবণ চিত্র

নিম্নোক্ত আওয়াজের চিত্র সৃষ্টি করুন-

১. প্রকৃতিতে শোনা ৭টি আওয়াজ (বৃষ্টি, বাতাস, ঝর্না...)

২. গাড়িতে শোনা ৭টি আওয়াজ (দরজা বন্ধ, স্টার্টিং, হর্ন...)

৩. পশুর ৭ ধরনের আওয়াজ (বিড়াল, কুকুর, গরু, ছাগল...)

৪. পতঙ্গের ৭ ধরনের আওয়াজ (মশা, মাছি, ঝিঁঝি পোকা...)

৫. যান্ত্রিক ৭টি আওয়াজ (পাখা, এয়ার কন্ডিশনার...)

৬. মানুষের ৭টি আওয়াজ (গান, কাশি, নাকডাকা...)

কল্পনা ৮ : স্পর্শ চিত্র

নিম্নোক্ত জিনিসগুলোর স্পর্শের অনুভূতি ভিজুয়ালাইজ করুন-

১. ৭ ধরনের কাপড় (সিল্ক, সুতি, পলিস্টার, রেয়ন...)

২. ৭ ধরনের নির্মাণ সামগ্রী (ইট, পাথর, লোহা, সিমেন্ট...)

৩. ৭ ধরনের গাছ (আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু...)

৪. ৭ ধরনের ফুল (গোলাপ, বেলি, শিউলি, বকুল...)

৫. ৭ ধরনের তৈজসপত্র (প্লেট, কাঁচের গ্লাস, এলুমিনিয়ামের বাটি, স্টিলের চামচ...)

কল্পনা ৯ : স্বাদ চিত্র

নিম্নোক্ত খাবারের স্বাদের সুস্পষ্ট চিত্র সৃষ্টি করুন-

১. ৭ ধরনের মাছ (রুই, কাতল, ইলিশ...)

২. ৭ ধরনের গোশত (গরু, খাসি, মুরগি, কবুতর...)

৩. ৭ ধরনের ফল (কলা, আম, কাঁঠাল, কমলা...)

৪. ৭ ধরনের সবজি (ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো...)

৫. ৭ ধরনের তৈরি খাবার (বিরিয়ানি, পরাটা, ভাত, ডাল, খিচুড়ি...)

কল্পনা ১০ : গন্ধ চিত্র

নিম্নোক্ত জিনিসের গন্ধের চিত্র সৃষ্টি করুন-

১.৭ ধরনের গোশত (গরু, খাসি...)

২.৭ ধরনের মাছ (রুই, কাতল...)

৩.৭ ধরনের রান্না করা খাবার (বিরিয়ানি, খিচুড়ি...)

৪.৭ ধরনের ফল (কলা, আম...)

৫.৭ ধরনের সবজি (ফুলকপি, আলু...)

৬.৭ ধরনের ফুল (গোলাপ, বেলি...)

৭.৭ ধরনের ইঞ্জিন সংক্রান্ত গন্ধ (পেট্রোল, মোবিল...)

৮.৭ ধরনের পরিবেশগত গন্ধ (সমুদ্র, জঙ্গল, তৃণভূমি, শস্যভূমি...)

৯.৭ ধরনের আবহাওয়াগত গন্ধ (বাতাসের আর্দ্রতা, বৃষ্টি...)

অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি ১০টি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করেছেন। সন্দেহ নেই, আপনার কল্পনার শক্তি এখন বহুগুণে বেড়ে গেছে। আপনি এখন স্পষ্টভাবে অনেক কিছু ভিজুয়ালাইজ করতে পারছেন। সাফল্যের জন্যে মনছবি তৈরি এখন আপনার জন্যে সহজ হবে।

অধ্যায়- ১২

মনোযোগ : মনের বল

মনের সবচেয়ে বড় শক্তি মনোযোগ। মনোযোগ, একাগ্র মনোযোগ মনের শক্তিকে, চিন্তার শক্তিকে করে তোলে অপ্রতিরোধ্য। কোনো চিন্তা বা কাজের প্রতি অখণ্ড ও একাগ্র মনোযোগ দিতে পারলে তাতে সবসময়ই যুক্ত হয় এক নতুন মাত্রা।

চিন্তা বা কাজের ক্ষেত্রে সফল পদচারণার মূল কথাও হচ্ছে অখণ্ড মনোযোগ। মনোযোগ হচ্ছে প্রতিটি দক্ষতার ভিত্তি। মনোযোগের ফলেই আমরা যুক্তি দিতে পারি, চিন্তা করতে পারি, অসহনীয় যানজটের মধ্য থেকেও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি। ব্যবসা, বাণিজ্যে নতুন পরিকল্পনা নিতে পারি, গানের সুর তুলতে পারি, নাচের মুদ্রায় দক্ষতা দেখাতে পারি, দূর থেকে আগত ধ্বনির অর্থ উপলব্ধি করতে পারি, সঙ্গীতের রাগের পার্থক্য বুঝতে পারি, চায়ের পাতার একটা থেকে অন্যটার ফ্লেভারের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি।

দার্শনিক র‍্যালফ ওয়াল্ডো ইমারসন মনোযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষমতার মূল রহস্যই মনোযোগ।'

কিন্তু আমাদের মনোযোগের প্রকৃতিই হচ্ছে বিক্ষিপ্ত বিচরণ। মন মুহূর্তে অতীত রোমন্থন করছে, মুহূর্তে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে, মুহূর্তে বর্তমানে চলে আসছে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বাভাবিক মনোযোগ কোনো বিষয়ে কখনো একসাথে কয়েক সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হয় না।

দার্শনিক প্লেটো তাই মনকে তুলনা করেছেন বিদ্রোহ কবলিত জাহাজের সাথে। নাবিকরা বিদ্রোহ করে ক্যাপ্টেন ও পাঞ্জেরীকে বন্দি করে জাহাজের খোলে আটকে রেখেছে। নাবিকরা নিজেদেরকে মনে করছে মুক্ত স্বাধীন। যখন যেদিকে যার ইচ্ছে, তখন সেদিকে সে জাহাজ চালাচ্ছে। কারণ নাবিকরা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করতে পারছে না, আর লক্ষ্য ঠিক করে থাকলেও সেদিকে জাহাজকে পরিচালিত করতে পারছে না।

প্লেটোর মতে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নাবিকদের বিদ্রোহ দমন করে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও পাঞ্জেরীকে মুক্ত করে পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাহলেই লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার স্বাধীনতা লাভ ও সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে ক্রমাগত সঙ্গতিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হবে। মনের মুহূর্তের খেয়ালিপনার অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করলেই সত্যিকার স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু মনের খেয়ালিপনা থেকে মুক্তি পাওয়া যে কত কঠিন, একটা উদাহরণ থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ধরুন

আপনার কাছে মোট ১০০ ইউনিট মনোযোগ আছে। যখন মন কিছু ভাবে বা মন কোনোকিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন মনোযোগ বা মেন্টাল এনার্জির একটা অংশ ব্যয় হয়। আর যখন আপনার চিন্তা বিঘ্নিত হয় বা মনে অন্য কোনো চিন্তা আসে তখন মনোযোগ বা মেন্টাল এনার্জির অপচয় হয়।

এবার ধরা যাক, আপনি কোনো লেখার কাজ নিয়ে বসেছেন। কাজ করতে গিয়ে মনে হলো বসাটা ঠিক জুতসই হয় নি। একটু নড়েচড়ে বসলেন। আর এটা করতে গিয়ে আপনার মনোযোগের একটা অংশের অপচয় হলো। আপনি আপনার কোনো দৈহিক টেনশন সম্পর্কে সজাগ না থাকলেও পেশির যে-কোনো উত্তেজনা আপনার মেন্টাল এনার্জির অপচয় ঘটাবে। ধরুন, এই নড়াচড়ায় ১৫ ইউনিট মনোযোগের অপচয় ঘটল।

আবার লিখতে বা কাজ করতে শুরু করলেন। দেখা গেল সারাদিন যেখানে নাক, কান বা শরীরের কোথাও চুলকায় নি, সেখানে চুলকানি অনুভব করলেন, অবচেতনভাবেই চুলকানির কাজে লেগে গেলেন। এভাবে আবার ১৫ ইউনিট মেন্টাল এনার্জির অপচয় হলো।

আবার লিখতে বা কাজ করতে বসে একটু পরেই একঘেয়েমি লাগতে শুরু করল। আপনার মনের একটা অংশ লিখতে বা কাজ করতে চায়, আরেকটা অংশ তখন বাইরে বেড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। আপনার আরো ১৫ ইউনিট মেন্টাল এনার্জির অপচয় হলো।

একটু পরেই হয়তো আপনি ক্লান্তি অনুভব করলেন, একটু ঝিমুনি এসে গেল। আরো ১৫ ইউনিট মনোযোগ বা মেন্টাল এনার্জির অপচয় হলো।

এখন কল্পনা করুন, লেখা বা কাজ থেকে আপনার চিন্তা উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে বেড়াতে শুরু করল। আপনি হয়তো চিন্তা করতে লাগলেন ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা বা ভাবলেন স্ত্রীর জন্যে শাড়ি কেনার বা ধার-দেনার কথা বা ভাবলেন নিজের বোকামির জন্যে তাস খেলায় হেরে যাওয়ার কথা বা কোনো চলচ্চিত্র দেখতে যাওয়ার কথা। আপনার আরো ১৫ ইউনিট মনোযোগের অপচয় ঘটল।

এবার কল্পনা করুন রান্নাঘরের পানির কল ভালোভাবে বন্ধ না করে কাজের মেয়ে কোথাও গেছে। আপনাকে উঠে গিয়ে কল বন্ধ করতে হবে। কারণ টপটপ শব্দ আপনার মধ্যে চূড়ান্ত বিরক্তির জন্ম দিচ্ছে। আরো ১৫ ইউনিট মনোযোগের অপচয় ঘটলো। একটামাত্র লেখা বা কাজ নিয়ে বসে ১০০ ইউনিট মনোযোগ থেকে যদি এতগুলো ইউনিট মনোযোগের অপচয় ঘটে তাহলে অবশিষ্ট আর কী থাকে?

শুধু এই একটি লেখা বা কাজের বেলায়ই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এবং বেশিরভাগ সময়ই আমরা মেন্টাল এনার্জির শুধুমাত্র অংশবিশেষ ব্যবহার করে থাকি। কারণ আমাদের মন সবসময় কল্পনা, প্রত্যাশা, বিশ্লেষণ ও দুশ্চিন্তায় নিয়োজিত থাকে। আমাদের মন একইসময় বহু ধরনের কাজ করে।

মনের এক অংশ হয়তো ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে, সাথে সাথে অন্য অংশ অতীত রোমন্থন করছে, মনের এক অংশ হয়তো কথা বলছে অন্য অংশের সাথে। কথা ও ইমেজের তোড়ে চিন্তা হয়ে যাচ্ছে এলোমেলো।

ফুটবল মাটিতে পড়ে যেমন অনির্ধারিত গতিতে ওপরে লাফিয়ে ওঠে, তেমনি আমাদের চিন্তাও বেশিরভাগ সময় ফালতু লাফালাফি করে। আমাদের জীবনে ১০০ ইউনিট মনোযোগের বেশিরভাগই আমরা অপচয় করে থাকি।

২ মিনিট মনোযোগ

আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ এ অনুশীলন, মাত্র দু'মিনিট ঘড়ির কাঁটার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ নিয়ে তাকিয়ে থাকা। ঘড়ির কাঁটা ছাড়া অন্য কোনোকিছু না ভাবা। বিশিষ্ট সাধক 'মৌনী সাধু' এই অনুশীলনের উদ্ভাবক। অনুশীলনীর পদ্ধতিটাও খুব সহজ।

দুই মিনিট মনোযোগ

১. বড় সেকেন্ডের কাঁটা রয়েছে এমন একটি দেয়াল বা টেবিল ঘড়ির সামনে বসুন। টেবিল বা দেয়াল ঘড়ির অভাবে বড় সেকেন্ডের কাঁটাযুক্ত হাতঘড়ি দিয়েও কাজ চলতে পারে।

২. শরীর শিথিল হতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিন। সবকিছু থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে এনে একাগ্র হোন। মানসিক প্রস্তুতি শেষ করার পর সেকেন্ডের কাঁটার গতির ওপর আপনার মনোযোগ নিবদ্ধ করুন।

৩. মাত্র দু'মিনিটের জন্যে আপনার সচেতনতাকে সীমিত রাখুন সেকেন্ডের কাঁটার গতির ওপর। এমনভাবে মনোযোগ দিন যে, সেকেন্ডের কাঁটা ছাড়া এই মহাবিশ্বে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

৪. অন্য কোনো চিন্তা ঢুকে যদি মনোযোগের সুতো ছিঁড়ে ফেলে তাহলে থামুন। আলতোভাবে মনোযোগ সেকেন্ডের কাঁটায় ফিরিয়ে আনুন।

৫. পাক্কা দু'মিনিট আপনার মনোযোগ বজায় রাখতে চেষ্টা করুন। বইটা পাশে ঠেলে রাখুন। অনুশীলনী শুরু করুন।

কেমন লাগল আপনার? মনোযোগ দেয়া কি প্রথমে সহজ হয়েছিল? পরে তা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়? আপনি কি তখন অন্য কোনো চিন্তা করছিলেন? অথবা কি ভাবছিলেন কত সুন্দরভাবে অনুশীলন করছেন? বা একদম অনুশীলন হচ্ছে না?

দু'মিনিটে আপনার মনোযোগের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, আপনি লক্ষ্য করেছেন কিছুক্ষণ পর আপনার মন অন্য কোনোকিছু নিয়ে ভাবতে চেয়েছে। নিষ্ক্রিয় মনোযোগ সবসময়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, কিন্তু সক্রিয় মনোযোগে সবসময় মানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সত্যি বলতে কী মনোযোগ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। মনোযোগ চোখের দৃষ্টির মতো।

মনোযোগ ও দৃষ্টি সবসময় বাছাই করে চলে। যেমন যে-কোনো মুহূর্তে আপনি আপনার পুরো দৃষ্টিসীমার মাত্র অংশবিশেষ দেখছেন। যেমন, এই মুহূর্তে বইয়ের পাতার এ লেখাগুলো আপনি খুব স্পষ্ট দেখছেন। রুমের অন্যান্য জিনিসগুলো ও পারিপার্শ্বিক ছবি আপনার কাছে অস্পষ্ট। সবকিছু বুঝতে হলে এক এক করে ঘরের সবকিছু আপনাকে বুঝতে হবে।

একইভাবে আপনি যদি এই লেখা থেকে সবকিছু বুঝতে চান, তাহলে লেখার বিভিন্ন স্থানে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে মনকে ভালোভাবে পরিচালিত করতে হবে। তবে মন বসাতে গিয়ে লক্ষ করবেন, যে ভাবনায় আপনার মন বসাতে চাচ্ছেন সে ভাবনায় মন বসতে চাচ্ছে না, আর যে ভাবনা মন থেকে তাড়াতে চাচ্ছেন সে ভাবনাই ঘুরে ফিরে আসছে। মনের এ প্রবণতাকেই আমরা মনোযোগ বাড়ানোর কাজে লাগাতে পারি।

মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমসের ভাষায়, আমরা যাকে ধারাবাহিক মনোযোগ বলি, তা হচ্ছে বার বার বিষয়টিকে মনের কাছে নিয়ে আসা। কোনো বিষয় একবার মনের কাছে ফিরিয়ে আনলে বিষয়টি ভালো লাগলে তাতে মনোযোগ বাড়তে থাকে। আর এতে মজা পেলে মন মনোযোগ নিবদ্ধ করে।

মনোযোগের মূল কৌশল

মনোযোগের মূল কৌশল হচ্ছে একটা মানসিক ছন্দ সৃষ্টি করা। তাই কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ করার থাকলে প্রথমে ঠিক করুন কতক্ষণ এবং কী পরিমাণ মনোযোগ এর পেছনে দিতে চান। কাজটি হতে পারে কোনো বই পড়া, কোনো নোট তৈরি বা বাগানের পরিচর্যা, গৃহস্থালীর কোনো কাজ বা কোনো আলোচনা। আপনি নির্দিষ্ট

কাজের প্রতি মনোযোগ দিন।

যখন বুঝতে পারলেন আপনি কাজের বাইরে কোনো বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন বা আকাশ কুসুম কল্পনায় নিমজ্জিত হয়েছেন, তখন পুনরায় আলতোভাবে হাতের কাজে ফিরে আসুন। যা দেখলেন বা যা করছেন তার প্রতি পুরো মনোযোগ দিন। অল্প সময় নিয়ে শুরু করুন।

আস্তে আস্তে সময় বাড়ান। পুরো মনোযোগ দেয়াকে অভ্যাসে পরিণত করুন। দেখবেন আপনার প্রয়োজনের মুহূর্তে মনের এই সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র মনোযোগ বা মেন্টাল এনার্জি আপনার জন্যে কী অসাধ্য সাধন করে দেয়!

দুই মিনিটের মনোযোগ মনের এই অসাধারণ শক্তিকে সংহত করার এক চমৎকার অনুশীলন। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আপনি এই অনুশীলন শুরু করার কয়েকদিন পরই অনুভব করবেন কাজটা যেন দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

ঘটনার রহস্যটা অন্য জায়গায়। কারণ সচেতন চর্চার ফলে আপনার মনোযোগ সম্পর্কে আপনি আরো বেশি জ্ঞান লাভ করছেন। আপনি ঠিক ধরতে পারছেন কখন আপনার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর কখন তা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বহাল থাকছে, কখন মনোযোগ ঘোলাটে হয়ে উঠছে, কখন তা থাকছে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

আত্মসমালোচনা জোরদার হওয়ায় আপনি মনের কাছ থেকে আরো বেশি স্বচ্ছ মনোযোগ দাবি করবেন। কয়েক সপ্তাহ নিয়মিত ৫ থেকে ১০ মিনিট চর্চা করলে আপনি অনুভব করবেন আপনার মনোযোগের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

তখন আপনি দীর্ঘ সময় অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারবেন। আপনার মনোযোগ হবে স্বচ্ছ এবং মুহূর্তে তা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হতে সক্ষম হবে। আপনিও পারবেন পুরোপুরি ১০০ ইউনিট মনোযোগ কাজে লাগাতে।

অখণ্ড মনোযোগ প্রদানের জন্যে আপনি আপনার মনোযোগের প্রতি মনোযোগী হোন। কারণ মনোযোগ বা মাইন্ড এনার্জি হচ্ছে মনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। একে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল হতে উৎসাহিত করুন। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত চারটি পদক্ষেপ আপনাকে পুরোপুরি সফল করে তুলতে পারে।

১. দৈহিক প্রক্রিয়া

২. আবেগ প্রক্রিয়া

৩. মানসিক প্রক্রিয়া

৪. ভান করা

১. দৈহিক প্রক্রিয়া

আপনি এমনভাবে বসুন বা দাঁড়ান, যাতে সহজে মনোযোগ দিতে পারেন। শরীরকে শিথিল করে দিন। অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়ায় শক্তির অপচয় করবেন না। বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো এই কথাটা খুব সুন্দর করে বলেছেন, 'আমি যখন আমার স্টুডিওতে কাজ করি, তখন আমার দেহটাকে আমি দরজার বাইরে রেখে আসি। মুসলমানরা যেমন মসজিদে ঢোকার আগে দরজায় জুতা খুলে রেখে ভেতরে ঢোকে, আমিও তেমনি দেহটাকে রেখে শুধু মনটা নিয়েই স্টুডিওতে ঢুকি।'

শুধু পিকাসোর বেলায়ই নয় আপনি যদি হীরক বা মণিরত্ন কাটার সময় মনিকারের প্রতি দৃষ্টি দেন, দেখবেন তার কোনো অপ্রয়োজনীয় দৈহিক তৎপরতা নেই। একজন বিজ্ঞানী যখন গবেষণা বা চিন্তায় নিমগ্ন বা একজন অর্কেস্ট্রা পরিচালক যখন সংগীত পরিচালনায় নিমগ্ন তখন তার কোনো অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া থাকে না।

পক্ষান্তরে একজন সাধারণ মানুষকে দেখুন, পড়তে বা কাজ করতে বসেই সে হয়তো পা নাচাচ্ছে, নড়েচড়ে বসছে, গা চুলকাচ্ছে বা নখ কামড়াচ্ছে অথবা হাত দিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করছে। বুঝতে হবে তার মনোযোগ একেবারেই বিক্ষিপ্ত। মনোযোগের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও প্রতিভাবানের মধ্যে পার্থক্য এখানেই।

আপনি মনোযোগী হতে চাচ্ছেন, প্রতিভাবানদের মতো সফল হতে চাচ্ছেন। কাজেই আপনাকে তা-ই করতে হবে যা প্রতিভাবানরা করেছেন।

যখন আপনার মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন তখন এমনভাবে বসুন, যাতে মনোযোগ নিবিষ্ট করা সহজ হয়। পেশিগুলোকে শিথিল করে দিন। সোজা হয়ে আরামে বসুন। অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বন্ধ করুন। চেয়ারে বসলে এমনভাবে বসুন, যাতে পা মেঝেতে লেগে থাকে।

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসুন এবং যাতে মনোযোগ দিতে চান তা সামনে রাখুন। কয়েক মিনিট এভাবে বসুন। তাহলেই আপনি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারবেন। যখন নিজেকে শিথিল ও মনোযোগী মনে হবে, তখন আপনার শিথিলতা ও মনোযোগ আরো বাড়বে। বসা বা দাঁড়ানোটা যদি মনোযোগের অনুকূল হয়, তাহলে মনোযোগ হয়ে উঠবে অসাধারণ ফলপ্রসূ। এজন্যে দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেছেন, যখন বসে আছ তখন শুধু বসেই থাকো, যখন দাঁড়ানো থাকো শুধু দাঁড়িয়ে থাকো, অস্থিরমনা হয়ো না।

২. আবেগ প্রক্রিয়া

মনোযোগ বাড়ানোর জন্যে মনে এমন একটি আবেগ সৃষ্টি করুন যা মনোযোগের অনুকূল। যে কাজে হাত দিয়েছেন তাতে আগ্রহ সৃষ্টি করুন। জোর করে নয়, উৎসাহ দিয়ে মনকে পরিচালিত করুন। কাজের মজার দিকগুলো খুঁজে বের করুন এবং একে আপনার অন্যান্য আগ্রহ বা হবির সাথে যুক্ত করুন।

মনোযোগ বাড়ানোর এটাই সহজ উপায়। কারণ মনের ওপর যত বেশি জোর প্রয়োগ করবেন, মনোযোগ দেয়া তত বেশি কঠিন হবে। তখন মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হবে গাধাকে টেনে নড়ানোর মতো কষ্টসাধ্য। কারণ গাধাকে টেনে বা ঠেলে নড়ানো যায় না। যত বেশি টানাটানি বা ধাক্কাধাক্কি করবেন তত অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে সে।

শক্তি প্রয়োগে গাধাকে নড়ানো যায় না, গাধাকে নড়াতে হলে তার মধ্যে আগ্রহ ও আবেগ সৃষ্টি করতে হবে। গাধার নাকের সামনে একটা মুলো ঝুলিয়ে দিন। ব্যস! দেখবেন মুলো যেদিকে যাচ্ছে, গাধাও অবলীলায় সেদিকে চলতে শুরু করছে।

মনোযোগের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে আগ্রহ। রহস্যোপন্যাস বা অ্যাকশন ছায়াছবিতে মনোযোগ দেয়ার জন্যে মনকে শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করতে হয় না। না করলে গুরুতর ক্ষতি হতে পারে এমন কিছুতে মনোযোগ দিতেও মনকে বলে দিতে হয় না। আগ্রহ মনোযোগের চালিকাশক্তি।

আপনি যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তার প্রতি মনোযোগ দিতে আপনাকে বলে দিতে হয় না। তাই যে-কোনো ব্যাপারে মনোযোগ বাড়াতে হলে আপনার মনকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। আগ্রহ থাকলে মনোযোগও নিজে নিজেই চলে আসবে। অনেকটা কান টানলে মাথা আসার মতো।

আগ্রহ আবার নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসন্ধিৎসার ওপর। কল্পনা করুন নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন। অনুসন্ধিৎসা নিয়ে নুড়ির দিকে তাকান। ছোট, বড়, মসৃণ, খসখসে, চ্যাপ্টা, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি কত ধরনের নুড়ি রয়েছে! হয়তো তুলে নিয়ে একটা ছোট্ট নুড়ির মধ্যেই আপনি আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন বিশাল বৈচিত্র্য।

জংলা পথে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছেন। দুপাশের গাছের বৈচিত্র্য, লতার বৈচিত্র্য, পাতার বৈচিত্র্য, অনুসন্ধিৎসা নিয়ে দেখলে আপনাকে মোহিত করে তুলতে পারে। অনাদর, অযত্ন ও অবহেলায় লালিত একটা বুনো ফুলের মধ্যেই স্বর্গের প্রতিচ্ছবি দেখতে পারেন। যত তাকাবেন তত বেশি আপনি দেখতে পাবেন। যত বেশি দেখতে পাবেন, তত আপনি একাগ্র ও একাত্ম হবেন দেখার সাথে।

দৈনন্দিন সাধারণ কাজও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর ফলে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। যেমন প্রতিদিনের নোংরা থালা-বাসন পরিষ্কার করা। একে যদি আপনি মনে করেন প্রতিদিন নোংরা ঘাঁটছেন, তাহলে এ কাজে আপনার বিরক্তি ছাড়া কিছুই আসবে না।

আর যদি মনে করেন, আপনার স্পর্শে একটা নোংরা জিনিস কত সাফসুতরা ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে, তাহলে কাজে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। বাগানে গাছের পরিচর্যা করা বিরক্তিকর ও একঘেয়ে মনে হতে পারে। কিন্তু

বাগানের প্রতিটি গাছের প্রতিটি পাতার ভাষা, প্রতিটি গাছের জীবন বৈচিত্র্য, প্রতিটি ফুলের সুবাস ও রঙের পার্থক্য ও পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে যদি আপনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন তাহলে বাগান ছেড়ে আসাই আপনার জন্যে মুশকিল হবে।

অফিস বা ব্যবসার কাজেও একইভাবে আপনার আগ্রহ বাড়াতে পারেন। প্রথমত কাজের আকর্ষণীয় দিকগুলো খুঁজে বের করতে মনকে উৎসাহিত করুন। এর মধ্যে নতুন বা অসাধারণ কী আছে দেখুন, জানা বিষয়ের সাথে অজানা বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ করুন, পার্থক্য বের করুন।

মনকে যখনই একটা বিষয়ের সাথে অপর বিষয়ের সংযোগ করতে দেবেন, তখনই আপনি অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠবেন। প্রথমে যা বিরক্তিকর মনে হয়েছিল, তা-ই তখন আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ অব্যাহত রাখতে চাইলে সে সম্পর্কে নতুন কিছু খুঁজে বের করুন।

কোনো সভা বা আলাপ আলোচনাকেও ইচ্ছে করলেই প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। কোনো সভায় বসে আছেন, একঘেয়ে লাগছে। আপনি ১০ বছরের এক কিশোরের চোখ দিয়ে সবকিছু দেখুন না, অথবা মনে করুন সবাই আপনার অপরিচিত অথবা ভাবুন আপনি এদের ভাষা বোঝেন না। দেখবেন তখন আগের মতো একঘেয়ে লাগছে না।

বিরক্তিকর বা আকর্ষণহীন কারো সাথে আপনি ইচ্ছে করলে আকর্ষণীয় আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারেন। তার কাছে জানতে চান, কী তার পছন্দ, কী অপছন্দ, কোন বস্তু তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কী তার ভালো লাগে? আপনি দেখবেন একঘেয়েমি কমে গেছে।

সুস্থ মন সহজেই আগ্রহ সৃষ্টি করতে ও বজায় রাখতে পারে। বলা যেতে পারে, সচল মন হচ্ছে ব্যক্তিগত আগ্রহের ডিপো। সচল মন হচ্ছে ধারণার শিকড় গাড়া, অঙ্কুরিত হওয়া এবং পত্রপুষ্পে সুশোভিত হওয়ার এক উর্বর ক্ষেত্র। আর সবচেয়ে সুখী মানুষ সে যে মজার মজার বিষয় চিন্তা করতে পারে।

৩. মানসিক প্রক্রিয়া

সহজ মনোযোগের জন্যে বিশেষ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করুন। সুস্পষ্টভাবে আপনার কাজকে চিহ্নিত করুন। লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করুন। মানসিক ছন্দ সৃষ্টি করুন, যাতে করে আপনার কাজে একটা গতি সৃষ্টি হয়। সহজ মনোযোগ এবং সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগানোর পন্থা একই।

দুটি বিষয়ই নির্ভর করে কী করতে হবে, কোনটার পর কোনটা করতে হবে, কতক্ষণে করতে হবে তা জানার ওপর। কোনটা গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে আপনার মনোযোগরূপী সম্পদ বা শক্তির সফল প্রয়োগ করতে পারবেন।

তাই দিনের কাজ শুরু করার আগে একটু থামুন। আপনার চিন্তাধারাকে সহজ খাতে প্রবাহিত হতে দিন। মানসিকভাবে সজাগ হয়ে উঠুন। নিজের দিনের কর্মসূচির প্রতি তাকান। তালিকায় কোন কোন কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে চিহ্নিত করুন।

যদি কোনোকিছু গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে তাতে মনোযোগ দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনোকিছু তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সেরে তারপর এতে হাত দিতে পারবেন। আর তুচ্ছ কাজগুলো করবেন সবার শেষে।

কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারিত করার পর সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করুন। নির্দিষ্ট কাজ থেকে কী ফলাফল অর্জন করতে চান তা পুরোপুরি প্ল্যান করে ফেলুন। নির্ধারিত লক্ষ্যের একটা মানসিক ইমেজ তৈরি করুন। সেই ইমেজকে সামনে রেখে ধাপে ধাপে কাজটি সুসম্পন্ন করুন। বড় কাজকে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট খণ্ডে রূপান্তরিত করুন। ছোট ছোট খণ্ড কাজে আপনার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হবে কম। মনের এনার্জির অপচয় না হওয়ায় কত দক্ষতার সাথে যে আপনি কাজটি সম্পন্ন করলেন, তা ভেবে নিজেও অবাক হবেন।

নির্দিষ্ট কাজের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার জন্যে পারিপার্শ্বিক বাধাগুলো হ্রাস করার চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিন, টেলিফোন না ধরলেই ভালো। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে অন্যের সাথে আলাপ করার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করুন। সকল কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো দিনের একটা বিশেষ অংশে করার চেষ্টা করুন।

মনোযোগের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে আপনার ব্যক্তিগত কর্মছন্দ। খেয়াল করে দেখুন না সকালে বিকেলে বা রাতে কখন আপনার মন সবচেয়ে বেশি সজাগ ও সৃজনশীল অবস্থায় থাকে, কখন আপনি কাজে সবচেয়ে বেশি স্বতঃস্ফূর্ততা অনুভব করেন, কাজের পরিকল্পনা করতে কখন আপনি বেশি আনন্দ পান। আপনার ব্যক্তিগত দেহছন্দ অনুসারে আপনার কাজের জন্যে সময় নির্দিষ্ট করুন। কাজে মনোযোগ দেয়া তাতে সহজ হবে। কাজে সৃষ্টি হবে একটা সুন্দর গতি।

৪. ভান করা

মনোযোগের ভান করাও মনোযোগী হতে সাহায্য করে। তাই যখন আপনার মনে হচ্ছে আপনি মনোযোগী হতে পারছেন না, তখন মনোযোগের ভান করুন বা মনোযোগীকে অনুসরণ করুন। ভান করুন যে, আপনি যা করছেন তাতে নিজেকে পুরোপুরি নিমগ্ন করেছেন।

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন এ কাজটায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারলে কীভাবে আপনি বসতেন বা দাঁড়াতেন বা থাকতেন? বিষয়টিতে পুরোপুরি আগ্রহী হলে আপনার কেমন লাগত?

অপচয় না করে মনোযোগ পুরোপুরি দেয়ার জন্যে আপনি কীভাবে কাজ করতেন? এভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে থাকলে স্বাভাবিক নিয়মেই আপনি মনোযোগী হয়ে উঠবেন।

সচেতনতা অনুশীলন

১. বাস, লঞ্চ, ট্রেনের যাত্রী হিসেবে ভ্রমণকালে নিশ্চিত মনে এই অনুশীলন করতে পারেন। যানবাহনে যাত্রাকালে যখন ব্যয় করার মতো সময় পাচ্ছেন, তখন চারদিকে তাকান। একটা বিষয়বস্তু বেছে নিন। এটি কোনো বিজ্ঞাপন হতে পারে, সিলিংয়ের কোনো বিন্দু হতে পারে বা কারো চুল। যে বিষয় ঠিক করলেন পাঁচ মিনিট শুধু সে বিষয়বস্তুর ওপরই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ছাড়া বিশ্বে আর কিছু নেই। আপনার মন এদিক ওদিক চলে যেতে চাইবে। কিন্তু তা হতে দেবেন না। নির্ধারিত বস্তুতেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখুন। সময় পার হওয়ার পর আবার আশেপাশে তাকান, আরাম করুন।

২. এরপর যখন আপনি কোনো পত্রিকা বা সাময়িকী হাতে নেবেন, তখন লক্ষ করুন আপনি কী দেখছেন। লক্ষ করুন কোনো বিজ্ঞাপন, লেখা বা পৃষ্ঠার প্রতি আপনার চোখ আকৃষ্ট হচ্ছে। অন্য কোনোকিছুর প্রতি আপনার মনোযোগ সরিয়ে দিলে কেমন লাগে লক্ষ করুন।

৩. জটিল বিষয় পড়তে নিলেই মন সারা জাহানে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। কতবার মন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে তা নিরূপণের জন্যে নতুন একটা পদ্ধতি অবলম্বন করুন। যখনই আপনার মনে হলো- মন বই থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তখনই নির্দিষ্ট স্থানে বইয়ের মার্জিনে একটা টিকচিহ্ন দিন। যেখান থেকে মানসিক বিক্ষিপ্ততা এসেছিল, সেখান থেকে আবার পড়া শুরু করুন। পুরো পৃষ্ঠা পড়া হলে, যা এই মুহূর্তে পড়লেন তা মনে মনে পর্যালোচনা করুন। যদি বইয়ের মূল কথাগুলো মনে না পড়ে তাহলে আবার পৃষ্ঠার শুরুতে চলে আসুন এবং পুনরায় পড়ুন। আপনি যদি এই পদ্ধতিতে পড়া অব্যাহত রাখেন, তবে দেখবেন আপনার বোঝার ক্ষমতা বেড়ে গেছে এবং টিকচিহ্নের পরিমাণ কমে গেছে।

৪. ফলপ্রসূ টেনশন মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। আকাশ কুসুম কল্পনা করতে চাচ্ছেন না, কিন্তু এসে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শরীরকে এমন এক ভঙ্গিমায় নিয়ে যান, যা আপনি সাধারণত করেন না। উল্টোভাবে পায়ের ওপর পা তুলুন। পিঠ একটু সরান। চেহারায় একটা ভিন্ন ছাপ নিয়ে আসুন। অন্যের সাথে একই রুমে থাকলে অন্যের ভঙ্গিমা অনুকরণ করুন। শরীরকে সাধারণ ভঙ্গিমার চেয়ে ভিন্ন কোনো ভঙ্গিমায় নিয়ে গেলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতিরিক্ত এনার্জির প্রয়োজন হলে পেট ও পায়ের পেশি টানটান করুন। ঘুমঘুম ভাব আসা শরীরের জন্যে কঠিন করে তুলুন। মনকে সজাগ রাখার প্রক্রিয়াকে সহজ করে দিন।

৫. পরিচিত সবকিছু সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ান। বৃত্ত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেখবেন সব

জায়গায় বৃত্ত লাফালাফি করছে। কাপের গোড়া, পেন্সিলের মাথা, স্ক্রুর মাথা সব গোল, সবই বৃত্ত মনে হতে থাকবে। আপনি কোনোকিছু খোঁজার জন্যে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন, দেখবেন আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা পারছেন। শুধু আপনার জানতে হবে আপনি কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আপনি কীসের ওপর মনোযোগী তার ওপর নির্ভর করে আপনার চিন্তা কেমন হবে? সমস্যার ওপর মনোযোগ দিন, দেখবেন আপনার বিশ্ব পুরোপুরিই কণ্টকাকীর্ণ। কোনো বিশেষ কিছুর প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন না, আপনি দেখবেন আপনার বিশ্ব হয়ে উঠেছে পারস্পরিক সংযোগহীন বস্তুতে পরিপূর্ণ। সৃজনশীল ধারণার প্রতি মনোযোগী হোন, দেখবেন আপনার সামনে উন্মোচিত হয়েছে অসীম সম্ভাবনার দ্বার। আপনি তা-ই দেখতে পাবেন যা আপনি খুঁজছেন।

আপনার মনোযোগের প্রতি মনোযোগী হোন। মনোযোগ আপনার মনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। মাঝে মাঝেই অনুশীলনের মাধ্যমে মনোযোগকে আরো শক্তিশালী ও স্থিতিশীল হতে উৎসাহিত করুন।

অধ্যায়- ১৩

মনে রাখার কৌশল

জাদু দেখাচ্ছিলেন জুয়েল আইচ। মনে রাখার জাদু। একবার মাত্র শুনে গ্যালারিতে বসা শতাধিক দর্শকের নাম একের পর এক অবলীলায় বলে যাচ্ছিলেন তিনি। একেবারে নির্ভুল। শুধু নাম নয়, বংশ পদবীও নির্ভুলভাবে বলে যাচ্ছিলেন।

যাদের নাম বলে দিচ্ছিলেন, তাদের পক্ষেও অবাক হওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না। তারা মনে করেছেন এ হচ্ছে জাদু। এ ধরনের ঘটনা জুয়েল আইচের পক্ষেই সম্ভব। অসাধারণ স্মরণশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেই এভাবে নাম ও চেহারা মনে রাখা যায়।

একবার পড়ে বা শুনে মনে রাখা ও প্রয়োজনের সময় তা বলতে পারা নিঃসন্দেহে এক বিরাট গুণ। অনেকেই জন্মগতভাবে এ ধরনের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ১৫ শতকে শ্রী চৈতন্য। ১৮ শতকে পশ্চিমা ধ্রুপদ সঙ্গীতের রাজা মোজার্ট মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই একবার দেখে বা শুনে তা হুবহু পরিবেশন করে তাক লাগিয়ে দিতেন।

বিশ শতকে রাশিয়ায় শোরেশেভ্স্কি পরিচয় দিয়েছেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির। তিনি ১০, ১৫ বা তার চেয়ে বেশি অর্থহীন শব্দ, সংখ্যা বা দুর্বোধ্য গাণিতিক ফর্মুলা অনায়াসে মনের মধ্যে গেঁথে নিতে পারতেন। তার স্মৃতিশক্তি এত অসাধারণ ছিল যে, তিনি একবার যা মনের মধ্যে গেঁথে নিতেন, তা বহু বছর পরেও ঠিক পূর্ব নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে বলতে পারতেন।

১৯৬৭ সালে মাত্র সাড়ে চার বছর বয়সে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম উঙ ইয়ং স্মৃতিশক্তি প্রদর্শন করে সারা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিম নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও আরো তিনটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারত। প্রায় তিনশত শব্দ একবার শুনে মুখস্থ বলে দিতে পারত।

ভারতের শকুন্তলা দেবী শিশুবয়স থেকেই কম্পিউটারের মতো দ্রুতগতিতে যে-কোনো গণনা ও ক্যালকুলেশনের সমাধান করে দিতে পারতেন। তাই তিনি শুধু ভারত নয়, ইউরোপ-আমেরিকায়ও 'হিউম্যান কম্পিউটার' অভিধায় অভিহিত হয়েছেন।

জাতীয় কবি নজরুলও ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাই তার কাব্য ও গানে তিনি অবলীলায় মুসলিম ঐতিহ্য ও হিন্দু পুরাণ ও মিথের এত সার্থক প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

কিন্তু মনে রাখা কি শুধু জন্মগত প্রতিভার ব্যাপার? না কি এ শক্তি অর্জন করা যায়? এককথায় এর উত্তর হচ্ছে, অবশ্যই মনে রাখার শক্তি অর্জন করা যায়।

আইনস্টাইন, এডিসন, মাইকেল এঞ্জেলো, হোমার, বোপদেব গোস্বামী, স্যামুয়েল জনসন, জেনারেল জর্জ প্যাটন, ভাস্কর অগুস্ত রঁদা প্রমুখ মনীষীরা এ শক্তি জন্মসূত্রে পান নি, অর্জন করেছিলেন মাত্র।

গবেট (!) আইনস্টাইন

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। জার্মানিতে তার জন্ম। বাবা ইঞ্জিনিয়ার, মায়ের ছিল গানের দিকে ঝোঁক। মায়ের আগ্রহের ফলে আইনস্টাইনকে ছয় বছর বয়সেই বেহালা শিখতে হয়েছিল। অথচ স্মৃতিশক্তির অভাবে পড়া শুরু করতে করতেই তার ন' বছর বয়স পার হয়ে যায়। স্কুলে ভর্তি হন আরো পরে, তা-ও প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করে। দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় পাস করে ভর্তি হন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করতেও তাকে দুবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ডিগ্রি লাভের পর স্মৃতিশক্তির স্বল্পতার কারণে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে অস্বীকার করেন।

এরপর আইনস্টাইন স্কুলে চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও চাকরি হলো না। কারণ ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে কিছুতেই প্রশ্নের জবাব মনে আসে না-কিছুই মনে থাকে না।

এবার তিনি নিজেই নিজের স্মৃতিশক্তি নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অন্তর থেকে পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করলেন। উঠে পড়ে লাগলেন স্মৃতির পেছনে।

মাত্র দুবছরের চেষ্টায় স্মৃতিশক্তির অসাধারণ উন্নতি ঘটালেন। এরপরের ইতিহাস সবারই জানা। পরবর্তী ২০ বছরের মাথায় তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে লাভ করেন নোবেল পুরস্কার। স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায় কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমার ছেলেবেলা ও বর্তমানের মাঝে তুলনা করলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

বিশ শতকের সবচেয়ে প্রতিভাধর আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসন। বৈদ্যুতিক বাতি, গ্রামোফোনসহ ১২৫টি সামগ্রী উদ্ভাবন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এহেন এডিসনও ছিলেন ছেলেবেলায় স্বল্প স্মৃতিসম্পন্ন মোটা মাথার ছাত্র।

তার ভাষায়ই শুনুন, 'ছেলেবেলায় আমার কিছুই মনে থাকত না। ফলে স্কুল থেকে রিপোর্ট আসতে লাগল। মা চাইতেন আমি স্কুলে সেরা ছাত্র হই। কিন্তু পড়া কিছুই মনে থাকত না বলে কয়েক মাসেই আমার স্কুলজীবন সাঙ্গ হয়ে যায়। আমি যেদিন স্কুল ছেড়ে আসি সেদিন মায়ের চোখ থেকে টপ টপ অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। সে দৃশ্য মনে পড়লে আজও আমার কষ্ট লাগে। এখন আমি পাতার পর পাতা মুখস্থ রাখতে পারি। এই মনে রাখার ক্ষমতাটা যদি ছেলেবেলায় আমার থাকত!'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন যে-কোনো বক্তৃতা একবার শুনে হুবহু তা মনে গেঁথে রাখতে পারতেন। তাই যে- কোনো বিতর্কে পূর্ববর্তী বক্তার বক্তব্য আক্ষরিক মনে থাকায় সে বক্তব্য খণ্ডন করতে কোনো অসুবিধা হতো না। অথচ স্মৃতিশক্তির স্বল্পতার কারণে নয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বর্ণমালাই শিখে শেষ করতে পারেন নি। ভালোভাবে পড়া শিখতে লেগে গিয়েছিল আরো দুটি বছর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সফল মার্কিন সেনানায়ক জর্জ প্যাটনের ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। অথচ এই প্যাটনকেই ছেলেবেলায় স্মৃতিশক্তির স্বল্পতা ও অমনোযোগিতার জন্যে একই ক্লাসে পরপর তিন বার ফেল করার পর স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

ইডিয়ট (!) রদাঁ

বিখ্যাত ভাস্কর অগুস্ত রদাঁ। তার বাবা দুঃখ করে বলতেন, 'পুত্র বলতে পেয়েছি এক ইডিয়টকে'। রদাঁর স্মৃতিশক্তি এতই কম ছিল যে, স্কুলে শিক্ষকরা তাকে বলত 'ভুলো গবেট'। অথচ নিজের চেষ্টায় পরবর্তী জীবনে স্মৃতিশক্তির এত উন্নতি করেছিলেন যে, অতীতের বহু ঘটনা তিনি হুবহু বলে দিতে পারতেন।

বিখ্যাত ইটালীয় চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো বাল্যকালে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী জীবনে নিজের উদ্যমে স্মৃতিশক্তি বাড়িয়েছেন। শেষ বয়সেও প্রখর ছিল তার স্মৃতিশক্তি।

গ্রীক কবি হোমারের স্মৃতিশক্তি বাল্যকালে ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ভাগ্য বিপর্যয়ে প্রথমে ভবঘুরে এবং পরে অন্ধ হয়ে যান। অন্ধ হওয়ার পর এক চামড়ার দোকানে বসে শ্রোতাদের ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী আবৃত্তি করে শোনাতেন। পুরো কাহিনীই তিনি স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন। স্মৃতিতে ধরে রাখা কাহিনী থেকেই রচিত হয়, 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য।

ইংরেজি ভাষায় প্রথম অভিধান প্রণেতা ড. স্যামুয়েল জনসনেরও বাল্যকালে স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম 'লাইভস অব দি পোয়েটস' লিখেছিলেন ৭৫ বছর বয়সে। তিনি শুধু স্মৃতিশক্তি বাড়াতে নয়- ৭৮ বছর বয়স পর্যন্ত স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছিলেন।

গাধা (!) বোপদেব

পণ্ডিত বোপদেব গোস্বামী দ্বাদশ শতাব্দীতে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন ও শ্রুতিধর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অথচ বাল্যকালে পণ্ডিত মশাই তাকে ব্যাকরণের পড়া মনে রাখতে না পারায় টোল থেকে তাড়িয়ে দেন এবং বলেন, 'তোর মতো নিরেট গাধার কোনো স্থান আমার টোলে নেই। তুই আর টোলে পড়তে আসবি না।'

বালক বোপদেব টোল থেকে বিতাড়িত হয়ে মনের দুঃখে বাড়ি না গিয়ে নদীর ঘাটে বসে আছে। এ সময় সে

লক্ষ করল যে, মেয়েরা পানি ভর্তি করে কলসী নিয়ে ঘাটে উঠে বাঁধানো ঘাটের যে পাথরের ওপর কলসী রাখছে, সেখানে অনেকটা ক্ষয় হয়ে গর্তের মতো হয়ে গেছে।

বালকের মাথায় চিন্তা এলো মাটির কলসীর ঘষায় ঘষায় যদি কঠিন পাথর ক্ষয় হয়ে যেতে পারে, তবে আমি কেন ব্যাকরণ মুখস্থ করতে পারব না।

যেই কথা সেই কাজ। বাড়ি ফিরেই তিন দিন তিন রাত একাগ্রচিত্তে পড়ে ব্যাকরণ মুখস্থ করে কঠোর সংকল্প ও অধ্যবসায়ের এক অনবদ্য নজির স্থাপন করে ফেলল।

প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালি সম্পর্কেও চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। ছোটবেলায় তার স্মরণশক্তি একদম ছিল না বললেই চলে। তাই তিনি সবকিছুই তার খাতায় নোট করে নিয়ে বয়ে বেড়াতেন।

একবার মরুভূমিতে ডাকাত দলের পাল্লায় পড়ে তিনি তাদের কাছ থেকে সবকিছুর বিনিময়ে লেখার খাতাগুলো রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। ডাকাত দলের সর্দারের কাছে কথাটা কানে যেতে সে এতে বেশ মজা উপভোগ করে এবং জোর করে খাতাগুলো কেড়ে নেয়।

গাজ্জালি তখন ডাকাত দলের পেছনে পেছনে খাতার জন্যে ছুটতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, আমার সকল জ্ঞান তোমরা নিয়ে যেও না।

ডাকাত দলের সর্দার কৌতুক করে বলে ‘যে জ্ঞান ডাকাতে নিয়ে যেতে পারে, সে জ্ঞান দিয়ে কী হবে?’

গাজ্জালি এরপর আর কোনোদিন কোনোকিছু খাতায় নোট করেন নি। ক্রমান্বয়ে তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন। তার রচিত বিশাল বিশাল গ্রন্থই তার জ্ঞানের নিদর্শন।

শুধু কি খ্যাতিমানরাই স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে সফল হয়েছেন? না, একেবারে অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তিরাও তা করতে পেরেছেন। স্মৃতির জন্যে কি ভাষা বা অর্থ জানা জরুরি? না তা-ও নয়। ভাষা ও অর্থ না বুঝেও যে বিশাল গ্রন্থ মুখস্থ করে ফেলা যায়, তার প্রমাণ বাংলাদেশের বহু পরিবারেই রয়েছে। কোরআন শরীফের মতো বিশাল কিতাব কোনো অর্থ না বুঝে অবলীলায় মুখস্থ বলে যেতে পারেন এমন হাফেজের সংখ্যা নিঃসন্দেহে কয়েক হাজার হবে। আর এদের বেশিরভাগের মেধাগত মান সাধারণ পর্যায়ের।

মনে রাখার কৌশল

প্রতিভাবানদের মনে রাখার কি কোনো কৌশল আছে? অবশ্যই আছে। তাছাড়াও এজন্যে বিশেষভাবে প্রয়োজন আগ্রহ, মনোযোগ, অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস। আর কৌশল জনে জনে কিছুটা পৃথক হলেও মূল সুর যেন একই সূত্রে গাঁথা।

১৯৬৮ সালে মনস্তাত্ত্বিক আলেকজান্ডার লুরিয়া রাশিয়ান রিপোর্টার শোরেশেভ্স্কির অসাধারণ স্মরণশক্তির ওপর গবেষণা পরিচালনা করেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি তিনি অসম্ভব লম্বা তালিকা, সংখ্যা ও নাম মনে রাখতে পারতেন।

তার মনে রাখার পদ্ধতি ছিল চিত্রকল্প ও সংযোগ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাজারের তালিকা মনে রাখার জন্যে তিনি কল্পনা করতেন যে, তিনি গোর্কি স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং প্রতিটি আইটেমকে রাস্তার সুনির্দিষ্ট জায়গায় রাখতেন। যেমন তিনি ডিম রাখতেন লাইট পোস্টের নিচে, দুধ রাখতেন ঝর্নায়, মাখন রাখতেন গাছে। নাম মনে করার জন্যে তিনি পুনরায় কল্পনায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, চারপাশে তাকাতেন এবং যে আইটেমগুলো দেখতেন, তার নাম উচ্চারণ করতেন।

সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভাতিজা তৃতীয় নেপোলিয়ান গর্ব করে বলতেন, যার সাথে একবার আমার পরিচয় হয়, আমি তার নাম কখনো ভুলি না।

নাম মনে রাখার এক সহজ কৌশল রপ্ত করেছিলেন তিনি। কারো সাথে পরিচয়ের প্রথমেই তার নাম জেনে নিতেন। নাম ঠিকমতো শুনতে না পেলে বা বুঝতে না পারলে বলতেন, 'মাফ করবেন, আপনার নাম আরেকবার বলবেন।' প্রয়োজনে নিঃসঙ্কোচে নামের বানান জেনে নিতেন। নব্য পরিচিতদের সাথে কথা বলতে বলতে মনে মনে তার নাম কয়েকবার উচ্চারণ করতেন। নামের সাথে সাথে তিনি ভদ্রলোকের চেহারা, কথা বলার ধরন, গলার স্বর ইত্যাদি মনের মধ্যে গেঁথে ফেলতেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বেলায় নেপোলিয়ান আরো একটু কষ্ট করতেন। যখন তিনি একা থাকতেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির নাম একটি কাগজে লিখে রাখতেন। বার বার লেখা নামটি দেখতেন আর তার চেহারা ভিজুয়ালাইজ করতেন। নামটি যখন মনে একেবারে গেঁথে যেত, তারপর তিনি কাগজটি ছিঁড়ে ফেলতেন। তিনি কয়েক হাজার পরিচিত ব্যক্তির নাম মনে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিয়মিত অভ্যাস বা নাম মনে রাখার চর্চার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী শ্রী চৈতন্যের মনে রাখার কৌশল ছিল 'কান টানলে মাথা আসে'। শ্রী চৈতন্য তার টোলের ছাত্রদের বলতেন, স্মৃতিতে গেঁথে আছে এমন কোনো পুরনো তথ্যের সাথে নতুন তথ্যটি আটকে দাও। পুরনো তথ্যটা হচ্ছে কান আর নতুন তথ্যটা হচ্ছে মাথা। কানের সাথে মাথা আটকে দিলে কান টানলেই যেমন মাথা আসবে, তেমনি পুরনো তথ্য ধরে টানলেই নতুন তথ্যটি চলে আসবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটি হচ্ছে মেমোরি পেগ বা মেমোরি হুক।

এ সম্পর্কে আরো আলোচনার আগে স্মৃতি সম্পর্কে আরো কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য জেনে নিলে তা আমাদের উপকারে আসবে।

স্মৃতির স্তরভেদ

স্মৃতিকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। **১.** ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্মৃতি (Sensory register memory) **২.** স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি (Short-term memory) **৩.** দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long-term memory)|

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্মৃতি- আপনি যখন কোনোকিছু দেখেন, শোনেন বা অনুভব করেন, তখন তার একটা ক্ষীণ ও মুহূর্তকালীন রেশ থেকে যায়। চোখে দেখা ইমেজের স্থায়িত্ব হচ্ছে সবচেয়ে কম। শোনা ইমেজের স্থায়িত্ব এর চেয়ে একটু বেশি। আর ইন্দ্রিয় অনুভূত ইমেজের স্থায়িত্ব বেশ কয়েক সেকেন্ড। এই যে রেশ, এটাকেই বলা হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্মৃতি।

২. স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি- এবার কোনোকিছুর দিকে তাকান। সে জিনিসের নাম উচ্চারণ করে তার আকার আকৃতি মনে প্রেরণ করুন। এটাকে মনোবিজ্ঞানীরা স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি বলে অভিহিত করেন।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্মৃতি আর স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির তফাৎ হচ্ছে-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্মৃতি হলো স্বতঃস্ফূর্ত আর স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে ফোকাস করা যায়। আমাদের সচেতনতার সম্মুখভাগেই অবস্থান করে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি।

৩. দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি-এটি স্মৃতি প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় অংশ। এটি হচ্ছে তথ্যের স্থায়ী গুদাম ঘর। এতে অন্তর্ভূক্ত থাকে সকল পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি, যেমন আপনার বাইসাইকেল বা গাড়ি চালনার প্রথম দিন, আপনার বাসস্থানের তথ্য, আপনার ভাষা বা সংখ্যাজ্ঞান, আচার, চিন্তা-ভাবনা, আপনার জীবনবোধ বা মূল্যবোধ সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ছাড়া ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। সেই জন্যেই খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের বিশিষ্ট বাগ্মী সিসিরো বলেছিলেন, ‘স্মৃতি হচ্ছে সবকিছুর অভিভাবক ও জমাখানা।’

স্মৃতিতে প্রবেশের জন্যে এই তিনটি স্তর অতিক্রম প্রয়োজন। এই তিনটি স্তর অতিক্রম করা ছাড়া কোনোকিছুই দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে জমা হতে পারে না। যদিও বিশেষভাবে অর্থবহ ঘটনা বা আবেগের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা আপনাআপনি স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি থেকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে প্রবেশ করে, তবুও বেশিরভাগ অভিজ্ঞতাই দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়।

স্মৃতি বাড়াতে হলে কীভাবে তথ্য এক স্তর থেকে অন্য স্তরে প্রেরণ করতে হয় তা আপনাকে জানতে হবে। এজন্যে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, তথ্য স্মৃতি থেকে বের করার পদ্ধতির চেয়ে তথ্য স্মৃতিতে ঢোকানোর পদ্ধতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো শব্দ, নাম, সংখ্যা, কর্মতালিকা, বাজারের তালিকা মনে রাখতে হলে তথ্যগুলোকে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে গেঁথে ফেলতে হবে। আর তা করার অনেকগুলি পদ্ধতি রয়েছে। যত গভীরভাবে আপনি এই পদ্ধতি অনুসরণ করবেন বা তা নিয়ে চিন্তা করবেন। যতভাবে একটি তথ্যকে আপনি তালিকাভুক্ত করবেন, এর সাথে আপনি

মনকে যত জড়াবেন, তত সহজেই আপনি তা স্মরণ করতে পারবেন। যত বেশি পরিমাণে আপনি প্যাটার্ন, হুক বা আংটা, ইমেজ, সংযোগ এবং অর্থ বের করতে পারবেন, স্মৃতি তত সমৃদ্ধ হবে, মনে করা তত সহজ হবে।

কতটুকু মনে রাখবেন

দার্শনিক শোপেনহাওয়ার চমৎকারভাবে বলেছেন, কথাটা, 'একজন মানুষ সবকিছু মনে রাখবে এ প্রত্যাশা করা আর সে এ পর্যন্ত যা খেয়েছে তা পুরোটাই শরীর বহন করবে, তা প্রত্যাশা করার সমান।' তাই প্রথমেই এই ধারণা পাল্টে ফেলা দরকার যে, আমাকে সবকিছুই মনে রাখতে হবে।

আসলে আমাদের যা প্রয়োজন বা আমাদের কাছে যা প্রাসঙ্গিক তা মনে রাখার দিকেই আমাদের ঝোঁক। এ কারণেই একজন জ্যোতির্বিদ খুব সহজেই নক্ষত্রমণ্ডলকে শনাক্ত করতে পারেন, একজন ব্যাংকার খুব সহজেই আন্তর্জাতিক ব্যাংক রেট বা মুদ্রা বিনিময় হার বর্ণনা করতে পারেন, একজন রাঁধুনি খুব সহজেই যে-কোনো খাবারে মশলার অনুপাত বর্ণনা করতে পারেন, একজন ফ্যাশন ডিজাইনার সহজেই রঙের শেড মনে করতে পারেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্তার কাছে বিষয়বস্তু অর্থবহ। কারণ আমাদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা-ই আমরা স্মরণে রাখি। কোনোকিছু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিনা, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েও আমরা আমাদের স্মৃতিকে বাড়াতে পারি। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ বেশি দেবো। আর স্মরণ রাখার মোটিভেশন পাওয়া যাবে এখান থেকেই।

এটা সত্য যে, আমরা সবসময় আগে থেকে বুঝতে পারি না একটা বিষয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে অথবা তা মনে রাখার যোগ্য হবে কিনা। কিন্তু এই তথ্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে কিনা তা অনেক সময়ই আমরা অনায়াসে বিচার করতে পারি। নিম্নের তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে আপনি এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১. মনকে জিজ্ঞেস করুন- আমি যদি এটা মনে না রাখি তাহলে কী হবে? ভুলে গেলে কি কোনো ক্ষতি হবে? যদি কোনো ক্ষতি না হয়, যদি কোনো পার্থক্য না হয় তাহলে এটা মনে রাখার চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

২. মনকে জিজ্ঞেস করুন- কত তাড়াতাড়ি এই তথ্য আবার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে? যদি খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয়, তাহলে এর অবশ্যই একটা বড় ধরনের প্রভাব পড়বে।

৩. মনকে জিজ্ঞেস করুন- এই তথ্য স্মরণে রাখার ওপর কি অন্য কোনোকিছু নির্ভর করছে? একটি বিষয়ের আসল গুরুত্ব পরিমাপ করা যায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে এর আনুপাতিক মূল্য দিয়ে।

কোনোকিছু স্মরণযোগ্য কিনা, এই বিবেচনার প্রক্রিয়ায় আপনি বিষয়টির গুরুত্ব নির্ধারণ করতে পারবেন। যদি আপনি মনে করেন যে, কোনোকিছু আপনার জন্যে সত্যি গুরুত্বপূর্ণ, যদি এর কোনো আশু প্রভাব থাকে,

তাহলে অবশ্যই বিষয়টি থাকবে স্মরণ তালিকার শীর্ষে। কোনো তথ্যকে গুরুত্ব দিলে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাকে আরো মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করবে।

মনোযোগের অভ্যাস

স্মৃতিশক্তিকে চাঙ্গা রাখতে চাইলে গভীর মনোযোগ দেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা বাঞ্ছণীয়। উদাহরণস্বরূপ আপনি যখন আগামীবার ঘরের বা গাড়ির চাবি রাখবেন, এটা শুধু স্বভাববশতই রাখবেন না, চাবি রাখাটাকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করুন। চাবি কোথায় রাখলেন, ভালোভাবে খেয়াল করুন। টেবিলের ওপর রাখলে টেবিলটা ভালোভাবে দেখুন, টেবিলের উপরিভাগের মসৃণতা উপলব্ধি করুন। টেবিলে আর কী কী আছে, একবার ভালোভাবে নজর বোলান।

ড্রয়ারে রাখলে দেখুন না চাবিটা কীভাবে রয়েছে সেখানে। দলা পাকিয়ে না চমৎকারভাবে একটার পাশে আরেকটা শুয়ে। সেখানে আলো আছে না অন্ধকার। অন্য কোনোকিছুর সাথে লেগে আছে, না আলাদা রয়েছে। চোখ বন্ধ করে কল্পনায় চাবিগুলো দেখুন। হাত দিয়ে স্পর্শ করুন। কেমন অনুভব করছেন আপনি? গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করুন। ঠান্ডা না গরম দেখুন। আপনার সবগুলো ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগান। কোন তথ্য যে আপনার স্মৃতিকে খেই ধরিয়ে দেবে, আপনি তা জানেন না। প্রথমদিকে মনের ওপর এ ধরনের ছাপ নিতে কয়েক সেকেন্ড লাগবে। অভ্যাস হয়ে গেলে লাগবে এক মুহূর্ত।

একইভাবে কারো সাথে আলাপকালে আলাপের প্রতি মনোযোগ দিন। শোনা কথা ভুলে যাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, আমরা শোনার সময় শোনার ব্যাপারে আদৌ মনোযোগী হই না। হয় আমাদের মন অলসভাবে বিচরণ করতে থাকে অথবা নিজে যা বলতে চাই তার প্রতিই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকে।

ভালো শ্রোতা ও আলোচক হতে হলে অন্যের বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়া জরুরি। শব্দের প্রতি নয় বরং শব্দের মর্মার্থের ওপর পর্যাপ্ত মনোযোগ দিতে পারলেই ফলপ্রসূ আলোচনা হতে পারে।

নাম মনে রাখার উপায়

আপনি কোথায় কী রাখলেন বা কী কথা শুনলেন, তা মনে রাখার জন্যে যেমন স্মৃতি দক্ষতা (Skill of remembering) প্রয়োজন তেমনি একই ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন অন্যের নাম মনে রাখার জন্যে।

আপনি যার নাম মনে রাখতে চান, সবগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে তার প্রতি মনোযোগী হোন। তার নামের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করুন। নামের ধ্বনিটি কি কঠিন, যেমন সাদ্দাম, বিশ্বমিত্র, গ্রেগরী? না নামের ধ্বনিটি মিষ্টি যেমন শিরিন, হাসিনা, তানিয়া? নামটি কি একক অক্ষরবিশিষ্ট যেমন সামী, শমি, রুমী অথবা যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট যেমন

শম্পা, চম্পা, শম্ভুনাথ। নামের ধ্বনিটি কি প্রলম্বিত? যেমন বখতিয়ার, ইফতেখার, রেবতী মোহন, জেনিফার। না নামের ধ্বনি ছোট? যেমন কিম, ভিম? যখন আপনি তার নাম নিজে উচ্চারণ করবেন তখন খেয়াল করুন আপনার কণ্ঠ থেকে নামটি উচ্চারিত হয়ে কীভাবে ধ্বনি তুলছে।

নাম মনে রাখার জন্যে আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন নামটি তার ব্যক্তিত্বের সাথে কতটা খাপ খেয়েছে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা হয়েছে কিনা। নাম তার অভীক। দেখুন না তার চেহারায় নির্ভীকতার ছাপ কতখানি। নাকি তার চেহারায় কোনো ভীরু ভীরু গোবেচারা ভাব লুকিয়ে রয়েছে।

চেহারায় যদি নির্ভীকতার ছাপ থাকে তবে আপনি অনায়াসে মনে রাখার একটা সূত্র যোগ করতে পারেন। যেমন নামও অভীক আর চেহারাও নামের অর্থের মতোই নির্ভীক। আর যদি গোবেচারা ভাব থাকে তাহলেও একটা চমৎকার মনে রাখার সূত্র হতে পারে। যেমন নামেই অভীক কিন্তু একেবারে গোবেচারা।

নাম মনে রাখার জন্যে নাম শোনার সাথে সাথে পুরো অবয়বে নজর বুলিয়ে যান। শরীরের গড়ন কেমন, মোটাসোটা, নাদুসনুদুস, গাট্টাগোট্টা, বলিষ্ঠ না হালকা-পাতলা। লম্বা, বেঁটে না মাঝারি উচ্চতা। চেহারা কি প্রাণবন্ত না প্রাণহীন, চোখ কি তীক্ষ্ম না নিষ্প্রভ। ত্বক কি তৈলাক্ত না খসখসে, রুক্ষ না লাবণ্যময়। গায়ের রঙ কি ফর্সা, শ্যামলা না কালো। চেহারা বা শরীরের কোনোকিছু কি প্রথমেই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তার কণ্ঠস্বর কি মোটা, ভরাট, বলিষ্ঠ, মিষ্টি না ফ্যাসফ্যাসে। হাত মেলালে ত্বকের মসৃণত্ব সম্পর্কে ধারণা নিন। সে কি হালকাভাবে হাত মেলাল না বলিষ্ঠভাবে হাত মেলাল, খেয়াল করুন। কোনো পারফিউম বা আফটার শেভ লোশনের গন্ধ কি নাকে এসে লাগল!

তার পুরো ব্যক্তিত্বের যে ছাপ আপনার মনে এসে লাগল, তার সাথে তার নাম ও নামের ধ্বনিকে সংযুক্ত করে দিন। যেমন রেশমা, ফর্সা রেশমের মতো মসৃণ ত্বকের গোল মুখের হাস্যময় চেহারা চশমা পরিহিতা হালকা গড়নের মেয়ে। অথবা শম্পা ফর্সা লম্বা ডাগর চোখের রেশমী চুলের মেয়ে। ইফতেখার টাক মাথার তীক্ষ্ম চোখের নাদুস-নুদুস চেহারার শ্যামলা রঙের লম্বা ধ্বনিযুক্ত নামের আফটার শেভ লোশনের গন্ধযুক্ত ছেলে।

নতুন যে-কারো নামের সাথে আপনার পুরনো পরিচিত কোনো ব্যক্তির নামের মিল থাকলে আপনি চমৎকারভাবে মাথার সাথে কান লাগিয়ে দিতে পারেন। পরে যখনই নামটি মনে করার চেষ্টা করবেন তখন কান টানলেই মাথাটা চলে আসবে। যেমন ধরুন আপনার মামার নাম আব্বাস। তিনি তীক্ষ্ম নাকের সুন্দর চাপদাড়িযুক্ত সৌম্য চেহারার লম্বা গড়নের পুরুষ। নতুন একজনের সাথে পরিচয় হলো, তার নামও আব্বাস। নতুন আব্বাস মোটা বলিষ্ঠ গোলগাল চেহারার পাতলা গোঁফের কালো রঙের মিষ্টি আওয়াজের ছেলে। একই নামের দুজনের মধ্যে মিল-অমিল মনের পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখলে, প্রয়োজনে কান ধরে টান দিলেই মাথা আসবে।

নাম মনে রাখার সহজ পদ্ধতি নিম্নরূপ-

১. নাম মনোযোগ দিয়ে শুনুন

২. নামের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করুন

৩. নামের অর্থের সাথে চেহারার ব্যক্তিত্বের মিল/অমিল লক্ষ করুন

৪. হাত মেলালে ত্বকের স্পর্শের অনুভূতি লিপিবদ্ধ করুন

৫. শরীর বা চেহারার কোনো বিশেষত্ব শনাক্ত করুন

৬. বিশেষ কোনো গন্ধ বা অনুভূতির সাথে তার নাম শনাক্ত করা যায় কিনা দেখুন।

৭. পুরনো পরিচিত কারো নাম বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সাথে নতুন নাম ও তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় অর্থাৎ নতুন নামের 'মাথা'র সাথে পুরনো নামের 'কান' জুড়ে দিন। এরপর কান টানলে মাথা আসবে পদ্ধতিতে নতুন নাম মনে রাখা হবে সহজ।

কান টানলে মাথা আসে (Memory peg)

প্রতিভাবানরা সবসময়ই কোনোকিছু মনে রাখার জন্যে কোনো হুক, আংটা, খুঁটি, প্যাটার্ন, অর্থ, ছন্দ বা ভিন্নার্থ বের করার চেষ্টা করেন। আমরা ইতঃপূর্বে শোরেশেভ্স্কির অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পেছনে তার মনে রাখার বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ছোটবেলায় রঙধনুর সাতটি রঙের আনুক্রমিক বর্ণনা দেয়ার জন্যে শিক্ষক শিখিয়ে দিয়েছিলেন 'বেনীআসহকলা'। অর্থাৎ বেগুনি, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। প্রতিটি রঙের প্রথম অক্ষর যোগে সৃষ্টি হয়েছে 'বেনীআসহকলা'। ছোটবেলায় ইংরেজি মাসের কত দিনে কোন মাস তা মনে রাখার জন্যে ছড়া বলে দিয়েছিলেন শিক্ষক। যেমন-

৩০ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর
এইরূপ এপ্রিল, জুন আর নভেম্বর
২৮ দিনেতে সবে ফেব্রুয়ারি ধরে,
১ দিন বাড়ে তার চতুর্থ বছরে।
আর বাকি কয় মাস হয় ৩১ দিনে
ইংরেজি বছর সবে এইরূপে গুণে।

যে-কোনো ধরনের ছন্দ মনে রাখাকে করে সহজতর।

গ্রীক বাগ্মীরা বক্তৃতা মনে রাখার জন্যে বিশেষ টেকনিক অবলম্বন করতেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় লোসি। এই পদ্ধতি অনুসারে আপনি প্রথম আপনার পরিচিত পরিমণ্ডলের সবকিছুকে ভালোভাবে মুখস্থ করে ফেলুন। এই পরিমণ্ডল হতে পারে আপনার অতি পরিচিত রাস্তা, আপনার রান্নাঘর, আপনার শোয়ার ঘর, বৈঠকখানা বা

অফিসের চেম্বার। তারপর যা আপনি মনে রাখতে চান, তা এই মুখস্থ পরিমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখুন। প্রতিটি বস্তুকেই বড় বিদঘুটে অবয়ব দিন। অবয়ব যত বিদঘুটে হবে তত আপনার পক্ষে মনে রাখা সহজ হবে।

কোনো বিবরণ বা তালিকা মনে রাখার জন্যে পুরো বিষয়টিকে মজার কাহিনীতে রূপান্তরিত করুন। জাদু সম্রাট জুয়েল আইচ বাজারের তালিকায় রীতিমতো গল্প ফেঁদে মনে রাখার ব্যবস্থা করেন। যেমন ধরুন, বাজার থেকে চকলেট, চামচ, ডিম, নীল, কাগজ, কলম, দুধ আনতে বলা হলো। তিনি কীভাবে তালিকা মনে রাখবেন? তিনি রীতিমতো গল্প ফেঁদে ফেলবেন। যেমন, একজন লোক বাজারে যাচ্ছে। চকলেট খেতে খেতে মুখে চামচ ধরে তার ওপর ডিম বসিয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেল। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর ডাক্তার কলম দিয়ে কাগজে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। আর বললেন বেশি করে দুধ খেতে। বাজারের তালিকার সব জিনিসই আছে গল্পে।

যে-কোনো পরিবেশকেই গল্পে পরিণত করা যায়। যেমন ধরুন আপনি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গেছেন। সাজানো টেবিলের সবকিছুই মনে রাখতে চাচ্ছেন। ঠিক আছে, গল্প বানিয়ে ফেলুন। কাল্পনিক সংযোগ স্থাপন করুন একটার সাথে আরেকটার। যেমন নিমকদানি ডিনার প্লেটের ওপর পড়ে ঘুরতে ঘুরতে কাঁটাচামচ ও ছুরিকে ধাক্কা দিয়ে বাধ্য করল ফুলদানিকে ঠেলা দিতে। ফুলদানির চারটি গোলাপ গিয়ে পড়ল সসের বাটিতে, ফুলদানি ধাক্কা দিল পানির গ্লাসকে, গ্লাস গিয়ে পড়ল সুপের বাটির ওপর আর পানি ছিটকে ভিজিয়ে দিল পরনের শার্টকে। ন্যাপকিন দিয়ে মুছতে হলো শার্ট। এ ধরনের গল্প মনে থাকে সহজে।

আবার যে-কোনো তথ্য বা বক্তৃতাকেও মনে রাখার জন্যে তাকে চিত্রকল্পে রূপান্তরিত করতে পারেন। যেমন আপনি ব্যবসায়িক লাভ সম্পর্কে বলতে চাচ্ছেন। আপনি একটি ব্যবসায়িক গ্রাফ ভিজুয়ালাইজ করতে পারেন। পণ্য বিতরণ করতে চাইলে ট্রাক বা ভ্যানগাড়ি কল্পনা করুন। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চাইলে একটা সুন্দর চেয়ার উল্টে দিন। যখন আপনি তথ্যগুলো স্মরণ রাখতে চাইবেন, শুধুমাত্র চিত্রকল্পগুলো স্মরণ করুন। সবকিছুই মনে এসে যাবে।

মনে রাখার জন্যে আপনার কিছু নিজস্ব মেমোরি পেগ (Memory peg) থাকতে পারে। সেগুলো হচ্ছে 'কান'। এগুলোর সাথে নতুন নতুন মাথা যোগ করে দিলেই হলো।

মনের রাখার চারটি উপায়-

১. যা মনে রাখতে চান শুধু তার প্রতিই মনোযোগ দিন। সবকিছু মনে রাখার চেষ্টা করবেন না। শুধু যা কাজে লাগবে তা মনে রাখার জন্যে নির্বাচিত করুন।

২. যা মনে রাখতে চান, তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামোয় রূপান্তরিত করুন। আংশিক না করে বিষয়টি পুরোপুরি শিখতে বা বুঝতে চেষ্টা করুন। অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতার প্রতি নজর দিন।

৩. হুক, আংটা বা কিউ ব্যবহার করুন। 'কান' ও 'মাথার' সংযোগ ঘটান। চিত্রকল্প তৈরি ও যোগসূত্র স্থাপন করুন। ধারণাকে গল্প বা ছন্দের রূপ দিন। তাহলে তথ্যটি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে গেঁথে যাবে। ভালোভাবে মনে রাখার জন্যে নিজস্ব টেকনিক প্রয়োগ করুন।

৪. মাঝে মাঝেই স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিন। মাঝে মাঝেই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন অতীতের কী কী বিষয় আপনি মনে রাখতে চান, কী কী বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। জিজ্ঞেস করুন নিজেকে গতকাল ও আজ কী কী শিখেছেন, যা আগামীকাল আপনি মনে করতে চান।

অনুশীলনী

মনে করতে পারবেন কি?

১. আপনি ১০ মিনিট আগে কী চিন্তা করেছিলেন?

২. আপনি ৩০ মিনিট আগে কী করেছিলেন?

৩. আপনি ২ ঘণ্টা আগে কী ভাবছিলেন?

৪. আপনি গতকাল এ সময়ে কী করেছেন?

৫. গতকাল রাতে কী কী খাবার খেয়েছিলেন?

৬. গত ৭ দিন ধরে কী দিয়ে নাস্তা করেছেন?

৭. গত শুক্রবার ছুটির দিনে কী কী করেছেন?

কী কী মনে পড়ে?

১. ছোটবেলার কোন কোন ঘটনা আপনি মনে করতে পারেন?

২. কোন ঘটনা স্মৃতির পাতায় সবসময় জ্বলজ্বল করে?

৩. আবছা আবছা মনে পড়ে এমন ঘটনা কী কী?

৪. স্কুলের কোন স্মৃতি এখনো অম্লান?

৫. ভয়াল কোন স্মৃতি কি আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে?

৬. কোন ধরনের ঘটনা সহজে মনে রাখতে পারেন?

৭. কোন ধরনের ঘটনা সহজে ভুলে যান?

গল্পচিত্র

১. বাজার থেকে কালি, কলম, খাতা, চাল, ডাল, পেঁয়াজ, মরিচ আদা ইত্যাদি কিনতে হবে। গল্পচিত্র তৈরি করুন।

২. বর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে বরের বাড়ি এসে পারিপার্শ্বিকতা যা দেখলেন তার বিবরণ মনে রাখার জন্যে চিত্র-গল্প তৈরি করুন।

প্রতিজ্ঞা

১. কোনোদিন ভুলে যাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এমন কথা মনে করুন।

২. অবশ্যই করবেন বলে কাউকে দেয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন।

মনে করার চেষ্টা করুন

১. রাতে শোয়ার সময় সারাদিনের ঘটনা ও কার্যাবলি ভিজুয়ালাইজ করুন। সকালে জেগে ওঠার পর থেকে বিছানায় আসার মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি দৃশ্যের ছবি দেখুন। ভিজুয়ালাইজ করুন একটি গোপন ক্যামেরায় আপনার সারাদিনের কাজ চিত্রায়িত করলে কেমন দেখাত?

২. এবার গোপন ক্যামেরায় ছবি তুললে আজকের দিনের ঘটনাবলি কেমন দেখাত, তার পরিবর্তে নিজের চোখে আপনি কী দেখেছেন তা ভিজুয়ালাইজ করুন।

৩. সারাদিনে আপনি কী কী শুনেছেন, তা মনে করুন। সারাদিনে যা যা গন্ধ পেয়েছেন, যে যে স্বাদ পেয়েছেন, যা যা স্পর্শের অনুভূতি লাভ করেছেন, তা মনে করুন।

সময় : মহাকাল

চিন্তা ও কল্পনা আমাদের মানসিক জীবনে প্রাসঙ্গিকভাবে অনুভূতি সৃষ্টি করে। স্মৃতি মনে হয় আমাদের পশ্চাতে বসে আছে। আমরা এখন বর্তমান থেকে অতীতে ফিরে তাকাই এবং সময় যে এগিয়ে যাচ্ছে, তা অনুভব করতে পারি। প্রত্যাশা ও পরিকল্পনা বর্তমান থেকে সম্মুখ দিকে অবস্থিত। আমরা মানসিকভাবে সামনের দিকে তাকাই, যেন আমরা সেই গন্তব্যের পথে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু এই অনুভূতি আমাদের অভিজ্ঞতাকে সূচিভুক্ত করার একটা প্রয়াস মাত্র। আমাদের সকল অভিজ্ঞতাই সংঘটিত হচ্ছে বর্তমান মুহূর্তে। ভবিষ্যৎ ঘটনার সাথে

বা অতীতের ঘটনার সাথে যুক্ত আমাদের প্রতিটি চিন্তাই আমরা বর্তমান সময়েই উপলব্ধি করে থাকি। সময় ও চিন্তার এটি একটি দুর্বোধ্য দিক।

মেডিটেশন : মহাকাল

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির ড্রইংরুমে যান।

২. এবার আপনি আপনার চিন্তার প্রতি মনোযোগ দিন। চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন না। শুধু কী চিন্তা করছেন সেদিকে খেয়াল রাখুন। দেখবেন কিছু চিন্তা আসছে অতীতের, কিছু বর্তমানের, কিছু চিন্তা আসছে ভবিষ্যৎ নিয়ে ...

৩. এবার চিন্তাকে বিশ্লেষণ করুন... এর কতটুকু অতীত রোমন্থন, কতটুকু ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কতটুকু বর্তমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। আপনার চিন্তার গতিধারা কেমন লক্ষ করুন, তা কি অতীতমুখী না ভবিষ্যতকেন্দ্রিক।

৪. এবার তাকান ভবিষ্যতের দিকে। পাঁচ বছর ভবিষ্যতে নিজেকে দেখুন অর্থাৎ পাঁচ বছর পর নিজেকে যেভাবে দেখতে চান সেভাবে কল্পনা করুন। লক্ষ করুন চিন্তার গতি... আপনি যেন সামনের দিকে চলছেন... এবার নিজেকে পাঁচ বছর অতীতে নিয়ে যান। পাঁচ বছর আগের নিজেকে দেখুন... অবলোকন করুন আপনি বর্তমান থেকে পেছন দিকে দেখছেন... এবার পাঁচ বছর অতীত থেকে নিজেকে দেখুন... দেখুন আপনি যেন পেছন থেকে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন... এবার পাঁচ বছর ভবিষ্যতে নিজেকে নিয়ে যান... ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানকে অবলোকন করুন... দেখুন আপনি সামনে থেকে পেছন দিকে তাকিয়ে আছেন... আপনার এই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ দেখার মধ্যে এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি করুন, যেন আপনি কোথাও যাচ্ছেন... যেমন আপনি অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন বা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে যাচ্ছেন...। এইভাবে নিজেকে ভবিষ্যতে অবলোকন করুন... সেখান থেকে পেছনের দিকে তাকিয়ে যেন বর্তমানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। একইভাবে নিজেকে অতীতে নিমগ্ন দেখুন... যেন অতীতে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বর্তমানকে পর্যবেক্ষণ করছেন। ... এবার বর্তমান কাল সম্পর্কিত অনুভূতি আপনার কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছে লক্ষ করুন...।

৫. নিয়মমতো পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

অধ্যায়-১৪

কোয়ান্টা সংকেত

কথিত আছে, অলৌকিক শক্তি বলে দরবেশ ও ঋষিরা সব অসাধ্য সাধন করতেন। ইসম বা মন্ত্র উচ্চারণ করতেন আর জাদুর মতো সব ঘটনা ঘটে যেত। আর তাই দেখে দর্শক ও ভক্তরা সব ভক্তি গদগদভাবে সাধককে সাধুবাদ করতেন। সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার হয়ে যেত চারদিকে।

শিষ্যত্ব গ্রহণ বা মুরিদ হওয়া বা কৃপা লাভের জন্যে দলে দলে লোক এসে ভিড় করত সাধুর আশেপাশে। যার অলৌকিক ক্ষমতার কথা যত বেশি প্রচার হতো, তার চারপাশে ভিড় হতো তত বেশি। তাদের অলৌকিক ক্ষমতার কতটুকু বাস্তব আর কতটুকু কল্পনা আর কতটুকু ভক্তদের বাড়াবাড়ি তা বিচার করা এখন অসম্ভব।

তবে একটা কথা সত্য, যে-কোনো দরবেশ বা ঋষি মন্ত্রোচ্চারণের আগে বছরের পর বছর মন্ত্র বা ইসম জপ করতেন বা জিকির করতেন। কে কী মন্ত্র বা ইসম জপ করতেন, তা জানা না গেলেও জানা যায় যে, এই মন্ত্র, ইসম বা ধ্বনিগুলোকে তারা সৃষ্টির আদি ধ্বনি বলে মনে করতেন।

দরবেশদের এই ইসমগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘আল্লাহ’, ‘ইয়া হু’, ‘ইয়া হক’সহ নানা জিকির। ঋষিদের মন্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘ওম’সহ নানা জপ মন্ত্র। খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের রয়েছে ‘আমেন’। জাপানি বুদ্ধদের ‘নামো আমিদা বাৎসু’ প্রভৃতি মন্ত্র।

পাশ্চাত্যে ধর্মহীন ধ্যানীরা অবশ্য পুরোপুরি ধর্ম নিরপেক্ষ ধ্বনি যেমন ‘শান্তি’, ‘প্রেম’, ‘ওয়ান’, ‘পেন’ বা কোনো অর্থহীন ধ্বনিকেও মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। দরবেশ-ঋষিরা সাধনায় যেমন লক্ষ লক্ষবার তাদের মন্ত্র জপ করতেন, তেমনি এই বিশেষ ধর্মবহির্ভূত ধ্যানীরা নিজেদের পছন্দমতো কোনো শব্দ লক্ষ লক্ষ বার উচ্চারণ করেন।

তাদের বিশ্বাস এইভাবে অগণিতবার উচ্চারণের ফলে এই ধ্বনি এমন একটা মনোদৈহিক স্পন্দন সৃষ্টিতে সহায়ক হয় যা একজন মানুষকে মুহূর্তে তার মনোদৈহিক সামর্থ্য ও শক্তি পুরোপুরি একাগ্রভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম করে। মন ও দেহ চলে যায় শক্তির স্তরে। ব্যক্তিমন ও চেতনা সংযুক্ত হয় মহাচেতনা বা কসমিক কনশাসনেসের সাথে।

তখন অর্জিত হয় দৃশ্যমান সবকিছুর পেছনে প্রকৃতির যে নেপথ্য স্পন্দন ও নিয়ম ক্রিয়াশীল তাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। আপাতদৃষ্টিতে জটিল অবস্থাও সহজ হয়ে যায়। সমস্যার কোনো একটা স্বতঃস্ফূর্ত সমাধান

বেরিয়ে আসে। সমস্যা সমাধানের জন্যে যে মনোদৈহিক অবস্থার প্রয়োজন তা সৃষ্টি হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তিত হয়ে উত্তরণ ঘটে নতুন স্তরে।

যারা মার্শাল আর্টের চর্চা করেন, তারা শক্তি প্রয়োগ করার আগেও ধ্বনি উচ্চারণ করেন। আপনি দেখবেন হাতের এক রদ্দা দিয়ে আঘাত করে ৮/১০টা ইট বা পাথরের স্ল্যাব ভেঙে ফেলার আগে তিনি একটু পাঁয়তারা করেন, মনোযোগকে একাগ্র করার পর 'কুই...' ধ্বনি উচ্চারণ এবং হাত দিয়ে আঘাত করেন। ধ্বনি উচ্চারণ ও আঘাতে একটা সমন্বিত স্পন্দন সৃষ্টি করেন। আর সাথে সাথে অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায়। দেহ-মনের শক্তি হাতে সমন্বিত হয়। সাধারণভাবে আঘাত করলে যেখানে হাত থেতলানোর কথা, সেখানে ইট বা পাথর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এ বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এক ধরনের কনডিশন্ড রিফ্লেক্স (Conditioned reflex) হিসেবে।

কনডিশন্ড রিফ্লেক্স সম্পর্কে আমরা জানি প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ইভান পাভলভের কুকুর নিয়ে গবেষণার কথা। বিজ্ঞানী পাভলভের গবেষণা ছিল নিম্নরূপ-

গবেষণাগারে পাভলভ কুকুরকে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দিতেন। খাবার দেয়ার সাথে সাথে কুকুরের মুখে লালা বের হতে শুরু করত। খাবার এবং মুখের লালার সাথে রয়েছে এক অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। এরপর কুকুরকে খাবার দেয়ার সময় ঘণ্টাধ্বনি বাজানো হতো। অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনি বাজানোর সাথে সাথে খাবার দেয়া হতো। আর কুকুরের মুখের লালা পড়তে শুরু করত।

এভাবে কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। অর্থাৎ প্রতিবারই ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে খাবার দেয়া হতো। খাবার দেয়ার সাথে সাথে কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃসরণ হতো।

এরপর একদিন শুধু ঘণ্টা বাজানো হলো, কিন্তু কোনো খাবার দেয়া হলো না। দেখা গেল, কুকুরের মুখের লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসরণ হচ্ছে। একবার দুবার নয়, যতবারই ঘণ্টা বাজানো হয়, খাবার না দিলেও ঘণ্টাধ্বনির সাথে সাথে মুখের লালাগ্রন্থি কাজ শুরু করে দেয়। এজন্যে খাবার দেয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না।

অর্থাৎ কুকুরের মস্তিষ্ক ও লালা গ্রন্থি ঘণ্টাধ্বনির সাথে খাবারকে এক করে ফেলেছে। ঘণ্টাধ্বনি ও খাবারের ধারণা এক হয়ে যাওয়ায় খাবার ছাড়াও শুধুমাত্র ঘণ্টাধ্বনিতেই মুখের লালা চলে আসছে। অর্থাৎ সামনে খাবার না আসা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ঘণ্টাধ্বনিই কুকুরের লালাগ্রন্থি সচল করে দিয়েছে। কারণ ঘণ্টাধ্বনির সাথেই খাবারের স্মৃতি কুকুরের মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

তাই ঘণ্টাধ্বনির সাথে লালা নিঃসরণের কোনো বাস্তব কারণ না থাকলেও কিছুদিনের অভ্যাসের ফলে এটি

তার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এটিই পাভলভের বিখ্যাত 'কনডিশন্ড' রিফ্লেক্স মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারে দুধরনের উদ্দীপকের সাথে কোনো অবস্থাকে (Response) যুক্ত করলে, পরে আসল উদ্দীপককে সরিয়ে নিলেও নকল উদ্দীপকের প্রভাবে একই অবস্থার সৃষ্টি হবে। এর ব্যাখ্যায় আমরা বলতে পারি, কোনো ধ্বনি বা ভঙ্গির সাথে কোনো একটা বিশেষ কাজ বা অবস্থাকে যদি বার বার সম্পৃক্ত করা যায়, তাহলে আপাত স্বভাব বা নিয়ম বহির্ভূত হলেও একটি অবস্থার সাথে অপর অবস্থার যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

শুধু মুখের লালার ক্ষেত্রে নয়, প্রাণীর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও (Immune system) এ ধরনের কনডিশন্ড রিফ্লেক্স দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের গবেষক ড. হার্বার্ট স্পেকটর একদল মূষিকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে টি-সেলকে তৎপর করে তুলতে পলি-আইসি নামে পরিচিত রাসায়নিক ইনজেকশন দেন।

যখনই মূষিকদের পলি-আই-সি ইনজেকশন দেয়া হতো, সে সময় সেখানে কর্পূরের গন্ধও ছাড়া হতো। একই সময়ে পলি-আইসি ইনজেকশন দেয়া ও কর্পূরের গন্ধ ছাড়া কয়েক সপ্তাহ অব্যাহত রাখা হয়। তারপর পলি-আইসি ইনজেকশন না দিয়ে শুধুমাত্র কর্পূরের গন্ধ ছাড়া হয়।

ড. স্পেকটর অবাক বিস্ময়ে দেখেন যে, মূষিকের রক্তের টি-সেল কাউন্ট বেড়ে গেছে। অন্য কথায় বলা যায়, কনডিশনিং করার ফলে শুধুমাত্র গন্ধই মূষিকের টি-সেল কাউন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। এজন্যে কেমিক্যালসের প্রয়োজন হয় নি। গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু কর্পূরের গন্ধ নয়-গোলাপের গন্ধ বা গানের সুর বা যে-কোনো কিছুর সাথেই ইমিউন ব্যবস্থাকে কনডিশনিং করা যায়। ফলাফল একই কনডিশন্ড রিফ্লেক্সের মতো।

কোয়ান্টা ধ্বনি ও ভঙ্গির উপকারিতা

কনডিশন্ড রিফ্লেক্সের এই বৈজ্ঞানিক ধারণাকে আমরা আমাদের মনোদৈহিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারি। এই কনডিশন্ড রিফ্লেক্স পদ্ধতি অনুসরণে আপনার কোনো ধ্বনি হয়ে যেতে পারে ইসম বা মন্ত্র, কোনো ভঙ্গি কাজ করতে পারে জাদুর মতো।

এজন্যে প্রয়োজন ক্রমাগত সচেতন প্রচেষ্টা। দরবেশ ও ঋষিরা যেমন মন্ত্র বা ইসম এবং অভয় মুদ্রা বা জ্ঞানমুদ্রাকে ব্যবহার করেছেন, আপনিও ব্যবহার করতে পারেন কোয়ান্টা ধ্বনি এবং কোয়ান্টা ভঙ্গি। আপনি মহামতি বুদ্ধসহ প্রাচীন ঋষিদের যে ভাস্কর্য দেখতে পান, তার বেশিরভাগই অভয় মুদ্রা বা জ্ঞান মুদ্রা করে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসা। অভয় মুদ্রা বা জ্ঞান মুদ্রা কনডিশন্ড রিফ্লেক্সেরই প্রাচীন প্রয়োগ।

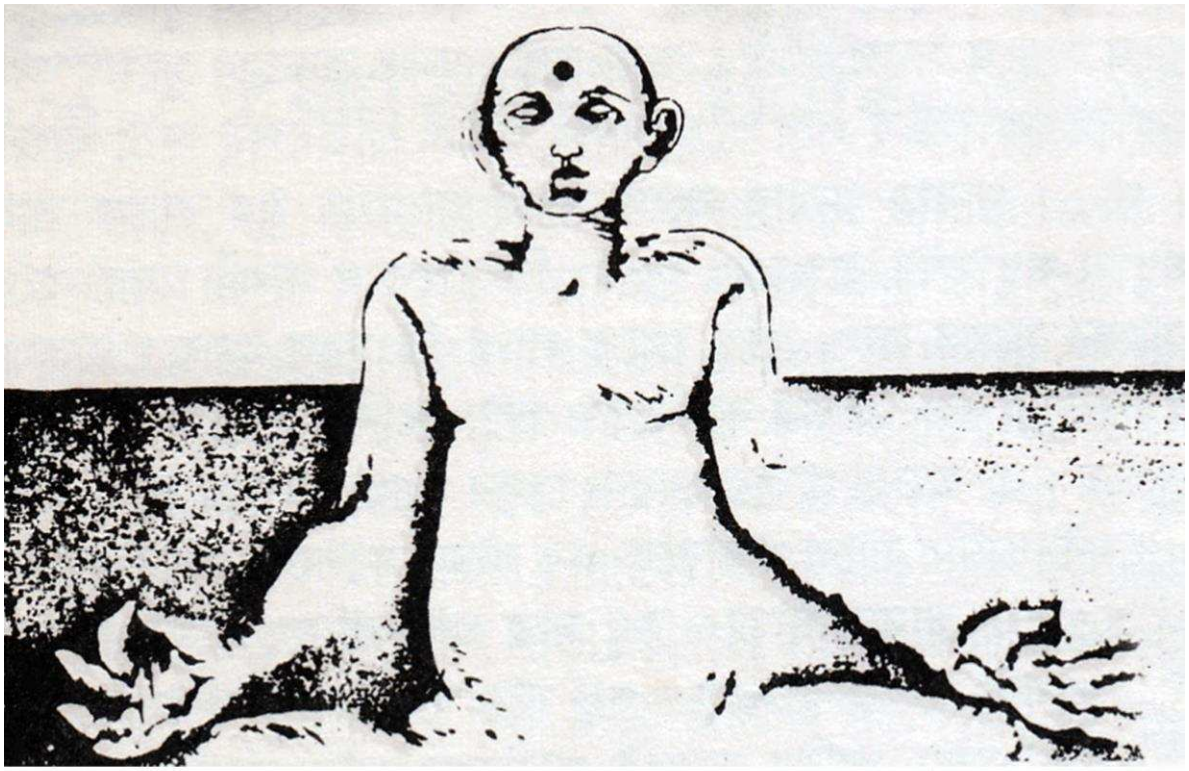

মহেঞ্জোদারো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত মূর্তির
প্রতিকৃতিঃ অভয়মুদ্রারত ধ্যানী

মহামতি বুদ্ধের জীবনের একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কথিত আছে যে, বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধিতাকারীরা বুদ্ধকে কৌশলে হত্যা করার জন্যে বুদ্ধ যে পথে যাতায়াত করতেন সে পথে এক পাগলা হাতিকে ছেড়ে দেয়।

পাগলা হাতি বুদ্ধের দিকে ছুটে আসতে থাকে। হাতিকে মদমত্ত অবস্থায় আসতে দেখে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বুদ্ধ হাত উঁচিয়ে অভয় মুদ্রা করেন। হাতি আস্তে আস্তে বুদ্ধের সামনে এসে বসে পড়ে। বুদ্ধ হাতির মাথায় হাত বুলিয়ে তার গন্তব্যে যাত্রা করেন। জ্ঞানমুদ্রা বা অভয় মুদ্রার আধুনিক নামই কোয়ান্টা ভঙ্গি।

প্রশ্ন করতে পারেন- কোয়ান্টা ভঙ্গি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর সমন্বয়ে শুধুমাত্র ২ আঙুলে করতে হবে কেন, এটা তো তিন আঙুল বা চার আঙুল মিশিয়ে করা যেতে পারে। প্রাচীন ঋষি দরবেশরা কেন দুই আঙুলে করেছেন।

এর পুরোপুরি ব্যাখ্যা প্রায় বিস্মৃতির অতলে অপসৃত। কিন্তু এর জ্যোতিষ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমাদের জানা। আমরা জানি, হাতের বুড়ো আঙুলের ক্ষেত্র হচ্ছে শুক্র বা ভেনাসের ক্ষেত্র। তর্জনীর ক্ষেত্র হচ্ছে বৃহস্পতির ক্ষেত্র। জ্যোতিষ বিজ্ঞানে শুক্র ও বৃহস্পতি এ দুটো গ্রহই প্রবৃদ্ধি, কল্যাণ ও সাফল্যের প্রতীকরূপে গণ্য। আর মধ্যমার ক্ষেত্র শনির ক্ষেত্র রূপে বিবেচিত। আর শনি বিলম্ব ও বাধার প্রতীক। প্রাচীন সাধকরা এ কারণেই

ভেনাস ও জুপিটারের প্রবৃদ্ধিকেই সংযুক্ত করেছেন। এর সাথে শনির প্রভাবকে যুক্ত করতে চান নি। অতীতের সাধকরা কোয়ান্টা ভঙ্গি দুই আঙুলেই করেছেন। আর অধুনা সফল ব্যক্তিরাও সঙ্কট উত্তরণে এভাবেই কোয়ান্টা ভঙ্গি করছেন। (প্রেসিডেন্ট ইয়েলেৎসিনের ছবি দেখুন)

প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন

কোয়ান্টা ভঙ্গি বা সংকেতের আরেকটি মজার দিক আছে। আপনি ডান হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে হাত সামনে আনুন। ভালো করে দেখুন হাতে কিছু দেখছেন কি না । খেয়াল করলে দেখবেন হাতে আরবী 'আলিফ' 'লাম' ও 'হে' অর্থাৎ আল্লাহু হয়ে আছে। অর্থাৎ কোয়ান্টা ভঙ্গি করার সাথে সাথে আপনি প্রকারান্তরে স্রষ্টাকে স্মরণ করছেন। তার আন্তরিক স্মরণ যে-কোনো সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট।

আপনি জানেন মেডিটেশন লেভেলে আপনার মন সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে, তাই আপনি যদি মুহূর্তে মেডিটেশন লেভেলে চলে যেতে পারেন, তাহলে আপনি নিজে সঙ্কট উত্তরণে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। আর দ্বিতীয়ত মেডিটেশন লেভেলে যেহেতু মহাচেতনার সাথে আপনার ব্যক্তি চেতনার যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়, আপনি যেহেতু প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যান, সেহেতু আপনার ব্যক্তি সমস্যাও তখন পরিণত হয় প্রকৃতির সমস্যারূপে। সমস্যা সমাধানে মহাচেতনার সহযোগিতার পথও হয় উন্মুক্ত। তাই একটু সচেতন প্রচেষ্টা চালালেই আপনি মনে মনে কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ এবং কোয়ান্টা ভঙ্গি করা মাত্রই মেডিটেশন লেভেলে পৌঁছে যেতে এবং পরিকল্পিত কাজকে সহজতর করতে পারেন।

মেডিটেশন : কোয়ান্টা সংকেত

কোয়ান্টা ধ্বনি ও ভঙ্গি প্রয়োগের পদ্ধতি খুবই সহজ। এজন্যে প্রয়োজন শুধু গভীর অনুশীলন। এই অনুশীলন পদ্ধতি নিম্নরূপ-

১. প্রথমত আরাম, আরাম, আরাম বলে এবং ১৯ থেকে ০ গণনা করে মনের বাড়িতে যান। ড্রইংরুমে আরাম করে বসুন।

২. এবার মনে মনে বলুন, ভবিষ্যতে নিজের বা মানবতার যে-কোনো প্রয়োজন বা সঙ্কট মোকাবেলায় আমি জোরে জোরে বা মনে মনে কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করব অথবা কোয়ান্টা ভঙ্গি করব। কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ বা সংকেত প্রদান করার সাথে সাথে আমি মেডিটেশন লেভেলে পৌঁছে যাব, মহাচেতনার সাথে যুক্ত হবো এবং সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে মুহূর্তে সঠিক ও সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতিকে সফলভাবে মোকাবেলা করব। এই কোয়ান্টা স্পন্দন বা সংকেত দ্বারা নিজের ক্ষুধা, রাগ, ক্রোধকে অনায়াসে দমন করব। দ্রুত পড়ার জন্যে বা ক্লাসে পড়া মনে রাখার জন্যে আমি কোয়ান্টা সংকেতসহ যা-ই পড়ব, প্রয়োজনের সময় তা হুবহু মনে করব। কোয়ান্টা সংকেতসহ আমি বাম হাতে কোয়ান্টাভঙ্গিতে আলিফ লাম হে যা-ই পড়ব পরীক্ষার হলে বা ভাইভা বোর্ডের সামনে তা পুরোপুরি সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে লিখতে বা বলতে পারব।

[কোয়ান্টা ভঙ্গি দুহাতেই করা যেতে পারে। বা শুধু ডান বা বাম হাতে করা যেতে পারে। বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর অগ্রভাগ স্পর্শ করলে এবং অন্য তিনটি আঙুল স্বাভাবিক রাখলেই কোয়ান্টা ভঙ্গি সম্পন্ন হয়।]

৩. উপরিউক্ত কথাগুলো বলার পর বাস্তবে বাম হাতে বা ডান হাতে বা উভয় হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করুন।

৪. মনের বাড়িতে আরো কিছু কাজ থাকলে সেগুলো সম্পন্ন করার পর যথানিয়মে অর্থাৎ ০ থেকে ৭ গুণে বাহ্যিক সচেতন অবস্থায় ফিরে আসুন।

৫. পরপর ৪০ দিন দুবেলা এভাবে অনুশীলন অব্যাহত রাখুন। তাহলে কনডিশন্ড রিফ্লেক্স সম্পন্ন হবে। প্রয়োজনে এই অনুশীলন অব্যাহত রেখে রিফ্লেক্সকে আরো জোরদার করুন। তাহলে একটা সময় আসবে যখন

প্রয়োজনে কোয়ান্টা ভঙ্গি করার সাথে সাথে আপনি মেডিটেশন লেভেলে চলে যেতে পারবেন। আর বিশেষ পরিস্থিতিতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করতে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে আপনি শুধুমাত্র মনে মনে কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করলেই মেডিটেশন লেভেলে পৌঁছে যাবেন এবং ঠান্ডা মাথায় প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

কোয়ান্টা ধ্বনি বা ভঙ্গির ফলপ্রসূ প্রয়োগের জন্যে-

১. প্রথমে মনের বাড়িতে যান।

২. নিজেকে বলুন, আমি অমুক জায়গায় বা অমুক কাজে বা অমুকের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। আমি সেখানে গিয়ে যে-ই মনে মনে কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করব বা কোয়ান্টা ভঙ্গি করব, সাথে সাথে আমি মেডিটেশন লেভেলে পৌঁছে যাব এবং ঠান্ডা মাথায় তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

[অথবা বলুন... কোয়ান্টা ভঙ্গি করার সাথে সাথে মেডিটেশন লেভেলে পৌঁছে যাব... অমুককে প্রভাবিত করা সহজ হবে ... অমুকের আনুকূল্য সহজে পাব বা দেখা করার সময় নিজের বুদ্ধিমত্তা সর্বোত্তম অবস্থায় থাকবে... সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করব...]

৩. নিয়মমাফিক জেগে উঠুন। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে কোয়ান্টা ভঙ্গি করা মাত্রই মনের ইতিবাচক আবহ সৃষ্টি হবে।

কোয়ান্টা ধ্বনি ও ভঙ্গি নিয়মিত অভ্যাস করে আপনি আপনার ও মানবতার কল্যাণে অনায়াসে প্রয়োগ করতে পারেন। এজন্যে দরবেশ বা ঋষি হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোয়ান্টা সংকেত যে-কোনো জরুরি অবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করা যায়।

সতর্কবাণী

১. কোয়ান্টা ধ্বনি ও সংকেত সবসময় জরুরি অবস্থায়ই প্রয়োগ করবেন। কোনো খেয়ালিপনা চরিতার্থ করার জন্যে করবেন না।

২. আপনি লাভবান হবেন, কিন্তু যিনি কাজটি করছেন, তার ক্ষতি হবে, এমন কোনো কাজে কোয়ান্টা ধ্বনি বা সংকেত কার্যকরী হবে না। ধ্বনি বা সংকেতকে শুধুমাত্র সামগ্রিক কল্যাণেই কাজে লাগানো যাবে। (যে-কোনো ধ্বনিকে আপনি মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। আর কোয়ান্টা ধ্বনি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র বা ইসম চর্চাকারীর কণ্ঠ থেকে গ্রহণ করলে বেশি ফলপ্রসূ হয়।)

কোয়ান্টা সংকেত প্রয়োগ করে

১. রাগ নিয়ন্ত্রণ

আপনি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন যে, আপনি বুঝতে পারছেন আপনি রেগে যাচ্ছেন অথবা কেউ আপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে রাগাতে চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে একটা লম্বা দম নিন। মনে মনে তিনবার কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করুন বা যে-কোনো হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করুন। কোয়ান্টা ভঙ্গি সবসময় হাত উঁচুতে তুলে করার কোনো প্রয়োজন নেই। অবস্থার প্রেক্ষিতে হাত যে-কোনো জায়গায় রেখে কোয়ান্টা ভঙ্গি করা যেতে পারে। আপনি যে কোয়ান্টা ভঙ্গি করছেন এটা অন্য কাউকে দেখানোরও কোনো প্রয়োজন নেই।

এরপর মনকে জিজ্ঞেস করুন, মন! এখন আমি কী করব? দেখবেন খুব ঠান্ডা মাথায় আপনি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারছেন। মুহূর্তে শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে এটি একটি চমৎকার নিশ্চিত প্রক্রিয়া।

২. ভয় দূর করার জন্যে

অহেতুক ও অযৌক্তিকভাবে কোনোকিছুকে ভয় পাচ্ছেন। কোয়ান্টা ভঙ্গি করুন বা মনে মনে তিনবার কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করুন। দেখবেন ভয় চলে গেছে। ভেতরে আপনি সাহস অনুভব করছেন।

৩. অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যে

বাসায় ফিরতে দেরি হচ্ছে। বুঝতে পারছেন বাসায় গেলেই তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাবে। আপনি যদি অন্যায়ভাবে দেরি করে থাকেন, তাহলে প্রথম মনে মনে অনুশোচনা করুন। তারপর মনে মনে বলুন, আমি বাসায় যাচ্ছি শান্তির জন্যে। সবকিছু প্রশান্ত দেখতে চাই। মনে মনে তিনবার কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করুন। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে বাসায় প্রবেশ করুন। দেখবেন খুব শান্তভাবেই সবকিছু সামলে নিতে পারছেন।

৪. আলোচনা-লেনদেন

ব্যবসা বা যে-কোনো চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় অপর পক্ষ অযৌক্তিক কথাবার্তা বা বিষয় নিয়ে আসছে। আপনি উত্তেজিত না হয়ে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে শান্তভাবে আলোচনা চালিয়ে যান, দেখবেন ধীরে ধীরে অন্য পক্ষ যুক্তির মধ্যে চলে আসছে।

৫. ইন্টারভিউ বা ভাইভা বোর্ড

ইন্টারভিউ বা ভাইভা পরীক্ষা দেয়ার জন্যে যাবেন। নার্ভাস অনুভব করছেন। মনে মনে তিনবার কোয়ান্টা ধ্বনি

করে বাম হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে (বাম হাত স্বাভাবিক অবস্থায় কোমরের পাশে ঝুলে থাকবে। শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী সংযুক্ত করলেই কোয়ান্টা ভঙ্গি হয়ে গেল।) ডান হাতে সালাম দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করুন। আপনার ভেতরে এক প্রত্যয় সৃষ্টি হবে। আপনি সহজেই বোর্ডকে ইমপ্রেস করতে পারবেন। সহজেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।

৬. পড়া মনে রাখার জন্যে

যে-কোনো কঠিন বিষয় পড়ার আগে নিয়মমতো মনের বাড়ির ড্রইংরুমে যান। অটোসাজেশন দিন যে-আমি এখন কোয়ান্টা ভঙ্গি করে এই বইয়ের এই অধ্যায় পড়ব। যা পড়ব সব আমার মনে থাকবে। যখনই আমার প্রয়োজন হবে তখনই আমি তা বলতে ও লিখতে পারব। এরপর চোখ মেলে বাম হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি ধরে রেখে পড়তে থাকুন।

পড়া শেষ হলে আবার মনের বাড়িতে গিয়ে অটোসাজেশন দিন যে, কোয়ান্টা ভঙ্গি করে এতক্ষণ যা পড়লাম, সব আমার মনে থাকবে। যখনই প্রয়োজন তা আমি বলতে বা লিখতে পারব। এই নিয়মে পড়াশোনা করলে পড়া মনে রাখা ও পড়া বোঝা খুব সহজ। এছাড়া কোয়ান্টা ভঙ্গি করে শিক্ষকের লেকচার শুনলে তা বেশি মনে থাকে।

অধ্যায়- ১৫

জাগৃতি ও ঘুম

চেতনার দুইটি পরিপূরক মাত্রা হচ্ছে জাগৃতি ও ঘুম। একটি ছাড়া অন্যটি হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন বোঝা। একটি ছাড়া অন্যটিকে উপলব্ধি বা অনুভব করা অসম্ভব। জাগৃতি ও ঘুমের মধ্যে যখন একটা সুন্দর ছন্দ থাকে, যদি আপনি ইচ্ছেমতো ঘুমাতে ও ইচ্ছেমতো জাগতে পারেন, তখনই জাগৃতি ও ঘুমের আনন্দ আপনার পক্ষে পুরোপুরি অনুভব করা সম্ভব। আর এ অনুভব থেকে আমরা বেশিরভাগই বঞ্চিত।

যেমন কেউ ঘুমোতে চাচ্ছেন, কিন্তু ঘুমোতে পারছেন না। বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করছেন। আবার কারো সমস্যা অতিরিক্ত ঘুম। জেগে উঠতে চাচ্ছেন, কিন্তু চোখ কিছুতেই মেলতে পারছেন না। বিছানায় একবার উঠে বসছেন আবার বালিশে মাথা এলিয়ে দিচ্ছেন। ঠিকমতো ঘুম থেকে জেগে উঠতে না পারার কারণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন অনেকে।

অনেকে আবার জাগৃতি ও ঘুমকে মিশিয়ে ফেলেন। অর্থাৎ তারা জাগেনও না, ঘুমানও না, তারা অকারণে ঝিমান। কোয়ান্টাম টেকনিক প্রয়োগ করে এ অবস্থা থেকে আপনি অনায়াসে বের হয়ে আসতে পারেন। এ টেকনিক প্রয়োগ করলে আপনি ইচ্ছামতো ঘুমাতে, ইচ্ছামতো জাগতে এবং জেগে থাকতে পারবেন।

মূল টেকনিক আলোচনার আগে জাগৃতি ও ঘুমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ওপর কিছু আলোকপাত পুরো বিষয়টি অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক হবে। আমরা কেন জেগে থাকি, কেন ঘুমাই এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যুগান্তর সৃষ্টি করেন জার্মান বিজ্ঞানী হ্যান্স বার্জার ১৯২৯ সালে। তিনি আবিষ্কার করেন যে, শক্তিশালী এমপ্লিফায়ার পাওয়া গেলে খুলির ওপর দিয়ে ব্রেনে প্রবাহিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ মাপা যাবে। আমরা আজকে ইইজি (EEG=Electroencephalogram) বলে যা জানি, তার সূত্রপাত ওখান থেকেই।

ব্রেনে ঘুম ও জাগৃতি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এ ব্যাপারে ইটালীয় বিজ্ঞানী গিয়াসিপ্পে মোরাজ্জি এবং ফরাসী বিজ্ঞানী মিশেল জোভেট গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তারা দেখিয়েছেন যে, মেডুলা ও মিড-ব্রেনের মাঝখানে রয়েছে আমাদের ওয়েকিং সেন্টার বা জাগৃতি কেন্দ্র।

জাগৃতি কেন্দ্র যখন কাজ করে তখন আমরা জেগে থাকি। আর এ কেন্দ্রটি যখন কাজ বন্ধ করে দেয়, তখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। জাগৃতি কেন্দ্রের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় হরমোন সংকেত দ্বারা। আর এই হরমোন নিঃসরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় শরীর-মনের অবস্থা দ্বারা। শরীর মনের অবস্থা অনুসারে হরমোনের মাত্রা কমতে কমতে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় এলে জাগৃতি কেন্দ্র কাজ বন্ধ করে দেয়, ফলে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

আমরা আগেই বলেছি- ঘুম ও জাগৃতি পরস্পরের পরিপূরক চেতনার মাত্রা। জাগৃতির মতো ঘুমানোও একটা সৃজনশীল কাজ।

ড. এলান হবসন ঘুমের এই সৃজনশীল মাত্রাকে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন ঘুম সংক্রান্ত এ পর্যন্ত প্রকাশিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'দি ড্রিমিং ব্রেন'-এ। তিনি ঘুমের গুরুত্ব ও সৃজনশীলতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত ৮টি পয়েন্ট উল্লেখ করে বইয়ের উপসংহার টেনেছেন-

১. নিরীক্ষায় দেখা গেছে, ঘুমের সময় অধিকাংশ ব্রেন সেলই বিশ্রাম নেয় না। শুধুমাত্র ব্রেন স্টেমের এমিনার্জিক নিউরোনই (Aminergic neurons) বিশ্রাম নেয়। এই এমিনার্জিক নিউরোন মনোযোগ ও স্মৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. এমিনার্জিক নিউরোন যখন বিশ্রাম নেয়, তখন সেনসরি মটর নিউরোন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ব্রেনের বিভিন্ন সার্কিটের সক্রিয় রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম চালুর কর্মসূচি প্রদান করে।

৩. এই সক্রিয় রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি উন্নয়নের জন্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে শুধু সুষ্ঠু কার্যক্রমের ধারাবাহিকতাই রক্ষিত হয় না, বরং কাজ করার সামর্থ্যও পরিবর্তিত হয়।

৪. ঘুম-বিশেষত রেম ঘুম-সীমিত জেনেটিক প্রোগ্রামকে আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মধারা উন্নয়নের কার্যকরী প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করার উপকরণ সরবরাহ করে।

৫. রেম ঘুম কালে ব্রেনের অতি সক্রিয় অবস্থা বিবেচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, শিক্ষা প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ (যেমন স্মৃতি সংরক্ষণ এবং পুরনো ও নতুন তথ্যের তুলনা ও সমন্বয় সাধন) সম্পন্ন হয় ঘুমের মধ্যে।

৬. এই ধারণাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যেয়ে আমরা বলতে পারি যে, ঘুমের মাঝে ব্রেন অত্যন্ত সৃজনশীল থাকে। ঘুমের মাঝে সচেতন বা অচেতনভাবে আমরা পুরনো সমস্যার নতুন সমাধান পেয়ে থাকি এবং নতুন ধ্যান-ধারণারও সূত্রপাত হয়।

৭. যেহেতু ঘুমের মাঝেই স্বপ্নের জন্ম হয় এবং তার একটা অংশ আমাদের আনন্দ দিতে পারে, তাই আমরা স্বপ্নের এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারি।

৮. স্বপ্ন এবং রেম ঘুমের সাথে এর সম্পর্ক আমাদের ভেতরের সত্তার দর্পণ হিসেবে চমৎকার কাজ করতে পারে।

ঘুমের স্তর

বিজ্ঞানীরা ঘুমকে বিভক্ত করেছেন দুইটি শ্রেণিতে। রেম ঘুম (Rem sleep) এবং ননরেম ঘুম (Non-rem sleep) হিসেবে। ঘুমের জন্যে ব্রেনে এখনো কোনো আলাদা কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয় নি। জাগৃতি কেন্দ্র থেকেই ঘুম

নিয়ন্ত্রিত হয়। মনে করা হয়, নন-রেম ঘুম নিয়ন্ত্রিত হয় জাগৃতি কেন্দ্রের র‍্যাফ নিউক্লিয়াস থেকে। আর র‍্যাফ নিউক্লিয়াসের তৎপরতা পরিচালিত হয় সেরোটনিন হরমোন দ্বারা। আর রেম ঘুম নিয়ন্ত্রিত হয় লোকাস মেরুলিয়াস দ্বারা। লোকাস মেরুলিয়াসের কার্যক্রম পরিচালিত হয় নর-এড্রিনালিন হরমোন দ্বারা।

ননরেম ঘুম দিয়ে ঘুমানোর কাজ শুরু হয়। ৯০ মিনিটের একটা ঘুমচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। সারা রাতে চার থেকে ছয়বার এই চক্র কাজ করে। ৯০ মিনিটের এই চক্রে ১০-২০ মিনিট বরাদ্দ থাকে রেম ঘুমের জন্যে। ঘুমের প্রথম দিকে নন রেম ঘুম বেশি হয়। পরে রেম ঘুম বেশি।

ঘুমানোর সময় যত বাড়তে থাকে রেম ঘুমের পরিমাণ তত বাড়তে থাকে। রেম ঘুম আসলে হালকা ঘুম, এসময় চোখ নড়ে আমরা স্বপ্ন দেখি। বিজ্ঞানীরা ঘুমের গভীরতা অনুসারে নন রেম ঘুমকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। আর ঘুমের শতকরা ৭৫ ভাগই নন রেম ঘুম। ঘুমের স্তর-

স্তর-১ জাগৃতি

স্তর-২ হালকা ঘুম

স্তর-৩ গভীর ঘুম

স্তর-৪ ডেল্টা লেভেলে ঘুম

কতক্ষণ ঘুমানো দরকার

ঘুম আসলে একটি শারীরিক অভ্যাস। তাই ঘুমের পরিমাণও জনে জনে আলাদা। কেউ দুই ঘণ্টা ঘুমিয়েও সারাদিন চমৎকার কাজ করতে পারেন। আবার কারো ১০ ঘণ্টা ঘুমিয়েও তৃপ্তি নেই। দিনে যখনই সময় পান একটু ঘুমিয়ে নেন। এর কারণ জেনেটিক কোডও হতে পারে। জিনবৈশিষ্ট্য দিয়েও বংশানুক্রমিক অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ঘুমও প্রভাবিত হতে পারে।

ডাক্তাররা মনে করেন সাধারণভাবে ৪-৭ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট হওয়া উচিত। আর যারা মেডিটেশন করেন তারা চার ঘণ্টা ঘুমিয়েই পূর্ণ তৃপ্তির সাথে জাগতে এবং সারাদিন ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করতে সক্ষম।

অনিদ্রা

যারা অনায়াসে গভীর নিদ্রায় ডুবে যেতে পারেন এবং পরিতৃপ্তির সাথে তরতাজা অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠতে পারেন, তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। আর যারা বিছানায় এপাশ ওপাশ করে রাত কাটান তারা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগা। যাদের স্বাভাবিক ঘুম আসে না, তাদের বেশিরভাগই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করেন।

কিন্তু এটা আসল সমস্যার কোনো সমাধান নয়। কারণ স্নায়ুর ওপর ঘুমের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা বাদ

দিলেও বলা যায় যে, ঘুমের ওষুধ খেয়ে ননরেম ঘুমের গভীর ঘুম (ডেল্টা লেভেল ঘুম। ৩ ও ৪ স্তরের ঘুম) হয় না। ফলে ঘুমানোর পর শরীরে যে তরতাজা ভাব আসা উচিত তা আসে না। তাই ঘুমের ওষুধ খেয়ে যারা ঘুমান তাদের মধ্যে এক ধরনের ক্লান্তি সবসময় কাজ করে।

কেন ঘুম আসে না? এর কারণকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, ব্রেনের জাগৃতি কেন্দ্রকে পরিচালিত করে যে হরমোন তার নিঃসরণ মাত্রা হ্রাস না পাওয়া। হরমোন নিঃসরণ অব্যাহত রয়েছে, জাগৃতি কেন্দ্র সক্রিয় রয়েছে, আপনি জেগে থাকছেন। ঘুমানোর ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘুম আসছে না।

আরেকভাবে বলা যায়, ব্রেন কাজ করতে চাচ্ছে, আপনি ঘুমাতে চাইছেন। আর এই দ্বন্দ্বে ব্রেনের জাগৃতি কেন্দ্রই জয়ী হচ্ছে। কী করবেন তাহলে?

এর জবাব লেখা আলিফ লায়লায়, সেই আলাদীনের গল্পে। গল্পে আছে আলাদীন যখন চেরাগ ঘষে দৈত্যকে নিয়ে আসে, তখন দৈত্য শর্ত দিয়েছিল, তাকে সারাক্ষণ কাজ দিতে হবে। কাজ দিতে না পারলে সে আলাদীনের ঘাড় মটকাবে। আলাদীন তাকে যে কাজ দেয়, দৈত্য তা সাথে সাথে সম্পন্ন করে। আলাদীন পড়ল মহা ফাঁপড়ে। এখন উপায়! দৌড়ে সে মায়ের কাছে গেল। মা তাকে বুদ্ধি বলে দিলেন। একটা কুকুর হাতে দিয়ে বললেন, দৈত্যকে বলো এই কুকুরের লেজ সোজা করে দিতে, কিন্তু লেজ যেন না ভাঙে।

তারপরের ঘটনা আপনি জানেন। দৈত্য আলাদীনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। অনিদ্রার দৈত্যকেও আপনি ইচ্ছা করলে এভাবে বশে আনতে পারেন অনায়াসে। ব্রেনকে এমন কাজ দেন যা অর্থহীন বোরিং, সমাপ্ত হওয়ার মতো নয়। দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে আসবে। হরমোন নিঃসরণ কমে যাওয়ায় জাগৃতি কেন্দ্র অচল হয়ে যাবে। আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। মনোবিজ্ঞানীরা সারা বিশ্বে এখন ওষুধের পরিবর্তে অনিদ্রার দৈত্যকে এই প্রক্রিয়ায় বশ করছেন। আপনিও প্রয়োজনে তা করতে পারেন।

মেডিটেশন : আয় ঘুম আয়

'আয় ঘুম আয়' টেকনিক প্রয়োগের মাধ্যমে কোনোরকম ওষুধ বা ড্রাগ ব্যবহার না করেই আপনি গভীর তৃপ্তিদায়ক নিদ্রায় নিমগ্ন হতে পারেন। আপনি বিছানায় যাওয়ার আগে হাত পা ধুয়ে নিন, চোখে মুখে ঠান্ডা পানির ঝাপ্টা দিন। এরপর বিছানায় চিৎ হয়ে শোন। দুহাত শরীরের দুপাশে থাকবে। পাতলা বালিশ ব্যবহার করুন।

১. এবার নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ির ড্রইংরুমে গিয়ে বসুন।

২. মনে মনে ২/৩ বার প্রত্যয়ন করুন-আমি এখন পূর্ণ তৃপ্তির সাথে ঘুমাতে চাই। আমি এই গভীর ও তৃপ্তিদায়ক নিদ্রা আনয়নের পরীক্ষিত ও দ্রুত কার্যকর 'আয় ঘুম আয়' টেকনিক প্রয়োগ করব। আমি দ্রুত

গভীর ও তৃপ্তিদায়ক নিদ্রায় নিমগ্ন হবো।

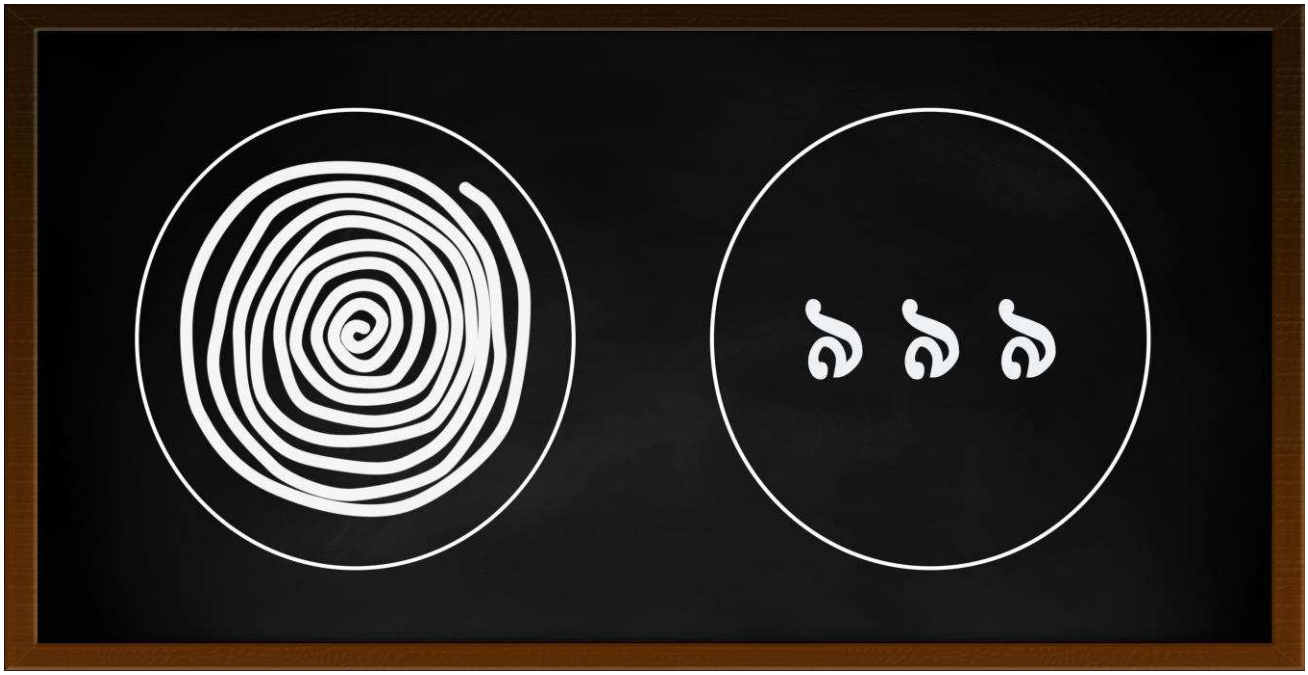

৩. এবার মনের বাড়ির ড্রইংরুমে অবস্থিত ব্ল্যাক বোর্ডে সাদা চক দিয়ে পাশাপাশি দুইটি বৃত্ত আঁকুন।

৪. এবার ছাই রঙের চক নিন। ছাই রঙের চক দিয়ে প্রথমে বামের বৃত্তের ভেতরটা পুরোপুরি সতর্কতার সাথে এমনভাবে পূর্ণ করুন যেন ছাই রঙের চক বৃত্তের সাদা দাগকে স্পর্শ না করে।

৫. এবার ডানের বৃত্তে ছাই রঙের চক দিয়ে লিখুন ৯৯৯।

৬. এরপর ডাস্টার দিয়ে বামের বৃত্তের ভেতরের ছাই রঙের অংশ মুছে ফেলে আবার ছাই রঙের চক দিয়ে পূর্বের মতো পরিপূর্ণ করুন। বামের বৃত্ত ছাই রঙে পূর্বের মতো পরিপূর্ণ হলে ডানের বৃত্তে লেখা ৯৯৯ মুছে লিখুন ৯৯৮।

৭. পূর্বের প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন। বৃত্ত ছাই রঙে ভরা এবং মোছা এবং পুনরায় ভরার সাথে সাথে ডানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নামতে থাকবে। আর আপনিও গভীর ঘুমে নিমগ্ন হবেন।

ঠিক সময়ে ওঠা

অনেকের ঘুম হয় কিন্তু ঠিক সময়ে উঠতে পারেন না। আপনি যখনই ঘুম থেকে উঠতে চান না কেন আপনি সঠিক সময়ে ঘুম থেকে ওঠার পরীক্ষিত পদ্ধতি ‘জাগরণী টেকনিক’ প্রয়োগ করতে পারেন।

১. বিছানায় শুয়ে নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ির ড্রইংরুমে গিয়ে বসুন। সেখানে দেয়ালে টাঙানো ঘড়িতে ঠিক যখন ঘুম থেকে উঠতে চান সেভাবে মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটাকে সাজিয়ে রাখুন। ধরুন আপনি ৪:৪৫

মিনিটে উঠতে চান। আপনি ঘণ্টার কাঁটাকে ঘড়ির ৫ সংখ্যার কাছাকাছি এবং মিনিটের কাঁটাকে ৯ সংখ্যার ওপরে রাখুন। ঘড়ির এই দৃশ্যকে ভিজুয়ালাইজ করুন এবং মনে মনে কয়েকবার প্রত্যয়ন করুন আমি ৪:৪৫ মিনিটে ঘুম থেকে উঠব। (যারা ডিজিটাল ঘড়িতে অভ্যস্ত তারা একইভাবে ডিজিটাল ঘড়িতে ৪:৪৫ মিনিট দেখুন এবং মনে মনে উক্ত কথাগুলো বলুন।)

২. এরপর প্রয়োজনে আয় ঘুম আয় টেকনিক প্রয়োগ করে ঘুমিয়ে পড়ুন।
ঠিক নির্ধারিত সময়েই আপনার ঘুম ভেঙে যাবে। আপনার ঘুম ভাঙার জন্যে বাস্তবে ঘড়িতে এলার্ম দেয়া বা কারো ডাকার প্রয়োজন হবে না।

যা ঘুম যা

ঘুম ভাঙার পরও যদি বিছানা ছেড়ে উঠতে মন না চায় বা উঠি উঠি করে আবার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে, তাহলে এই যা ঘুম যা টেকনিক প্রয়োগ করুন। ঘুম ঘুম ভাব নিয়েই বিছানায় একেবারে চিৎ হয়ে শোন। এবার লম্বা দম নিন। মুখ বন্ধ রাখুন। যতদূর সম্ভব লম্বা দম নেয়ার পর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে নাক চেপে ধরুন। মুখ আগের মতোই বন্ধ আছে।

আর নাক চেপে ধরার ফলে আপনি আর নিঃশ্বাস ছাড়তে পারবেন না। ফলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইবে। আর তখনই আপনার ব্রেন সর্বত্র সংকেত পাঠাবে, 'ফাইট অর ফ্লাইট'। শরীরের প্রতিটি স্নায়ু ও পেশি মুহূর্তে সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

যখন দেখবেন যে দম আর বন্ধ রাখা যাচ্ছে না, তখন নাক ছেড়ে দিন। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হয়ে যাবে। আর আপনি দেখবেন ঘুম আলস্য কোথায় পালিয়ে গেছে। কয়েকদিন এই টেকনিক প্রয়োগ করার পর দেখবেন যে, বাস্তবে এই টেকনিক প্রয়োগ করতে হচ্ছে না। ঘুম ভাঙার পর টেকনিকের কথা স্মরণ করতেই ঘুম-আলস্য দুই-ই পালাচ্ছে। আর আপনি ঘুম ভাঙার সাথে সাথে বিছানা ছেড়ে উঠে স্বচ্ছন্দে দিনের কাজ শুরু করতে পারছেন।

মুহূর্তে সজাগ

এ তো গেল ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠার টেকনিক। কিন্তু ঝিমানো বা ঘুম ঘুম ভাব দুর করার উপায়? উপায় অবশ্যই আছে। আর সেজন্যে আপনার ইচ্ছাই যথেষ্ট। এ প্রক্রিয়ায় আপনি সহজেই ভ্রমণে বা গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে ঘুম ঘুম ভাব দূর করতে পারবেন।

১. নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ির ড্রইংরুমে গিয়ে বসুন।

২. মনে মনে প্রত্যয়ন করুন, আমার একটু ঝিমুনি এসেছিল, ঘুম ঘুম ভাব সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু এখন আমি মনের বাড়িতে এসে প্রশান্ত ও ক্লান্তিমুক্ত। আমার ঘুম ঘুম ভাব পুরোপুরি চলে গেছে এবং বেশ তরতাজা অনুভব করছি। ০ থেকে ৭ গণনা করে যখনই পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় পৌঁছব তখনই আমি পূর্ণ সজাগ, সদা প্রস্তুত ও তরতাজা অনুভব করব এবং ... (সময়ের উল্লেখ করুন) এতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ সজাগ থাকব।

৩. এরপর নিয়মমাফিক ০ থেকে ৭ গুণে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় চলে আসুন। দেখবেন ফুরফুরে তরতাজা অনুভব করছেন।

অধ্যায়-১৬

স্বপ্ন : সৃজনশীল প্রয়োগ

স্বপ্ন চেতনার তৃতীয় মাত্রা। স্বপ্নে চেতনা স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা অতিক্রম করে অনায়াসে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে সেখানে কিছু থাকে না, সবকিছুই অনুভূত হয় বর্তমান রূপে। সচেতনের সাথে যোগাযোগের জন্যে অচেতন ও অবচেতন প্রায়শই স্বপ্নকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। স্বপ্নের মাধ্যমে অচেতন ও অবচেতনের কাছ থেকে আমরা পুরনো সমস্যার সমাধান পেয়ে থাকি, নতুন ধ্যান-ধারণারও সূত্রপাত হয়।

আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি। প্রতি রাতেই স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখা ছাড়া সুস্থ জীবন সম্ভব নয়। কারণ স্বপ্নের মাধ্যমে প্রধানত ব্রেন তার হাউজ ক্লিনিং করে থাকে, তথ্যের পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন করে থাকে। মনের স্বপ্ন সঞ্চার প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে বিপর্যয় অনিবার্য। একজনকে ঘুমাতে না দিলে অবশ্যই শারীরিক-মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু একজনকে স্বপ্ন দেখার সময়ে জাগিয়ে দিলে প্রতিক্রিয়া হয় আরো মারাত্মক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে প্রতিপক্ষের গুপ্তচরকে নানাভাবে পীড়ন করে কথা বের করা ছিল এক সাধারণ ঘটনা। তখন টর্চার চেম্বারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রেম ঘুমের সময় স্বপ্ন দেখারত বন্দিকে ক্রমাগত জাগিয়ে দিলে ১ মাসের মধ্যেই সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

ঘুমের সাথে স্বপ্নের, সুস্থতার সাথে স্বপ্নের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা স্বপ্ন নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। সিগমণ্ড ফ্রয়েড, আলফ্রেড এডলার, কার্ল গুস্তব ইয়াং, থিউডর রেইক, এলান হবসন প্রমুখের স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তা এক বিশ্বকোষে পরিণত হবে। তাছাড়া স্বপ্নের রহস্যময় ভুবন নিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনা আধুনিককালের কোনো ঘটনা নয়। সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষ স্বপ্ন নিয়ে ভেবে এসেছে। সভ্যতার শুরু থেকেই স্বপ্ন ব্যক্তিকে, ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে।

হিটলারের স্বপ্নের কথা ভাবুন। হিটলার তখন জার্মান সেনাবাহিনীতে একজন কর্পোরাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসী ফ্রন্টে যুদ্ধ হচ্ছে। বাংকারে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। এমন সময় স্বপ্ন দেখছেন একটি ফরাসী গোলা এসে পড়েছে বাংকারের ওপর । বাংকার গুঁড়িয়ে গেছে। ভেতরে ঘুমন্ত সবার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। স্বপ্ন হিটলারের কাছে এত বাস্তব মনে হয়েছে যে, তিনি চোখ মেলতে মেলতেই দৌড়ে বাংকারের বাইরে চলে যান। বাংকারের বাইরে যাওয়ার কয়েক মুহূর্ত পর তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, পুরো ব্যাপারটাই ছিল এক স্বপ্ন। তিনি একটু সুস্থির হয়ে যখন বাংকারে ফিরতে যাবেন, এমন সময়ই ফরাসী কামানের গোলা এসে পড়ে বাংকারের ওপর। বাংকারের ভেতরে যারা ছিলেন তারা সবাই নিহত হন। শুধুমাত্র হিটলারই বেঁচে ছিলেন। এই স্বপ্ন ও

ঘটনার পর হিটলারের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তার জন্যে বড় কিছু অপেক্ষা করছে। এরপরের ইতিহাস তো সবারই জানা। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে হিটলার জার্মানির ফুয়েরারই হন নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইউরোপকেই তিনি কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলেন।

ভবিষ্যৎ নির্দেশক স্বপ্ন প্রাচ্যে দেখা হয়েছে প্রচুর। মহামতি বুদ্ধের জন্মের কিছুদিন আগে মায়াদেবী স্বপ্নে দেখেন যে, একটি শ্বেত হাতি তার দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করে গর্ভে প্রবেশ করল। স্বামী রাজা শুদ্ধোধনকে এ কথা জানানো হলে তিনি স্বপ্নের ব্যাখা দানের জন্যে জ্যোতিষীদের ডাকেন। জ্যোতিষীরা মায়াদেবীর গর্ভে একজন মহাপুরুষের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। শ্রী রাম কৃষ্ণ পরম হংসদেবের পিতা ক্ষুদিরাম গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে স্বপ্নে দেখেন, এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাকে বলছেন যে, তিনি ক্ষুদিরামের পুত্ররূপে জন্ম নেবেন। মহাপুরুষদের জন্মের আগে এ ধরনের স্বপ্ন তার মা-বাবারা প্রায়ই দেখেছেন।

স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দেখার বিবরণও ইতিহাসে পাওয়া যায় প্রচুর। জুলিয়াস সিজার তার মৃত্যুর ঘটনা আগেই স্বপ্নে দেখেছিলেন, প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনও তা-ই। ইংরেজ কবি শেলী খুব অল্প বয়সে ভূমধ্যসাগরে ডুবে মারা যান। তার প্রায় ২ সপ্তাহ আগে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তার কয়েকজন বন্ধু আহত রক্তাক্ত অবস্থায় তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে যে, বাড়িটা সমুদ্রের পানিতে ডুবে যাচ্ছে। এর সাথে সাথে শেলী আরো স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তার প্রিয় বন্ধু উইলিয়ামসের গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মারছেন। উইলিয়ামসও কবি শেলীর সাথে ডুবে মারা যান।

আর এক কবি টেনিসন স্বপ্ন দেখেন যে, রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী এলবার্ট তার গালে চুমু খাচ্ছেন। এর ঠিক পরদিনই তিনি বৃটিশ রাজ দরবার থেকে চিঠি পান যে, তাকে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সম্মানিত করা হচ্ছে।

স্বপ্নে শুধু ভবিষ্যৎ দেখা নয়, স্বপ্ন হতে পারে সমস্যা সমাধানেরও উপায়। যেমন বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক ভন কাকুল বেনজিনের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার নিয়ে যখন কিছুতেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিলেন না, তখন স্বপ্নে দেখেন একটি সাপ তার লেজ মুখে দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে পড়ে আছে। এই স্বপ্ন থেকেই তিনি বেনজিনের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার বের করে ফেলেন।

সেলাই মেশিন আবিষ্কারক ইলাইয়াস হাও-ও তার সমস্যার সমাধান পান স্বপ্নে। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, আমাজানের জঙ্গলে আদিবাসীরা তাকে ঘিরে ফেলেছে। বর্শা দিয়ে তাকে মারতে উদ্যত হয়েছে। বর্শা তার শরীরের কাছাকাছি এনে আবার পেছনে নিয়ে যাচ্ছে, বার বার শরীরের কাছাকাছি আনছে আবার পেছনে নিয়ে যাচ্ছে। বর্শার অগ্রভাগে রয়েছে ছিদ্র। ব্যস সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সেলাই মেশিনের সূচ তৈরি হয়ে গেল।

বল বিয়ারিং-এর আবিষ্কর্তা জেমস ওয়াট স্বপ্নে দেখেন যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ছোট ছোট সীসার বল। বহুদিন তিনি এই সীসার বল বৃষ্টি হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। বল বিয়ারিং তৈরি সম্পন্ন হলো। এই স্বপ্ন দেখাও বন্ধ

হলো। এ তো গেল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে স্বপ্নের অবদান। স্বপ্ন যে কতভাবে কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, সুরকারকে অনুপ্রাণিত করেছে, তার বিবরণ লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইতিহাস

স্বপ্ন চর্চা ও স্বপ্ন ব্যাখ্যার প্রাচীনতম বিবরণ আমরা পাই মিশর রাজার দরবারে এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। রাজা স্বপ্নে দেখলেন, ৭টি তাজা গরু বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। এ সময় ৭টি কঙ্কালসার গরু এসে এই তাজা হৃষ্টপুষ্ট গরুগুলোকে খেয়ে ফেলল। তখন কারাগারে বন্দি হযরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তার ফলাফল বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যায়ে।

ব্যাবিলন সম্রাট নেবুশাদনেজ্জারের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা ড্যানিয়েল করেছেন তা-ও ইতিহাস বিখ্যাত। ব্যাবিলন ও মিশরীয় স্বপ্নের গাথা নিয়ে স্বপ্নচর্চার ওপর প্রথম যে পুস্তক তার নাম হচ্ছে- Artemidorus' Oneirocritica। খ্রিষ্টপূর্ব হাজার বছর আগে রচিত অথর্ববেদ স্বপ্ন চর্চার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অথর্ববেদে স্বপ্ন ব্যাখ্যার সূত্রগুলোর মধ্য থেকে একটি সূত্র এখনো স্বপ্ন ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিব্বতে স্বপ্ন চর্চার জন্যে নিবেদিত রয়েছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি বিশেষ সম্প্রদায়। এদের বলা হয় স্বপ্নযোগী। এরা শুধু স্বপ্ন ব্যাখ্যা নয়, সচেতনভাবে স্বপ্ন তৈরি করতেও দক্ষ। মালয়েশিয়ায় তেনিয়র সেনোইস গোত্র প্রধানত স্বপ্ন চর্চায় নিবেদিত। আমাদের সমাজেও স্বপ্নের চর্চা ব্যাপক। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বলিত খাবনামার এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে আমাদের। আর আলেমদের মাঝে অনেকে যে, 'ইস্তেখারা' করে ভালোমন্দ বলেন, তা-ও স্বপ্নচর্চা ও স্বপ্নের সৃজনশীল প্রয়োগেরই একটি বিশেষ মাত্রা।

স্বপ্নের সৃজনশীল প্রয়োগের প্রক্রিয়া

স্বপ্নকে কাজে লাগানোর পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে স্বপ্ন ভুলে যাওয়া। বিছানা থেকে উঠতে উঠতে আসলে স্বপ্নের পুরো রেশ মিলিয়ে যায়। স্বপ্ন আর কিছুতেই মনে আসতে চায় না। স্বপ্ন মনে রাখার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারলেই স্বপ্নের সৃজনশীল প্রয়োগের পথে আপনি সবচেয়ে বড় বাধা অতিক্রম করে যাবেন। এজন্যে আপনাকে তৈরি করতে হবে স্বপ্নের ডায়েরি। স্বপ্নের ডায়েরির ৫টি ধাপ-

১. প্রথমত স্বপ্ন লেখার জন্যেই বিশেষ নোট বই ও পেন্সিল বা কলম কিনুন।

২. ডায়েরির পাতায় স্পষ্ট করে স্বপ্নের নম্বর, তারিখ ও সময় লিখুন। ডায়েরি ও কলম প্রতিরাতে শোয়ার সময় বিছানায় বালিশের পাশে রেখে ঘুমান।

৩. চোখ মেলার সাথে সাথে বিছানায় বসেই স্বপ্ন লিখে ফেলুন, যতটুকু মনে পড়ে পুরোটাই লিখুন।

৪. শূন্যস্থান পূরণ-প্রথম দিকে স্বপ্নের কিছু কিছু অংশ মনে পড়তে চাইবে না। সে অংশটুকু কল্পনা করে পূরণ

করুন। তাহলেই একটা মানসিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হবে এবং আপনি দেখবেন এরপর স্বপ্ন ভুলছেন না।

৫. স্বপ্ন দেখার সময় কী অনুভূতি হয়েছিল, তা পুরোপুরি লিখে ফেলুন। মনে রাখবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এ অনুভূতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬. স্বপ্ন ব্যাখ্যায় সবসময় সর্বশেষ স্বপ্নটিকে গুরুত্ব দিন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সর্বশেষ স্বপ্ন আগের স্বপ্নগুলোকে বাতিল করে দেয়।

৭. প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়িতে যান। অন্যান্য কাজ সেরে মনে মনে বলুন, আমি আজ যে স্বপ্ন দেখব তা মনে রাখব। আমি যে সমস্যা মনের কাছে তুলে ধরছি, তার জবাব আমি স্বপ্নে পাব, তা মনে রাখব এবং তার অর্থ উদ্ধার করতে পারব।

এক নাগাড়ে ৪০ দিন এ অনুশীলন করে যান। স্বপ্ন মনে রাখা তখন আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন স্বপ্নের কোন অংশ শারীরিক বা স্নায়বিক উত্তেজনার ফসল, কোন অংশ ব্রেনের হাউজ ক্লিনিং প্রক্রিয়ার অংশ, কোন অংশ সমস্যা বা সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ, কোন অংশে সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে। এজন্যে আপনার আর অন্য কারো দ্বারস্থ হতে হবে না।

অধ্যায়-১৭

ছাত্রজীবনে সাফল্যলাভ

ছাত্রজীবনে সাফল্যলাভের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন হচ্ছে নিজের ওপর আস্থা স্থাপন। নিজের শক্তির ওপর আস্থা স্থাপন।

নিজের মনোদৈহিক প্রক্রিয়াকে একটু বুঝতে চেষ্টা করলেই এই আস্থা ও আত্মবিশ্বাস অনেকগুণ বেড়ে যাবে। নিজের দেহের কথাই ভাবুন। পাঁচ শতাধিক মাংসপেশি, দুই শতাধিক হাড়, ৭০ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন দেহকোষ বা সেলের সমন্বয়ে গঠিত এই শরীরের প্রতিটি সেলে খাবার পৌঁছানোর জন্যে রয়েছে শিরা ও ধমনীর ৬০ হাজার মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন। আর আপনার হার্ট কোনোরকম ক্লান্তি বা প্রতিবাদ ছাড়াই প্রতিদিন এক লক্ষবার স্পন্দনের মাধ্যমে ১৬ শত গ্যালনেরও বেশি রক্ত পাম্প করে দেহকে সচল রাখছে।

আপনি যদি নিজেকে অভাবগ্রস্ত মনে করে থাকেন, তাহলে এর চেয়ে বড় ভ্রান্তি কিছুই হতে পারে না। কারণ আপনার মনোদৈহিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্রেন হচ্ছে যে-কোনো কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে ১০ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী। কম্পিউটারের দামের অনুপাতে আপনার ব্রেনের মূল্য কমপক্ষে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। আর আপনি জানেন যে, সভ্যতার সবকিছুর পেছনেই রয়েছে এই ব্রেনের ক্ষমতার সৃজনশীল প্রয়োগ। আর আপনি বিশ্বের ছয় শত কোটি মানুষের মধ্যে এক অনন্য সৃষ্টি। আপনার মতো হুবহু একইরকম দ্বিতীয় কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনার ব্রেনও তাই অনন্য।

আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো ঘাটতি থেকে থাকে, তাহলে মনের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিত অটোসাজেশন ও প্রত্যয়ন-বিশেষত আত্মপ্রত্যয়নের মাধ্যমে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলুন। আত্মবিশ্বাস হচ্ছে প্রতিটি সাফল্যের ভিত্তি। কারণ সাফল্য বলতে শুধু ক্লাসে ভালো রেজাল্ট, শিক্ষাঙ্গনে পরিচিতি লাভ বা স্কলারশিপ লাভ বা অর্থ উপার্জন বোঝায় না। সাফল্য হচ্ছে বিশ্বাস ও যোগ্যতার সমন্বয়ে গঠিত মনের এমন এক শক্তিশালী অবস্থা যা সবকিছুই অর্জন করতে সক্ষম। শুধুমাত্র ক্লাসে প্রথম হওয়া নয়, জীবনে প্রথম হওয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

চাওয়া মাত্র পাওয়ার ক্ষমতা

চাওয়া মাত্র পাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে প্রথমত আপনাকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে। আপনি যদি ইতিমধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার বা চিকিৎসাবিজ্ঞান বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রের জন্যে নিজের লক্ষ্য স্থির করে

থাকেন, তাহলেও এ লক্ষ্যকে আরো সুনির্দিষ্ট ও শাণিত করতে হবে। আপনাকে দূরপ্রসারী ও আশু লক্ষ্য স্থির করতে হবে। আশু লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য সবসময়ই একজনের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।

আশু লক্ষ্য ২/৩ মাস মেয়াদী হতে পারে। আর এই লক্ষ্য হতে হবে একেবারেই সুনির্দিষ্ট। যেমন আমি আগামী পরীক্ষায় শতকরা.... % নম্বর পাব।

দূরপ্রসারী লক্ষ্য হতে পারে অনার্সে ফার্স্টক্লাস পাওয়া, বৃত্তি পাওয়া, বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া। সর্বোচ্চ ডিগ্রির সাথে সাথে যথার্থ জ্ঞানও অর্জন করা। কারণ আপনার যে-কোনো চাওয়াকে পূরণ করার জন্যে সম্পদের প্রয়োজন। আর আমরা জানি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হোক বা স্ব-অর্জিত শিক্ষা-জ্ঞানই হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্পদ। জ্ঞান ও সৃজনশীলতাই আপনার জন্যে সুযোগের বন্ধ দুয়ার খুলে দিতে পারে।

তাই আপনার পক্ষে সম্ভব সর্বোত্তম শিক্ষা গ্রহণ করুন। পরবর্তী সময়ে বইয়ের জ্ঞান অনেক সময় কাজে না লাগলেও ছাত্রাবস্থায় সৃষ্ট যোগাযোগগুলো নিঃসন্দেহে কাজে লাগবে। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির করা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মনছবি আপনার প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হতে পারে। আর এই মনছবির শক্তি শাণিত হবে নিয়মিত একাগ্রচিত্তে মেডিটেশন করলে।

প্রো-অ্যাকটিভ হোন

চিন্তা ও আচরণে আপনাকে প্রো-অ্যাকটিভ হতে হবে। একজন ইতিবাচক ব্যক্তি সবসময় ইতিবাচক ব্যক্তিদেরই আকর্ষণ করে এবং তারা পরস্পর পরস্পরের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। ইতিবাচক ব্যক্তিত্বের সূচনা হয় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

আপনি কি আপনাকে বিশ্বাস করেন? নিজের ওপর কতটুকু আস্থা ও নির্ভরতা আছে আপনার? যদি আস্থা থাকে, নিজের ওপর নির্ভরতা থাকে, তাহলে আপনি অবশ্যই সফল হবেন। আপনার ব্যক্তিত্বে আস্থার প্রভাব পরিলক্ষিত হলেই অন্যরা আপনার ওপর নির্ভর করতে শুরু করবে। আপনি আনুকূল্য পাবেন। তাদের নির্ভরতা আপনাকে দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

প্রো-অ্যাকটিভ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির জন্যে আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। সুষম খাবার গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। বসা ও দাঁড়ানোর ভঙ্গিও সঠিক ও প্রত্যয়দৃপ্ত হতে হবে। নিয়মিত দাঁত, চুল, নখ ও ত্বকের যত্ন নিতে হবে।

কুঁজো হয়ে নয়, মাথা উঁচু করে হাঁটতে হবে। মুখে থাকবে মৃদু হাসি। নিজের পাঠ্যবই ছাড়াও স্বাস্থ্য, মন, দর্শন, সাহিত্য পড়তে হবে। কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে হবে। আত্মম্ভরিতা ও অহংকার বর্জন করতে হবে। আচরণে প্রকাশ পাবে আত্মপ্রত্যয় ও বিনয়। আর তাহলেই আপনার মধ্যে অন্যকে প্রভাবিত

করার ক্ষমতা সৃষ্টি হবে।

বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হোন

ছাত্রজীবনে বন্ধুদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারো কারো ক্ষেত্রে জীবন প্রভাবিত হয় প্রধানত বন্ধুদের দ্বারাই। যার সাথে আপনার যোগাযোগ বেশি হবে, তার দ্বারাই আপনি প্রভাবিত হবেন বেশি। অধিকাংশের জীবনধারা তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনুরূপ হয়। তাই আপনার বন্ধুরা যদি মেধাবী, সহানুভূতিশীল, সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, তাহলে আপনারও তা অর্জন করার সম্ভাবনা থাকবে। শেখ সাদীর একটি উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, 'কবুতর কবুতরের সাথেই মেশে আর ঈগল মেশে ঈগলের সাথে।'

আবার আমরা জানি, বাঘ যদি মেষের পালের সাথে সবসময়ই বিচরণ করতে থাকে তাহলে সে-ও কিছুদিন পরে নিজেকে মেষ ভাবতে শুরু করে। তাই আপনার বন্ধুরা যদি দুর্বলচিত্ত হয় বা রূঢ় আচরণে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ্যহীন জীবনে ভেসে বেড়াতে থাকে, ড্রাগ, ধূমপান ও অন্যান্য বদভ্যাস বা অনাচার-অত্যাচারে লিপ্ত থাকে বা মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের সাথে জড়িত থাকে তাহলে এ ধরনের বন্ধুরা আপনার জীবনের সুমহান লক্ষ্য থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে পারে। তাদের সাথে থেকে আপনিও বদভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন।

কোনো বন্ধু যদি আপনার জন্যে আনন্দের কারণ না হয়, যদি বেশিরভাগ সময়ই তার সাথে তর্ক-বিতর্কে কেটে যায়, তাহলেও আপনার আচরণে কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। হয় তার সাথে দেখা করার সময় কমিয়ে দিন বা কীভাবে তার সাথে মতৈক্য সৃষ্টি করা যায় তা খুঁজে বের করুন। কারণ ক্রমাগত মতানৈক্য আপনার মানসিক প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারে।

ছাত্রজীবনে সুন্দরভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্যে বিশ্বস্ত বন্ধু ও স্টাডি পার্টনার প্রয়োজন। আর এ দুটো সত্তাই যদি একজনের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে তা সোনায় সোহাগা।

কিন্তু আপনি যাকে বন্ধু ভাবছেন, সে যদি প্রায়শই ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে বা তার সমস্যা নিয়ে প্রতিনিয়তই আপনাকে বলে বলে আপনার সময় নষ্ট ও মনের শান্তি বিঘ্নিত করে, তাহলে আপনাকে এখনই সতর্ক হতে হবে। আপনার এমন কোনো সম্পর্কের প্রয়োজন নেই, যা আপনার সাফল্যের পথকে বিঘ্নিত করে, প্রতিষ্ঠার পথকে বাধাগ্রস্ত করে।

আপনি হয়তো বলবেন, আপনার সহযোগিতা তার জন্যে প্রয়োজনীয়। যত প্রয়োজনীয় হোক, নিজের সম্ভাবনা বিনষ্ট করে অন্যের প্রয়োজন পূরণ করার কোনো অধিকার আপনার নেই। কারণ প্রথমত, আপনার অভিভাবকদের কাছে আপনি শিক্ষাগত সাফল্য লাভের আন্তরিক ও একাগ্র প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ থেকে যে-কোনো বিচ্যুতি এই ওয়াদা লঙ্ঘনের শামিল। দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে আপনি

নিজে সফল হতে না পারলে, আপনার দ্বারা কারো উপকার সম্ভব নয়। আপনি আবেগ দ্বারা পরিচালিত হলে এই সত্যটি এখন আপনার পক্ষে বোঝা কঠিন হতে পারে।

কিন্তু যখন আপনি বুঝতে পারবেন, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে, তখন আপনার জীবনে হয়তো অনুশোচনা ও গ্লানি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এমন অনুশোচনাকারীদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তাই পরবর্তী জীবনে অনুশোচনা করার চেয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নিন। বদভ্যাসে লিপ্ত বা আজে বাজে সঙ্গীদের সাথে সম্পর্ক বিসর্জন দিয়ে প্রতিশ্রুতিশীল, গতিশীল ও প্রো-অ্যাকটিভ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন। তারাই আপনার জন্যে জ্ঞান, উদ্যম ও আনন্দের উৎসে পরিণত হবে। ভালো ও সফল বন্ধুর সাহচর্য আপনাকেও সাফল্যের পথে, প্রতিষ্ঠার পথে নিয়ে যাবে।

পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে

পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে সারাদিন, সারারাত পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে প্রয়োজন চারটি শর্ত পূরণ–

১. পরীক্ষায় ভালো ফল লাভের লক্ষ্য স্থির

২. পড়াশোনায় অখণ্ড মনোযোগ সৃষ্টি

৩. সময়ের সদ্ব্যবহার

৪. পরীক্ষার হলে বা ভাইভাতে নার্ভাস না হয়ে প্রশান্ত মনে পরীক্ষা প্রদান

১. পরীক্ষায় ভালো ফল লাভের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হতে হবে-অর্থাৎ আপনি যত নম্বর (যেমন ৬৫০, ৭২০, ৮৩০) পেতে চান, সুস্পষ্টভাবে তা স্থির করে সেই নম্বরের মনছবি দেখুন।

২. পড়াশোনায় অখণ্ড মনোযোগ সৃষ্টি করতে হবে-এজন্যে নিয়মিত ২ মিনিট মনোযোগের অনুশীলন করতে হবে। (অনুশীলনীর জন্যে মনোযোগ অধ্যায় দেখুন) এতে আপনার মনোযোগ ক্রমান্বয়ে অখণ্ড হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয়ত, পড়তে বা লিখতে বসার আগে মনোযোগ শূন্যায়নের অনুশীলন করতে হবে। তাতেও পড়ায় মনোযোগ সৃষ্টি সহজ হবে। মনে রাখতে হবে, যে-কোনো বিষয় যত মনোযোগ দিয়ে পড়া হবে, তা মনে রাখা হবে তত সহজ।

মনোযোগ শূন্যায়ন পদ্ধতি

মনোযোগ শূন্যায়নের জন্যে প্রথমে আরাম করে চেয়ারে এমনভাবে বসুন, যাতে বেশ কিছু সময় শরীর কোনোরকম নাড়াচাড়া না করে থাকা যায়। এরপর সামনে একটি কাগজ ও কলম বা পেন্সিল নিন। এবার লম্বা

একটা দম নিয়ে মনে মনে বলুন, আমি এখন পেন্সিল বা কলম দিয়ে বিশেষ ধরনের বৃত্ত আঁকতে যাচ্ছি।

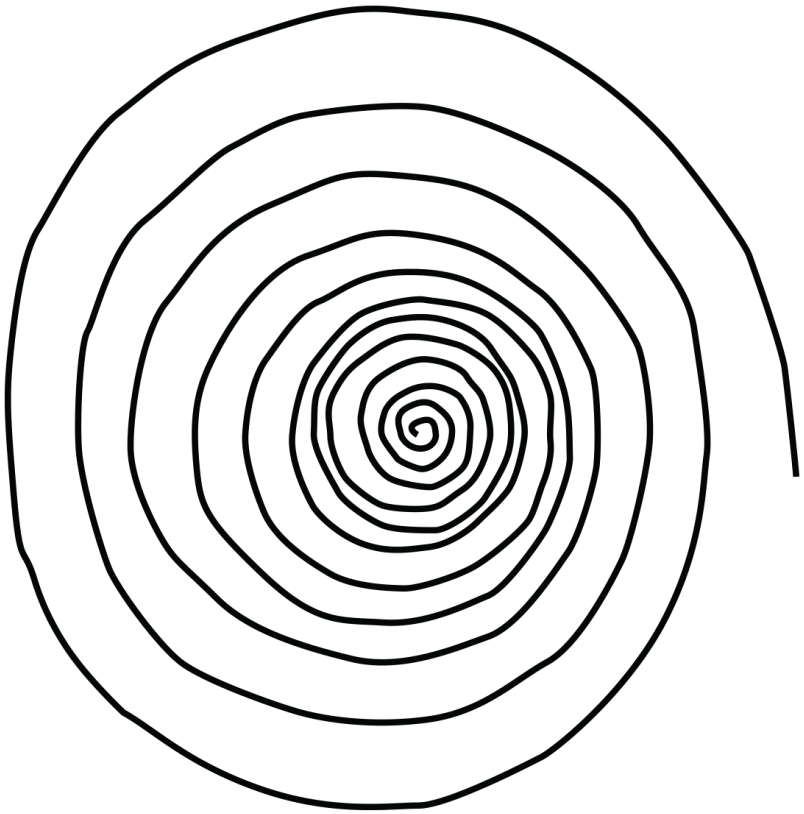

বৃত্তের কেন্দ্রে আমার কলম বা পেন্সিল যাওয়ার সাথে সাথে আমার মন বাইরের সকল প্রকার চিন্তা থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে যাবে। আমি এখন... পড়তে যাচ্ছি (শূন্যস্থানে যা পড়তে যাচ্ছেন তার উল্লেখ করুন) এবং তা আমার মনে পুরোপুরি গেঁথে যাবে এবং যখনই স্মরণ করতে চাইব তা মনে পড়বে এবং আমি তা বলতে ও লিখতে পারব।

এরপর ওপরের বৃত্তের মতো করে বৃত্ত আঁকা শুরু করুন। এমনভাবে রেখা আঁকবেন যাতে তা কোনোক্রমেই আগের রেখাকে স্পর্শ না করে। এভাবে যখনই আপনার কলম বা পেন্সিল কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে, তখনই আপনি অনুভব করবেন বাইরের সকল চিন্তা থেকে সরে এসে আপনার মনোযোগ নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে চলে আসছে।

ক্রমাগত অনুশীলন করলে এই প্রক্রিয়ায় মুহূর্তে আপনি পড়শোনায় মনোনিবেশ করতে পারবেন। তখন পড়া অনায়াসে মনে থাকবে।

পড়া মনে রাখার দ্বিতীয় পদ্ধতি

যে-কোনো জটিল বিষয় মনে রাখার জন্যে পড়া শুরুর আগে চেয়ারে বসে আরাম, আরাম, আরাম এবং ১৯ থেকে ০ গণনা করে মনের বাড়ির ড্রইংরুমে বসে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে বলুন, 'আমি কোয়ান্টা ভঙ্গি করে এখন

... অমুক বিষয়ের (বিষয়ের নাম উল্লেখ করুন) ... অমুক অধ্যায় (অধ্যায়ের নাম উল্লেখ করুন) ... পড়তে যাচ্ছি। আমি কোয়ান্টা ভঙ্গি করে যা পড়ব, তা আমার পুরোপুরি মনে থাকবে এবং ভবিষ্যতে যখনই কোয়ান্টা ভঙ্গি করে তা মনে করতে চাইব, সাথে সাথে তা মনে পড়বে এবং আমি সুন্দরভাবে তা বলতে বা লিখতে পারব।'

এরপর নিয়মমতো ০ থেকে ৭ গণনা করে বাহ্যিক জাগ্রত অবস্থায় পৌঁছান। কোয়ান্টা ভঙ্গি করা অবস্থায় পড়া শুরু করুন। পড়া শেষ করে আবার নিয়মমাফিক মনের বাড়ির ড্রইংরুমে যান। আরামে বসে পুনরায় বলুন, 'আমি এতক্ষণ কোয়ান্টা ভঙ্গি যোগে যা পড়লাম তা আমার স্মৃতিতে পুরোপুরি গেঁথে রইল। এরপর ভবিষ্যতে যখনই কোয়ান্টা ভঙ্গি করে এ বিষয়টি আমি মনে করতে চাইব সাথে সাথে বিষয়টি পুরোপুরি হুবহু মনে পড়বে এবং আমি তা সুন্দরভাবে বলতে বা লিখতে পারব।'

তারপর নিয়মমাফিক মনের বাড়ি থেকে পুরোপুরি জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

পড়া মনে রাখার তৃতীয় পদ্ধতি

যে-কোনো কঠিন বিষয় মনে রাখার জন্যে প্রথমে তা বক্তৃতা আকারে টেপে লিপিবদ্ধ করুন। তারপর নিয়মমাফিক মনের বাড়ির ড্রইংরুমে গিয়ে বসুন। টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিন। একাগ্র মনোযোগ নিয়ে শুনতে থাকুন। মনের ওই গভীর স্তরে যে-কোনো বিষয় সহজে মনে থাকে।

তবে যারা মেডিটেশনে অভ্যস্ত হয়ে যান, তাদের জন্যে এই প্রক্রিয়া ব্যবহারের প্রয়োজন খুব কমই হয়। তারা সবসময় প্রথম বা দ্বিতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

৩. সময়ের সদ্ব্যবহার : সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনোকিছুই নেই। যে মুহূর্তটি চলে যাচ্ছে, তা আর কখনোই আপনার জীবনে ফিরে আসবে না। তাই পড়াশোনাসহ প্রতিটি কাজের একটা রুটিন করে নিন।

রুটিন অনুসরণ করুন। নিজের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা সৃষ্টি করুন। আর এ সময়ানুবর্তিতা সৃষ্টির জন্যে প্রতিদিন সকালে মেডিটেশনে 'আত্মপ্রত্যয়ন' মনে মনে পাঠ করুন। এছাড়াও যখন সময় পান আত্মপ্রত্যয়ন আবৃত্তি করুন।

৪. নার্ভাস না হয়ে প্রশান্ত মনে পরীক্ষা প্রদান : বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার কারণ হচ্ছে পরীক্ষা ভীতি। পরীক্ষার নাম শুনলেই নার্ভাসনেসসহ নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। হলে গিয়ে জানা বিষয় ভুলে যান। ভাইভা বোর্ডের সামনে কিছুতেই উত্তর মনে করতে পারেন না। নিয়মিত মেডিটেশনের প্রাথমিক লাভই হচ্ছে ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন। মেডিটেশন চর্চা করলে নার্ভাসনেস, টেনশন ও অহেতুক ভয়ভীতি দ্রুত পালিয়ে যাবে আপনার জীবন থেকে। নার্ভাসনেস ও যে-কোনো ধরনের অহেতুক ভয়ভীতি থেকে আপনি

হবেন সম্পূর্ণ মুক্ত।

তারপরও পরীক্ষার ব্যাপারে আপনি আগের রাতে পড়া শেষ করে শোয়ার আগে নিয়মমাফিক মনের বাড়িতে গিয়ে ড্রইংরুমে বসে নিম্নোক্ত প্রত্যয়ন করতে পারেন, 'আগামীকাল পরীক্ষা চলাকালে আমি অত্যন্ত প্রশান্ত ও সজাগ থাকব। প্রশান্ত মনে আত্মপ্রত্যয়ের সাথে প্রতিটি প্রশ্নের দ্রুত সঠিক জবাব লিখব বা বলব। আমি যা যা পড়েছি, তা হলে বসে অনায়াসে মনে করব। আমি যা পড়েছি তার প্রতিটি অক্ষর প্রয়োজনে অনায়াসে আপনাআপনিই মনে চলে আসবে এবং আমি তা সঠিকভাবে লিখব বা বলব।'

তাছাড়া ভাইভা পরীক্ষার সময় কোয়ান্টা ভঙ্গি অনায়াসে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পরীক্ষার খাতায় জবাব লেখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন-

১. প্রথমত, পুরো প্রশ্নপত্র একবার পড়ুন। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন পড়ার সময় কোন কোন প্রশ্নের জবাব লিখবেন তা বাছাই করে ফেলুন।

২. যে প্রশ্নগুলোর জবাব আপনি নির্ভুলভাবে জানেন, তা ক্রমানুসারে লিখুন।

৩. এরপর মোটামুটি জবাব জানা আছে সে প্রশ্নগুলো কোয়ান্টা ভঙ্গি করে লিখুন। দেখবেন যে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা চলে আসছে।

৪. এরপর বাকি যে প্রশ্নগুলোর জবাব মনে পড়ছে না বা যেটা আপনার ভালোভাবে পড়া নেই সেগুলোর জবাব লেখার চেষ্টা করুন। নিয়মমাফিক মনের বাড়িতে যান। যা মনে আসে তা-ই চোখ মেলে লিখে যান। বহু সময়ই এভাবে সঠিক উত্তর চলে আসে। (কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটরা এক্ষেত্রে মুহূর্তে কমান্ড সেন্টারে চলে যান, গুরুকে জিজ্ঞেস করেন। গুরু উপায় বাতলে দেবেন।)

অবশ্য আপনি মনছবি দেখে কোয়ান্টাম নিয়মে পড়াশোনা করলে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব সাথে সাথে মনে চলে আসবে। তাছাড়া পরীক্ষার আগে নিজেই বুঝতে পারবেন, পরীক্ষায় কী কী আসতে পারে, কোন কোন বিষয়ে বেশি পড়তে হবে। অবচেতন মনই আপনার মনছবির লক্ষ্য অর্জনের পথে নেপথ্যে আপনাকে পরিচালিত করবে।

অধ্যায়-১৮

কোয়ান্টাম নিরাময়

মানবদেহ এক অপূর্ব সৃষ্টি। মহাবিশ্বে এত চমৎকার, এত বুদ্ধিমান, এত সৃজনশীল, এত সংবেদনশীল আর কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব এখনো পাওয়া যায় নি। এই দেহে রয়েছে ৭০ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ। প্রতিটি কোষে খাবার পৌঁছানোর জন্যে রয়েছে ৬০ হাজার মাইল পাইপ লাইন। রয়েছে ফুসফুসের মতো রক্ত শোধনাগার। হার্টের মতো শক্তিশালী পাম্প, যা জীবদ্দশায় সাড়ে ৪ কোটি গ্যালনের চেয়ে বেশি রক্ত পাম্প করে থাকে। রয়েছে চোখের মতো ছোট্ট লেন্স, যা দিয়ে বিশাল বিশ্বের সবকিছু দেখা যায়। আর এই দেহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে রয়েছে সার্কুলেটরি, নার্ভাস, এন্ডোক্রাইন, ইমিউন সিস্টেমের মতো অসংখ্য সিস্টেম।

তাই আমাদের সবার মধ্যেই সুস্থ থাকার ক্ষমতা রয়েছে। সুস্থতা স্বাভাবিক। অসুস্থতা অস্বাভাবিক। আজ পর্যন্ত একথা কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি যে, রোগগ্রস্ত হওয়া প্রয়োজন। বরং সত্য হচ্ছে এর বিপরীত। প্রতিদিন আমরা কোটি কোটি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, এলার্জেন, ফাঙ্গি ইত্যাদির মুখোমুখি হচ্ছি এবং এর অতি ক্ষুদ্রাংশই রোগ পর্যন্ত গড়ায়। আপনি জানেন যে, দৈহিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ছাড়াও আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। যারা রোগ নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তায় ভোগে তারা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। আর যারা ব্যস্ত, 'রোগ নিয়ে ভাবার' সময় পায় না, তাদের গড়পড়তা স্বাস্থ্য অনেক ভালো।

মানবদেহ অপূর্ব সৃষ্টি হলেও বহতা নদীর মতোই মানবদেহের প্রতিটি পরমাণু পরিবর্তিত হচ্ছে। টেনেসির ওক রিজ ল্যাবরেটরিতে রেডিও আইসোটোপ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মানবদেহের ৯৮% পরমাণু প্রতিবছর পরিবর্তিত হয়। আর এই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় ডিএনএ-তে বিদ্যমান জেনেটিক কোড দ্বারা, মন-দেহ প্রক্রিয়ার কোয়ান্টাম লেভেল থেকে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানবদেহের শতকরা ৯৮ ভাগ পদার্থ প্রতিবছর পরিবর্তিত হওয়ার পরও রোগ-বিশেষত ক্রনিক রোগ থেকে যায় কীভাবে? এর উত্তর একটাই। বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু তথ্য অর্থাৎ ডিএনএ-র প্রোগ্রামিং অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে। তাই নতুন পদার্থও পুরনো তথ্য দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে।

তাই পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন মন-দেহ নিয়ন্ত্রণকারী তথ্যভাণ্ডারের পুনর্বিন্যাস। (To change the print out of the body, you must learn to rewrite the software of mind) তথ্যের পুনর্বিন্যাস হলেই মানবদেহ নিজেই নিজেকে রোগমুক্ত করতে পারে।

কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণার পর বলেছেন, 'মন সেরা ডাক্তার আর মানবদেহ সবচেয়ে সেরা

ফার্মেসি।' যে-কোনো ওষুধ কোম্পানির চেয়ে মানবদেহ বেশি ভালোভাবে পেইনকিলার, ট্রাঙ্কুইলাইজার, এন্টিবায়োটিক ইত্যাদি তৈরি করতে এবং সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ে ব্যবহার করতে পারে।

রোগের মূল কারণ মানসিক

মনের শক্তিকে ব্যবহার করে রোগ নিরাময় সম্ভব হবে কেন? ওষুধ যা নিরাময় করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে রোগ মনের শক্তি দিয়ে কীভাবে নিরাময় হতে পারে? এর জবাব একদিক থেকে বেশ জটিল আবার অন্যদিক থেকে সহজ। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণার পর এখন স্বীকার করতে শুরু করেছেন যে, রোগের কারণ যেমন দৈহিক হতে পারে, তেমনি হতে পারে মানসিক। বহু জটিল রোগ-এমনকি ক্যান্সারের কারণও হতে পারে মানসিক।

মার্কিন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ড. ক্রিচটন দীর্ঘ গবেষণার পর দেখিয়েছেন যে, হৃদরোগের কারণ প্রধানত মানসিক। তিনি বলেছেন, কোলেস্টেরল বা চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে করোনারি আর্টারিকে প্রায় ব্লক করে ফেললেই যে হার্ট অ্যাটাক হবে এমন কোনো কথা নেই।

কোরিয়ার যুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রে নিহত সৈনিকদের নিয়মিত অটোপসি করা হতো। ডাক্তাররা তখন সবিস্ময়ে লক্ষ করেন যে নিহত তরুণ সৈনিকদের শতকরা ৭০ জনেরই আর্টারি চর্বি জমে প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে (চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অ্যাডভান্সড স্টেজ অফ অ্যাথেরোসক্লেরোসিস) এবং দ্রুত হার্ট অ্যাটাকের পথে এগুচ্ছে। এদের মধ্যে ১৯ বছর বয়স্ক তরুণ সৈনিকও ছিল।

ড. ক্রিচটন প্রশ্ন তোলেন, তরুণ আর্টারিগুলো এভাবে চর্বি জমে বন্ধ হওয়ার পরও সাধারণভাবে মধ্য বয়সে এসে কেন হৃদরোগের আক্রমণ ঘটে? যদি শুধু করোনারি আর্টারিতে চর্বি জমাটাই হৃদরোগের কারণ হতো তাহলে তো এই তরুণ সৈনিকদের মৃত্যু গুলির আঘাতে নয় হৃদরোগেই হতো!

আবার দেখা গেছে, করোনারি আর্টারির ৮৫% বন্ধ অবস্থা নিয়েও একজন ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিয়েছে; আবার একেবারে পরিষ্কার আর্টারি নিয়েও অপর একজন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। ৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোর ড. মেয়ার ফ্রেডম্যান এবং ড. রে রোজেনম্যান দীর্ঘ গবেষণার পর দেখান যে, হৃদরোগের সাথে অস্থিরচিত্ততা, বিদ্বেষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনপদ্ধতির সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে।

মন যখন ভাবাবেগজনিত চাপ বা উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হয় তখন শরীর নানাভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। রক্তে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান নিঃসরণের পাশাপাশি হৃৎকম্পন বেড়ে যায়, রক্তচাপ বেড়ে যায়, মলাশয়ের তৎপরতা বাড়ে, মূত্রাশয় সহজে সঙ্কুচিত হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটা ডায়রিয়া এবং প্রস্রাব বৃদ্ধির রূপ নিতে

পারে।

ব্রেন দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত নার্ভাস সিস্টেম আপনার ত্বকের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। তাই ত্বকের ওপর আলতো করে স্পর্শ করে আদর করার মাধ্যমে শিশুদের শান্ত করা যায়। আবার ত্বকে চিমটি কেটে সহজেই স্নায়ুকে উত্তেজিত করে দেয়া যায়।

'ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া' বা 'লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া' কথাগুলো ত্বকের ওপর মনের প্রভাবকেই নির্দেশ করে। তাই উৎকণ্ঠার কারণে স্কিন র‍্যাশের মতো চর্মরোগও হতে পারে।

ড. হার্বার্ট বেনসন এবং ড. এডমন্ড জ্যাকবসন এই টেনশন বা উৎকণ্ঠার কারণে সৃষ্ট রোগের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছেন। এই তালিকায় রয়েছে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা, বাতব্যথা, বিষণ্নতা, বদমেজাজ, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ডায়রিয়া, বহুমূত্র, ঘাড়ে ব্যথা, মেরুদণ্ডে ব্যথা ইত্যাদি।

নিউরোসায়েন্টিস্টরা বলেছেন, টেনশন বা উৎকণ্ঠা বা স্ট্রেস হচ্ছে এমন এক রোগপ্রক্রিয়া বা মানসিক অবস্থা যা ব্রেনের বাস্তব কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে শারীরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই শারীরিক প্রতিক্রিয়া আবার ব্রেনের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। টেনশনে ব্রেন ও শরীরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কাজ করে দুষ্টচক্রের মতো।

উৎকণ্ঠা বা স্ট্রেসের প্রথম শারীরিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মুহূর্তে কাজে লাগানোর জন্যে বিভিন্ন পেশিকে শক্ত করে ফেলা। এই শক্ত পেশিগুলো আবার সাথে সাথে স্নায়ুর মাধ্যমে ব্রেনে খবর পাঠায়, যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সে তৈরি।

দৃশ্যত ব্রেন এই খবরকে ব্যাখ্যা করে তার আশঙ্কার প্রমাণ হিসেবে। অর্থাৎ ব্রেন তখন আরো নিশ্চিত হয় যে, সত্যিকারের দৈহিক বিপদ আসন্ন। তাই ব্রেন তখন প্রতিটি পেশিকে সজাগ হওয়ার জন্যে বার্তা পাঠাতে থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করে।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ এই ক্রমাগত অর্থহীন সতর্কীকরণের ফলে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাতে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং রোগ নিরাময় ক্ষমতা হ্রাস পায়। একই সাথে দৈহিক ও মানসিক অস্বস্তি বাড়তে থাকে। পরিণামে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়।

দেহের ওপর মনের এই অনভিপ্রেত আক্রমণের দুষ্টচক্রকে আপনি শুধুমাত্র পেশির আচরণ প্রক্রিয়া পাল্টে দিয়েই প্রতিহত করতে পারেন।

পেশি উত্তেজিত ও শক্ত হয়ে উঠলে আপনি সচেতনভাবে পেশিকে শিথিল করুন। পেশি শিথিল হওয়ার সাথে সাথে সে ব্রেনে খবর পাঠাবে সব ঠিক আছে, কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। আর তখন ব্রেনও সতর্কাবস্থা প্রত্যাহার করবে। ব্রেনে পেশি থেকে যত কম সতর্কাবস্থার বাণী যাবে, ব্রেন তত বেশি পরিমাণে শিথিল হবে

এবং এক পর্যায়ে সতর্কাবস্থা থেকে পরিপূর্ণ শিথিল অবস্থায় পৌঁছে যাবে। আর মন তখন উৎকণ্ঠার পরিবর্তে হবে প্রশান্ত। যে মন আপনার সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল, তা-ই পরিণত হবে নিরাময়ের বাহনে।

টেনশন ও শিথিলায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আপনি দেহ-মনের পরস্পরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। এই শিথিলায়নের পাশাপাশি আপনি যদি ভিজুয়ালাইজেশন বা মনছবির শক্তিকে প্রয়োগ করেন, তাহলে মনছবিই হতে পারে বহু জটিল রোগ নিরাময়ের হাতিয়ার।

শুধু তা-ই নয়, দেখা গেছে বহু ক্ষেত্রে যেখানে প্রচলিত ওষুধ নিরাময়ে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে ভিজুয়ালাইজেশন বা মনছবি চমৎকারভাবে নিরাময়ের কাজ সম্পন্ন করেছে। ডাক্তাররা দীর্ঘদিন ধরেই দেহের ওপর মনের প্রভাব সবিস্ময়ে লক্ষ করে আসছেন।

মানুষ মনে দুঃখ পেলে তার ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড প্লাবিত হয়। ফলে চোখে অশ্রু চলে আসে। বাস্তব অথবা কাল্পনিক বিপদ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়, রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়ায়, রক্তচাপ বাড়ায়, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর করে। মনে ক্রোধ সৃষ্টি হলেও এইসব শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডাক্তাররা এখন আরো দেখছেন যে, শুধু আবেগই শারীরিক পরিবর্তন ঘটায় না, সুনির্দিষ্ট মনছবিও শরীরের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে।

মনছবি বা ভিজুয়ালাইজেশনের শারীরিক প্রভাব সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন ড. এডমন্ড জ্যাকবসন। এই শতকের বিশের দশকে তিনি আবিষ্কার করেন যে, কেউ যখন নিজে দৌড়াচ্ছে বলে মনছবি দেখে বা ভিজুয়ালাইজ করে তখন তার পায়ের পেশিতে স্পন্দন সৃষ্টি হয়।

ব্যায়ামের ব্যাপারে মনছবি কতখানি কার্যকর বা মনছবি ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা ও শক্তি বাড়ায় কিনা এ সম্পর্কে নর্থ আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল থেরাপির প্রফেসর ড. মার্ক কর্নওয়াল বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালান। গবেষণার পর এ বিষয়ে তার জবাব হচ্ছে হাঁ। তার এই গবেষণা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট কানাডার 'ন্যাশনাল ইনকোয়েরার' পত্রিকার ১৯৯১ সালের ১৪ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ড. কর্নওয়াল গবেষণার জন্যে ২১ থেকে ২৫ বছর বয়স্ক ২৪ জন কলেজ ছাত্রীর পায়ের শক্তি ব্যায়াম মেশিনে মেপে নেন। এদের দু'ভাগ করেন। ১২ জন ছাত্রী ৩ দিন দৈনন্দিন রুটিনের পাশাপাশি নিরিবিলি কক্ষে শান্তভাবে বসে মনছবি দেখে যে, তারা ডান পায়ের পেশির ব্যায়াম করছে। মনছবি দেখতে গিয়ে তারা বাস্তবে পেশির ব্যায়াম করছে কিনা, তা শনাক্ত করার জন্যে তাদের পেশির সাথে ইলেক্ট্রয়েড সংযুক্ত করে দেয়া হয়।

অপর ১২ জন তাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন রুটিন অনুসরণ করে। চতুর্থ দিনে পেশিশক্তি মেপে দেখা যায় যে, যারা পেশির ব্যায়াম করার মনছবি দেখেছে, তাদের পেশির বল ১৩% বেড়েছে। আর অপর গ্রুপের পেশির বল অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ড. কর্নওয়াল অভিমত প্রকাশ করেছেন, মনছবি দেখে শরীরের যে-কোনো পেশি বা অঙ্গের বল বাড়ানো যেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার মনোবিজ্ঞানী এলান রিচার্ডসন দেখিয়েছেন যে, মনছবির মাধ্যমে দৈহিক দক্ষতাও বাড়ানো যায়। তিনি তরুণ বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের তার গবেষণায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। প্রথম গ্রুপ ২০ দিন প্রতিদিন ২০ মিনিট করে ফ্রি থ্রো নিক্ষেপ অনুশীলন করে।

দ্বিতীয় গ্রুপ অনুশীলন করা থেকে বিরত থাকে। আর তৃতীয় গ্রুপ মনছবির মাধ্যমে মনে মনে ২০ দিন প্রতিদিন ২০ মিনিট করে অনুশীলন করে। তারা শিথিলায়ন করে মনছবি দেখে যে, তারা সুনিপুণভাবে বল বাস্কেটে নিক্ষেপ করছে।

তিনটি গ্রুপ সমান দক্ষতা নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল। ২০ দিন পর পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, প্রথম গ্রুপ, যারা নিয়মিত বাস্তবে অনুশীলন করেছে তাদের দক্ষতা বেড়েছে ২৪%। দ্বিতীয় গ্রুপের কোনো উন্নতি হয় নি। আর তৃতীয় গ্রুপ যারা মনছবির মাধ্যমে মনে মনে অনুশীলনের কল্পনা করেছে তাদের দক্ষতা বেড়েছে ২৩%। তাই আজকাল ক্রীড়াবিদরা একই সাথে বাস্তব অনুশীলন ও মনছবি-এই দুই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের দক্ষতার সর্বোত্তম প্রয়োগ করছেন।

মনছবির প্রয়োগ দ্বারা রোগ নিরাময়ের প্রক্রিয়া আমেরিকায় শুরু করেন ড. কার্ল সিমনটন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ট ওর্থে ক্যান্সার কাউন্সেলিং সেন্টারে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে মনছবি ব্যবহার করে দেখেছেন, শুধুমাত্র ওষুধ সেবনকারীদের তুলনায় মনছবি প্রয়োগকারীরা বেশি দিন বেঁচে থাকেন। অনেকে পুরোপুরি ক্যান্সারমুক্তও হয়ে যান।

একই প্রক্রিয়ায় সিঙ্গাপুরের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী বি জি লী সিয়েনের ক্যান্সার ভালো হয়ে যায়। বিখ্যাত সাময়িকী এশিয়া উইকের ৩০ জুন, ১৯৯৩ সংখ্যায় 'দি পাওয়ার অব মেডিটেশন' নিবন্ধে বলা হয়, বি জি লী সিয়েন-এর লিমফেটিক ক্যান্সার ধরা পড়ে গত নভেম্বরে। এরপর তিনি মেডিটেশন করতে শেখেন।

১৮ সপ্তাহের কেমোথেরাপি এবং মেডিটেশনের পর ডাক্তাররা তাকে ক্যান্সারমুক্ত বলে ঘোষণা করেন। রিপোর্টে বলা হয়, ডাক্তাররা এখন অধিক হারে রোগীদের মেডিটেশন করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

সিঙ্গাপুরের টিউমার বিশেষজ্ঞ ড. ইয়াপ বো সেঙ বলেন, হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে মেডিটেশন টেনশন থেকে মুক্তি দেয়, রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং উচ্চ রক্তচাপ হ্রাস করে। শতকরা ৭০ ভাগ রোগ নিরাময়েই মেডিটেশন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা করতে পারে।

ইমেজ থেরাপি

বিশ শতকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনছবি প্রয়োগে ভূমিকা পালন করেছেন টেক্সাসের ড. কার্ল সিমনটন। তার বিখ্যাত 'ইমেজ থেরাপি' প্রয়োগ করে বহু রোগী রোগমুক্ত হয়েছেন। এমনকি ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছেন, এমন অন্তিম অবস্থা থেকেও বহু ক্যান্সার রোগী 'ইমেজ থেরাপি'র মাধ্যমে নিরাময় লাভ করেছেন।

আমেরিকার আরেকজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইয়েল ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ড. বার্নার্ড সীগেল মনছবির প্রয়োগ করে অসংখ্য দুরারোগ্য রোগীকে নিরাময় ও কর্মক্ষম করে তুলেছেন। এদের মধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত অনেক অন্তিম অবস্থার রোগীই রয়েছে।

ড. সীগেল মনছবির মাধ্যমে নিরাময়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে 'লাভ, মেডিসিন এন্ড মিরাকল' এবং 'পিস, লাভ এন্ড হিলিং' নামে দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বই লিখেছেন। এসব বইয়ে তিনি উপসংহার টেনেছেন এভাবে-সবারই নিজেকে নিরাময় করার সামর্থ্য রয়েছে। কিন্তু প্রায়ই তারা বাঁচার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে অথবা প্রত্যাশা করে যে, কোনো ডাক্তার বা কোনো ওষুধ বা কোনো বৈদ্য বা অন্য কেউ তাকে রোগমুক্ত করে দেবে।

যারা এইভাবে অন্যের ওপর ভরসা করে বসে থাকে তাদের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মনছবি তেমন কার্যকর না-ও হতে পারে। কিন্তু যারা আন্তরিকভাবে নিজে নিজে রোগমুক্ত হতে চায়, মনছবি বা ভিজুয়ালাইজেশন তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিরাময় প্রক্রিয়াকে নিশ্চিতভাবে সক্রিয় করে তোলে।

রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মনছবি কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দুটি পরিপূরক মত রয়েছে। প্রথম দলের অভিমত হচ্ছে, মনছবি মস্তিষ্কের বাম ও ডান বলয়ের তৎপরতার মধ্যে ভারসাম্য ও সমন্বয় সাধন করে।

মস্তিষ্কের বাম বলয় নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তিভিত্তিক ও বৈষয়িক চিন্তাকে। বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই বৈষয়িক চিন্তার প্রাধান্য রয়েছে। আর মস্তিষ্কের ডান বলয় নিয়ন্ত্রণ করে সৃজনশীলতা, কল্পনা, ইনটুইশন ও অতিচেতনাকে। সাধারণভাবে মস্তিষ্কের এই ডান বলয় খুব কম ব্যবহার করা হয়।

মনছবি দেখতে শুরু করার সাথে সাথে ডান বলয় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং দুই বলয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যহীনতা থাকে তা দূর করতে সহায়তা করে।

বিশেষজ্ঞদের অপর গ্রুপের অভিমত হচ্ছে আবেগ, চিত্রকল্প ও অনুভূতির মধ্যে গভীর সংযোগ রয়েছে। যে-কোনো আবেগের দৈহিক প্রকাশ ঘটতে পারে। যেমন মলিন চেহারা বা দীর্ঘশ্বাসের সাথে দুঃখ এবং মিষ্টি হাসির সাথে সুখানুভূতি জড়িত। তাই চিত্রকল্প যেমন আবেগকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি আবেগকে উপলব্ধি করা যেতে পারে চিত্রকল্পের মাধ্যমে। যেমন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনেক সময়ই চোখের সামনে যেন রক্ত দেখতে পায়,

দুর্বল মুহূর্তে অনেকে যেমন চোখে সর্ষে ফুল দেখে, তেমন। এই রকম চিত্রকল্প পাল্টে দিয়ে আবেগ ও দৈহিক অনুভূতিকে বদলে দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া আমরা তো জানিই ব্রেনের ভাষা হচ্ছে ছবি। ব্রেন ছবি দিয়ে যত সহজে প্রভাবিত হয়, কোনো ভাষা বা যুক্তি দিয়ে তত সহজে প্রভাবিত হয় না।

শুধু দৈহিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেই নয়, সাইকোথেরাপির বিভিন্ন স্কুলও তাদের নিজস্ব টেকনিকের পাশাপাশি মনছবি প্রয়োগ করছে। জার্মানির গটিগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হার্সাল লির্ডনার এর নাম দিয়েছেন 'নিয়ন্ত্রিত কার্যকরী কল্পচিত্র' (গাইডেড এফেকটিভ ইমেজারি)। মনছবির এই প্রক্রিয়ায় রোগী তার চিকিৎসা চলাকালে কয়েকবার নির্দিষ্ট কল্পচিত্রের একটি সিরিজের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে। এই কল্পচিত্রগুলো তার জীবনের প্রধান দ্বন্দ্বগুলোর প্রতীক। প্রতিটি কল্পচিত্রই তার জীবনের বিশেষ দ্বন্দ্বের সমাধানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি স্রোতস্বিনীর উৎস মুখ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার সমস্যার মুখে যাওয়ার চেষ্টা। পর্বতারোহণের অর্থ হচ্ছে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। মনোবিজ্ঞানী ড. জেরোম সিঙ্গার দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর বলেছেন যে, মনছবির মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা প্রচলিত সাইকো-এনালাইসিসের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে উল্লেখযোগ্য ফল দেয়। এই প্রক্রিয়ায় রোগের লক্ষণসমূহ দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং রোগীর অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

অপর একটি থেরাপি পদ্ধতিতে বিভিন্ন দৈহিক অসুবিধায় ভোগার কথা যারা বলেন, তাদেরকে 'দেহের ভেতরে ভ্রমণে' নিয়ে যাওয়া হয়। রোগীকে প্রথমে শিথিলায়ন করতে বলা হয়, তারপর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্য দিয়ে কাল্পনিক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ভ্রমণের সময় রোগী যেমন তার সমস্যা সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে, তেমনি রোগের মনোদৈহিক লক্ষণগুলো দূর হয়ে যায়। একজন মনোবিজ্ঞানী তাই বলেছেন, মনছবি বা ইমেজ থেরাপির মাঝে সাইকো-থেরাপিউটিক শক্তির এক বিশাল ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে রোগ নিরাময়ে মেডিটেশনের সরকারি স্বীকৃতি

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের বাঘা বাঘা ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেল সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, গভীর শিথিলায়ন ওষুধ ও সার্জারির মতোই দ্রুত ক্রনিক ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের সনাতন ধারণা থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম। এই প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রথিতযশা চিকিৎসাবিদরা সরকারিভাবে শিথিলায়নকে কোমরব্যথা, মাথাব্যথা, আর্থ্রাইটিস এবং অন্যান্য ক্রনিক ব্যথা নিরাময়ের কার্যকরী প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। এছাড়া পেইন কিলার বা সার্জারির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকলেও শিথিলায়নের তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। চুপচাপ বসে দম অবলোকন করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কারোরই পাকস্থলীর আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

শিথিলায়নকে নিরাময় প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার খবর বেরিয়েছে ডাক্তারদের বিখ্যাত সাময়িকী জার্নাল অব দি আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জুলাই ২৪/৩১, ১৯৯৬ সংখ্যায়।

শিথিলায়নের মাধ্যমে ব্যথা উপশম করার জন্যে আপনার দরবেশ, সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু হওয়ার প্রয়োজন নেই। এজন্যে নির্বাণ বা ফানাফিল্লাহর স্তরেও আপনাকে যেতে হবে না। এজন্যে চুপচাপ একটু নীরবে বসার মতো জায়গা পেলেই যথেষ্ট। কারণ শিথিলায়নের পুরো প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে মনের।

শিথিলায়ন ভেতর থেকে কাজ করে। দৈনন্দিন চিন্তা থেকে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্যে আলাদা করে ফেললেই আপনি শিথিল হতে শুরু করেন। মাইন্ড বডি ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ও হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বিহেভিওরাল মেডিসিনের পরিচালক ড. হার্বার্ট বেনসন খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, ভেতর থেকে শিথিল হতে শুরু করলেই আপনার শরীর ১৮০ ডিগ্রি মোড় নেয়, উত্তেজনা থেকে পুনর্নির্মাণের স্তরে ফিরে যায়। পেশি শিথিল হয়ে যায়, দম ধীর হয়, বিপাক ক্রিয়া ও রক্তচাপ কমে যায়। পক্ষান্তরে উত্তেজিত অবস্থায় পেশি শক্ত হয়ে যায়, রক্তচাপ বাড়ে, দম দ্রুত হয়, ব্যথা-বেদনা বেড়ে যায়।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের এনেসথেসিওলজি ও ব্যথা গবেষণা বিভাগের প্রফেসর ড. ডেনিস টার্ক খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, গভীর শিথিলায়ন শর্ট সার্কিট করে ব্যথা বিনাশের সাথে সাথে ব্যথার সাথে জড়িত আবেগকেও বিনাশ করে।

তিনি বলেন, 'সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে, রাত তিনটার সময় যখন আপনি প্রচণ্ড মাথাব্যথা বা ব্যাকপেইনের কারণে জেগে ওঠেন তখন আপনার নিজেকে প্রচণ্ড অসহায় মনে হয়। মনে হয় এখন আপনার কিছুই করার নেই। আপনি বিছানায় শুয়ে আহাজারি করেন। ভাবেন কিছুই করার নেই। সে সময় যদি আপনি শিথিলায়নের টেকনিক প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে পরিস্থিতির ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ আসতে থাকে। অসহায়ত্বের ভাব কমে যায়। সেইসাথে কমে যায় ব্যথার কষ্ট।

ব্যথা-বেদনা নাশে শিথিলায়নের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের দেশে ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে তেমন কোনো সচেতনতা না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে শিথিলায়ন বা মেডিটেশন সচেতনতা এখন অনেক প্রবল। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত চিকিৎসা মাসিক প্রিভেনশনের জুন, ১৯৯৭ সংখ্যায় সারা দেশে পরিচালিত জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছে, ৩০% আমেরিকান পেইন কিলার সেবন করে, ৩৫% ব্যথা অবহেলা করে, ২৭% শিথিলায়ন করে ব্যথা কমায়।

৭৫% আমেরিকান মনে করে যে, ওষুধ ছাড়াই ব্যথা উপশম সম্ভব। ২৩% আমেরিকান জানান যে, তাদের ডাক্তাররা তাদেরকে ওষুধ বাদ দিয়ে শিথিলায়নের মাধ্যমে ব্যথা উপশমের পরামর্শ দিয়েছেন। এই জরিপে দেখা যায় যে, ক্রমানুসারে মাথাব্যথা, পেশির ব্যথা, ব্যাকপেইন, মহিলাদের মাসিকের সময়ের ব্যথা-যন্ত্রণা,

আর্থ্রাইটিস, পায়ে ব্যথা এসব সাধারণ ব্যথা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ ধরনের প্রতিটি ব্যথার ক্ষেত্রেই পেইন কিলারের চেয়ে শিথিলায়নের কার্যকারিতা কোনো অংশে কম নয়। আর শিথিলায়ন বা মেডিটেশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশের মতো বাংলাদেশেও হাজার হাজার মানুষ এখন উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ঠান্ডা এলার্জি, হাঁপানি, ফ্রোজেন শোল্ডার, ব্যাকপেইন, স্পন্ডিলাইটিস, মাইগ্রেন, গ্যাস্ট্রিক আলসার, আর্থ্রাইটিস, অনিদ্রা প্রভৃতি ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।

এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক থেকে শুরু করে প্রকৌশলী, ডাক্তার, রাজনীতিক, শিল্পপতি, সমাজসেবী, গায়ক, গায়িকা, সুরকার, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহবধুরাও রয়েছেন। প্রচলিত ধারণা অনুসারে এরা সবাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন এবং এরা সবাই নিজেকে নিজে নিরাময় করেছেন মেডিটেশনের মাধ্যমে মনোশক্তি ও মনছবির সৃজনশীল ও ফলপ্রসূ প্রয়োগ করে।

রোগ নিরাময়ে এই মনোশক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে প্রখ্যাত চিকিৎসক জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'শরীরের চেয়ে মন অনেক বেশি শক্তিশালী। মনের শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, এমনকি রোগ নির্মূল করে।' তিনি বলেছেন, 'আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও কোয়ান্টাম মেথড পরস্পরের পরিপূরক। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কোয়ান্টাম মেথডকে সংযুক্ত করলে রোগীর রোগ নিরাময় সহজ হবে।'

হৃদরোগ নিরাময়ে

পাশ্চাত্যের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি হৃদরোগ। হার্ট অ্যাটাকের সূচনা হয় হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনীর দেয়ালে হলুদ চর্বির স্তর জমে জমে একসময় রক্ত চলাচল কমে এলে। প্রচলিত চিকিৎসাবিজ্ঞানে ধমনীর এই চর্বি পরিষ্কার করার জন্যে শক্তিশালী ওষুধ, এনজিওপ্লাস্টি এবং বাইপাস সার্জারি করা হয়। আর হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত রোগীদের এছাড়া কোনো বিকল্প উপায় ছিল না। বর্তমানে ওষুধ ও অস্ত্রোপচার ছাড়াই কম অর্থব্যয়ে হৃদরোগীরা পুরোপুরি নিরাময় লাভ করছেন। হৃদরোগ নিরাময়ে এ সফল পদ্ধতির প্রবর্তক হচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানী ডা. ডিন অরনিশ।

ওষুধ ছাড়াই হৃদরোগ চিকিৎসায় এ সাফল্যের কথা বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারে ১৯৮৮ সালে। কিন্তু ডা. অরনিশ এ ব্যাপারে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে আসছিলেন বহু বছর ধরে। ১৯৮৬ সালে ৪১ জন হৃদরোগীকে দুই ভাগে ভাগ করে গবেষণা শুরু হয়।

এই ৪১ জনের মধ্যে কেউই করোনারি বাইপাস সার্জারি করাতে রাজি হচ্ছিলেন না। হলুদ চর্বির স্তর জমে এদের ধমনী প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। কেউ কেউ ইতোমধ্যেই হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন। এদের দুই দলে ভাগ করা হলো। প্রথম দলে ২২ জন, আর কন্ট্রোল গ্রুপে ১৯ জন।

ডা. অরনিশের মেডিটেশন ও জীবন অভ্যাস কর্মসূচি গ্রহণ করলেন ২২ জন। তিনি এদের মেডিটেশন ও কিছু যোগাসনের কলাকৌশল শেখালেন। এর সাথে প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে হাঁটা। এক ঘণ্টা করে মেডিটেশন ও যোগব্যায়াম। আর নিরামিষ খাবার। এরা কোনো ওষুধ ব্যবহার করবেন না।

আর দ্বিতীয় দল, অর্থাৎ কন্ট্রোল গ্রুপের ১৯ জনকে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশিত পথ্যবিধি অনুসরণ করতে বলা হলো। প্রয়োজনে কোলেস্টেরল কমাবার ওষুধ এরা ব্যবহার করতে পারবেন। আর হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের হৃদরোগ মোকাবেলায় করণীয় কার্যক্রম অনুসরণ করবেন।

রোগের অবস্থা পুনরায় আগাগোড়া নিরীক্ষণ করা হলো একবছর পর। পাওয়া গেল অদ্ভুত ফল। ডা. অরনিশের কার্যসূচি যারা অনুসরণ করছিলেন তাদের ধমনীতে জমে থাকা হলুদ চর্বি বা কোলেস্টেরল পরিষ্কার হয়ে রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়ায় তারা ভীতিকর বুকব্যথা থেকে মুক্তি পান এবং তাদের হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমে আসে। অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের ১৯ জন যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায়ই থেকে গেলেন। তাদের অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না।

১৯৮৭ সালে প্রবর্তনের পর থেকে তার এই পদ্ধতি এত সফল হয়েছে যে, সর্বমহলেই এটি এখন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এর প্রমাণ হচ্ছে, 'নিউজউইক' সাময়িকীর ১৯৯৫ সালের ২৪ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'গোয়িং মেইনস্ট্রিম' রিপোর্টটি। রিপোর্টে বলা হয়-

জীবনধারণ পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদরোগকে শুধু প্রতিরোধ করা যায় না, নিরাময়ও করা যায়। ডা. অরনিশের এই পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর ওমাহার মিউচ্যুয়াল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি দুই বছর আগে স্বাস্থ্য বীমার পলিসিধারী কয়েক শত হৃদরোগীকে অরনিশের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এদের মধ্যে দুই শত রোগী ১৫ হাজার ডলারের এনজিওপ্লাস্টি বা ৪০ হাজার ডলারের বাইপাস সার্জারির জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরিবর্তে পাঁচ হাজার ডলারের এই জীবনধারা পরিবর্তন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করেন। সারা বছরের এই কর্মসূচিতে রয়েছে মেডিটেশন, ব্যায়াম, নিরামিষ খাবার এবং গ্রুপ আলোচনা।

নিরীক্ষার শুরুতে সমালোচকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, রোগীরা জীবনযাত্রা পরিবর্তনমূলক এই কর্মসূচি কয়েকদিন পরেই পরিত্যাগ করবে এবং অরনিশের ফি-র ওপর আবার হাসপাতালের বিলও কোম্পানির ঘাড়ে চাপবে।

কিন্তু দেখা গেল যে, ৯৫ ভাগ রোগীই অরনিশের কর্মসূচিতে নিজেদের সম্পৃক্ত করে ফেলেছেন। ২০০ রোগীর মধ্যে ১৯০ জন এক বছরের এই কর্মসূচি অনুসরণ করেন। এর মধ্যে ১৮৯ জন সুস্থ হয়ে যান। মাত্র ১ জনের অপারেশন করার প্রয়োজন হয়।

মিউচ্যুয়াল বীমা কোম্পানি হিসাব করে দেখেছেন যে, ইতোমধ্যেই তারা প্রতি ডলারে সাড়ে ৬ ডলার বাঁচিয়েছে। আর যেহেতু হৃদরোগীদের অপারেশন-পরবর্তী বছরগুলোয় বার বার অপারেশন প্রয়োজন হয়, তাই কোম্পানি মনে করে যে, অরনিশের কর্মসূচি তাদের ডলার প্রতি ২০ ডলার বাঁচাতে সাহায্য করবে।

এই সাফল্য দেখে আরো ১৫টি বীমা কোম্পানি অরনিশের কার্যসূচি গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞদের পাঠানো হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার সাওসালিটোতে। তারা এখন জানতে চাইছে এই কর্মসূচি কীভাবে রোগীর ওপর প্রয়োগ করতে হবে।

নেব্রাস্কার ৫০ বছর বয়স্ক পুলিশ ফ্রাঙ্ক সেবরন অরনিশের কর্মসূচিতে যোগদান করে। এর আগে তার এনজিওপ্লাস্টি করা হয়েছে এবং তাকে প্রতি মাসে ২১৪ ডলার ব্যয় করে দুটি ওষুধ খেতে হতো। কিন্তু সে এত দুর্বল ছিল যে, কাঠও কাটতে পারত না। আজ তার ধমনী প্রায় পরিষ্কার। তার কোলেস্টেরলের মাত্রা একেবারে কম। সে এখন দূরপাল্লার বাইসাইকেল চালায়।

ডা. অরনিশের এই কার্যসূচি এখন সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে। তাই একে আর এখন বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা বলা হয় না। এটি এখন চিকিৎসার মূল ধারার সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

রোগ নিরাময়ে মনছবির প্রক্রিয়া

রোগ নিরাময়ে মনছবি দেখার প্রক্রিয়া খুব সহজ। মনছবির প্রক্রিয়াকে দ্রুত ফলপ্রসূ করার জন্যে আপনি প্রথমে নিজেকে পুরোপুরি শিথিল করুন। মনের বাড়িতে চলে যান। এরপর আপনার রোগ বা প্রয়োজন অনুসারে মনছবি দেখায় নিমগ্ন হোন। প্রয়োজনে প্রচলিত চিকিৎসা ও ওষুধের পাশাপাশি আপনি মনছবি দেখতে পারেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন ও দৃষ্টিভঙ্গিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ডা. কার্ল সিমনটনের তত্ত্বাবধানে এক ক্যান্সার রোগী রেডিয়েশন দেয়ার সময় মনছবি দেখত যে, কোটি কোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুলেট রেডিয়েশন দেয়ার সময় ক্যান্সারের কোষগুলোকে আঘাত করে মেরে ফেলেছে।

ওগুলো মারা যাওয়ার সাথে সাথে রক্তের শ্বেত কণিকারা এসে ধরে ধরে মৃত কোষগুলোকে কিডনিতে ঠেলে দিচ্ছে। আর কিডনি তা মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দিচ্ছে এবং প্রতিদিন ক্যান্সারের আয়তন ছোট হচ্ছে। রেডিয়েশন ও এই মনছবির প্রতিক্রিয়ায় সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

আরেকজন রোগীর যুদ্ধ, গোলাগুলি একেবারে অপছন্দ। ক্যান্সার কোষকে 'বুলেট' বিদ্ধ করে হত্যা করার ছবি

সে দেখতে রাজি নয়। এই রোগী নিজেই তার সমস্যার সমাধান বের করে ফেলে। সে কোষগুলোকে কল্পনা করে সর্ষে দানারূপে। আর দেখে অসংখ্য ছোট ছোট পাখি ওই সর্ষে দানাগুলো খেয়ে যাচ্ছে। আর সর্ষে দানার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে, আস্তে আস্তে সর্ষে দানা নিঃশেষ হয়ে আসছে। সর্ষে দানাও শেষ, রোগ নিরাময়ও সম্পন্ন।

রোগ নিরাময়ের মনছবি নির্মাণে কল্পনা শক্তিকে চমৎকার সৃজনশীলতার সঙ্গে কাজে লাগানো যেতে পারে। বৈচিত্র্যপূর্ণ পন্থায় কল্পনাকে সফলভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারটি সবসময় ব্যক্তির কল্পনাশক্তি ও মনে মনে ছবি দেখার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।

যে-কেউ একবার বিশেষজ্ঞের কাছে প্রক্রিয়াটি শিখে নিয়ে ঘরে বসেই চর্চা করতে পারেন। বেশিরভাগ মানুষই সহজে মনছবি নির্মাণ করতে পারেন। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে মনের পর্দায় কাঙ্ক্ষিত মনছবি ধরা দিতে দেরি করে। কারণ তাদের মস্তিষ্ক ছবির পরিবর্তে শব্দ বা অনুভূতির সংমিশ্রণে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে। এদের ক্ষেত্রে অনুভূতিই ছবির কাজ সম্পন্ন করে এবং সচেতন প্রচেষ্টায় এদের অনুভূতিই ছবির মতো শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়।

মেডিটেশন, মন-নিয়ন্ত্রণ বা মনোশক্তি উন্নয়ন পদ্ধতির চর্চাকারীরা নিজেদের যে-কোনো রোগমুক্তির জন্যে বিচিত্র, অভিনব ও সৃজনশীল মনছবি প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট চর্মরোগের জন্যে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার চার চারবার ওষুধ পাল্টানোর পরও তার রোগের অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে যায়। এরপর সে রোগ নিরাময়ের লক্ষ্যে মনছবি দেখা শুরু করে। সে কল্পনা করতে থাকে, তার ত্বকের ওপর অসংখ্য পোকা কিলবিল করছে, আর কতগুলো ছোট ছোট পাখি পোকাগুলো ধরে তৃপ্তির সাথে খাচ্ছে। দিনে ৫/৬ বার করে একাগ্র মনোযোগের সাথে ৭ দিন এই মনছবি দেখার পর তার চর্মরোগ পুরোপুরি ভালো হয়ে যায়। প্রতিবার মনছবিতে পাখির পোকা খাওয়া দেখার পর কল্পনায়ই সে ত্বকের ওপর নিমপাতা বেটে প্রলেপ লাগিয়ে দিত।

এক মহিলা ডাক্তার মাসিকের সময় খুবই কষ্ট পেতেন। পেইন কিলারেও স্বস্তি মিলত না। যেহেতু জরায়ু ও তলপেটের সকল রক্ত পরিবাহী শিরা ও ধমনী সম্পর্কে তার ভালো ধারণা ছিল, তাই তিনি মনছবি দেখা শুরু করেন যে, তলপেট ও জরায়ুতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে চমৎকারভাবে। পাতলা লাল রক্ত তলপেটে ও জরায়ুতে যাচ্ছে এবং সেখানকার সকল অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে ভাসিয়ে নিয়ে আসছে। সুন্দর রক্ত সঞ্চালনের এই মনছবি দেখার তৃতীয় দিন থেকেই তার সকল ব্যথা ও অস্বস্তি দূর হয়ে যায়। এরপর মাসিকের সময় হওয়ার আগেই তিনি সুন্দর রক্ত সঞ্চালনের মনছবি দেখা শুরু করেন এবং মাসিককালীন অস্বস্তি ও কষ্ট থেকে পুরোপুরি মুক্তি লাভ করেন।

মনছবির বৈচিত্র্যের ধরন বলে শেষ করা যাবে না। আট বছরের এক বালক রাতে ঘুমের ঘোরে বিছানা ভিজিয়ে ফেলত। এটা বন্ধ করার জন্যে সবরকম চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার পর পারিবারিক ডাক্তার তাকে ভিজুয়ালাইজেশন থেরাপির পরামর্শ দিলেন।

বালক বিছানা ভেজানোর সময় স্বপ্ন দেখত যে বিশাল নদী থেকে পানি আসছে। তাই ডাক্তারের পরামর্শে সে তার মনছবি তৈরি করল এই রকম- নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে এমন এক জায়গায় এসে পড়েছে যেখানে নদীর মাঝে উঁচু বাঁধ দিয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু সে রাতেও বালক বিছানা ভিজিয়ে ফেলল। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছিল।

বালক জানাল, বাঁধের একটি দরজা দিয়ে পানি চুয়াচ্ছিল। ডাক্তার এরপর বালককে এই পানি চোয়ানো বন্ধ করার উপায় বের করতে বললেন। দুজনে মিলে একটি লোহার পাতে ওয়াটার প্রুফ সুপার গ্লু লাগিয়ে বাঁধের দরজাকে পুরোপুরি পানি নিরোধক করার মনছবি নির্মাণ করলেন। দরজা তালা লাগিয়ে বন্ধ করা হলো। কিন্তু চাবি থাকল বালকের কাছে। বালক যখন ইচ্ছা চাবি দিয়ে দরজা খুলতে বা একটি চাকু দিয়ে সুপার গ্লু সরিয়ে ফেলতে পারবে।

প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বালক তার মায়ের সাথে মনছবির মাধ্যমে নদীর তীরে এই কাল্পনিক যাত্রা শুরু করত। বাঁধের কাছে গিয়ে বাঁধের গেট পানি নিরোধক করে বন্ধ করে কাল্পনিক চাবি মায়ের হাতে তুলে দিত। আর মা সেটা বিছানায় বালিশের নিচে রেখে দিতেন।

এরপর প্রথম তিন সপ্তাহে বালক মাত্র তিনবার বিছানা ভিজিয়েছিল। সেই তিন রাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বালক বলেছে যে, তুফান ও প্রবল বর্ষণে নদীর পানি বাঁধ উপচে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। ডাক্তারের সহায়তায় সে এই সমস্যাও কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

সে আবার মনছবিতে কল্পচিত্র তৈরি করে যে, নদীর পাড়ে একটা সুড়ঙ্গমতো রয়েছে। পানির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে সেখান দিয়ে তা জমিতে চলে যায়, বাঁধ উপচে নিচে পড়ে না। এই মনছবি পুরোপুরি আত্মস্থ হওয়ার পর সে আর কখনো বিছানা ভেজায় নি।

ক্রীড়াজনিত আঘাত নিরাময়ের ক্ষেত্রেও মনছবি বা নিয়ন্ত্রিত কল্পচিত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে। ধরুন একজন খেলোয়াড়ের পেশি থেঁতলে গেছে। তিনি পেশির নিরাময় প্রক্রিয়া মনছবিতে দেখতে থাকবেন। তিনি দেখবেন পেশির আঁশগুলো ঢিলা হয়ে সোজাভাবে মিলিত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলো অপসারিত হচ্ছে। সবশেষে তিনি দেখবেন তার পেশি সুদৃঢ়, ইলাস্টিক, সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে-খেলোয়াড়কে অবশ্যই কোনো বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে নিরাময়ের

মনছবির অনুশীলন করতে হবে। তা না হলে বাস্তবে পুরোপুরি নিরাময়ের আগেই মনে হতে পারে তার পেশি পুরোপুরি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেছে।

দুরারোগ্য এইডসে আক্রান্ত ৩০ বছর বয়স্ক রোগী লুই নাসসানি পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেন মনছবির ফলপ্রসূ প্রয়োগের মাধ্যমে। কয়েক বছর আগে এইডস রোগ ধরা পড়ার পর থেকেই তার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। ডায়রিয়া, জ্বর ও দুঃস্বপ্ন তার নিত্যসঙ্গীতে পরিণত হয়। তার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়, কথা বলার ক্ষমতা কমে যায়। ১৯৮৪ সালের প্রথম দিকে তাকে সকল ওষুধ বাদ দিয়ে নিরাময়ের জন্যে মনছবি দেখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

তিনি মনছবিতে তার রক্তস্রোতের টি-সেলগুলোকে ছোট ছোট সাদা ইঁদুররূপে কল্পনা করতে থাকেন। তিনি দেখতে থাকেন, এই সাদা ইঁদুরগুলো দ্রুত বংশবিস্তার করছে। লুই নাসসানি তার হারানো ওজন কয়েক মাসেই ফিরে পান। তার রক্তে টি-সেল-এর সংখ্যা স্বাভাবিক হয়ে আসে। রোগের সকল লক্ষণ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে পুরোপুরি মুক্তি পান তিনি।

ডা. কার্ল সিমনটন দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, ভিজুয়ালাইজেশন বা মনছবি টেনশন ও বিষণ্নতার অবসান ঘটায়, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। মনছবির মাধ্যমে ধূমপান বর্জন করা যায়, স্থায়ীভাবে ওজন হ্রাস করা ও স্থূলতা কমানো যায় এবং নিজের ইমেজ বাড়ানো যায়।

নিরাময়সহ যে-কোনো উদ্দেশ্যে মনছবি কার্যকরী করার মূল প্রক্রিয়া শুরু হয় শিথিলায়নের মাধ্যমে। ডা. সিমনটন বলেছেন, দেহ-মনের শিথিলায়ন হচ্ছে মনছবির প্রাণ। আর রোগ নিরাময়ের জন্যে প্রতিদিন দুবার করে ২০ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত শিথিলায়ন ও মনছবির অনুশীলন করতে হবে।

সুস্থতার জন্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করুন

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নিসংশয়ে বলতে পারি, সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনচেতনা। কারণ চেতনা বস্তুর চেয়ে আর তথ্য শারীরিক শক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সর্বত্রগামী। রোগ ও অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্যে তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, শতকরা ৭০ ভাগ রোগের কারণই হচ্ছে মানসিক। অর্থাৎ কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে আপনার মানসিক প্রতিক্রিয়াই ৭০ ভাগ রোগ সৃষ্টির কারণ। শতকরা ২০ ভাগ রোগের কারণ হচ্ছে ইনফেকশন, ভাইরাস আক্রমণ, ভুল খাদ্য গ্রহণ ও ব্যায়াম না করা।

শতকরা ১০ ভাগ রোগের কারণ হচ্ছে দৈহিক আঘাত, ওষুধ ও অপারেশনের প্রতিক্রিয়া। তাই শতকারা ৭০ ভাগ রোগই শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সুস্থ জীবনদৃষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে নিরাময় হতে পারে। অন্যান্য রোগ

নিরাময়েও ওষুধ ও সার্জারির পাশাপাশি সুস্থ জীবনদৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি মূলত ওষুধ, রসায়ন ও অপারেশন নির্ভর পদ্ধতি। আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোয়ান্টাম হিলিংয়ের প্রবক্তা ডা. দীপক চোপড়া বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে রোগীরা এক আক্রমণাত্মক যান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার শিকার। চিকিৎসাব্যবস্থার এই যান্ত্রিকতাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর শতকরা ৩৬ ভাগ মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

একটি মার্কিন সাময়িকীর বিশেষ নিবন্ধে বলা হয়, যান্ত্রিক ও রসায়ননির্ভর এই চিকিৎসাব্যবস্থা এখন হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। চিকিৎসাব্যবস্থা আসলে হয়ে উঠেছে 'চিকিৎসাব্যবসা' বা 'চিকিৎসাবাজার'। আর এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে বীমা কোম্পানি, ওষুধ কোম্পানি ও চিকিৎসা প্রযুক্তি নির্মাণ কারখানার মালিকেরা। ফলে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ শুধু রোগীদেরই নয়, চিকিৎসাদানকারী বহু কর্মীরও।

ডা. জন রবিন্স এই অবস্থার জন্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে রোগীদের ভ্রান্ত ধারণাকেও দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, এরা মনে করে যে, সুস্বাস্থ্য বা নিরাময় ডাক্তার, ড্রাগস্টোর বা হাসপাতালে রয়েছে। ডাক্তার তাদেরকে ধন্বন্তরী ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইনজেকশন দিয়ে ভালো করে দেবেন। এ আশায় রোগীরা ডাক্তারের পর ডাক্তার আর ওষুধের পর ওষুধ বদলায়। কিন্তু নিরাময় লাভ করতে ব্যর্থ হয়। ডা. রবিন্স বলেন, আসলে নিরাময়ের ক্ষমতা রোগমুক্তির ক্ষমতা রোগীর মধ্যেই রয়েছে। ডাক্তার শুধু সহায়ক শক্তি মাত্র।

নিজের দায়িত্ব নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে

নব্য চিকিৎসা ধারার প্রবর্তক ডা. ডীন অরনিশ, ডা. দীপক চোপড়া, ডা. ল্যারি ডসি, ডা. রবিন্স, ডা. বার্নি সীগেল, ডা. ক্রিশ্চিয়ানে নর্থট্রপ, ডা. হার্বার্ট বেনসন, ডা. জোয়ান বরিসেঙ্কো, ডা. এন্ড্রু ওয়েলস, ডা. এডওয়ার্ড জব, ডা. মিখাইল স্যামুয়েলস প্রমুখ 'বডি, মাইন্ড, স্পিরিট' সাময়িকীর ১৯৯৭ সালের বিশেষ সংখ্যায় 'একবিংশ শতকের স্বাস্থ্য' প্রচ্ছদ কাহিনীতে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে মত প্রকাশ করেছেন যে, সুস্থ থাকতে হলে নিজের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে।

নিজেকে নিরাময় করার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এই সহজাত ক্ষমতার সাথে নিজের বিশ্বাসকে সম্পৃক্ত করতে পারলে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার শতকরা ৯০ ভাগ খরচই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। কারণ বাইপাস সার্জারি, এনজিওপ্লাস্টি বা সারাজীবন কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রক ওষুধ সেবনের চাইতে জীবনদৃষ্টি পরিবর্তন করে জীবনধারা পরিবর্তনে খরচ অনেক অনেক কম। ডা. হার্বার্ট বেনসন বলেন, একজন মানুষ নিজে নিজেই শিথিলায়ন, মেডিটেশন, ব্যায়াম ও পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং

তার নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারে।

সুস্থ জীবনের জন্যে কোয়ান্টাম চেতনাকে অনুসরণ করে স্বাস্থ্য ও নিরাময়ের দায়িত্ব আপনার নিজেকেই নিতে হবে। ডাক্তার, ওষুধ, সার্জারি সবই হবে আপনার সহযোগী শক্তি। আর এজন্যে আপনার জীবনদৃষ্টিকে ও জীবনধারাকে বদলাতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে, আমি সুস্থ হবো।

রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে আশাবাদী মনোভাব ও বিশ্বাস নিরাময়ের ক্ষেত্রে সবসময় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মেনিঙ্গার ফাউন্ডেশনের ডা. এলমার এবং এলিস গ্রীন নিরাময় লাভ করেছেন এমন চার শত ক্যান্সার রোগীর ওপর জরিপ চালিয়ে দেখেছেন যে, প্রত্যেকেই নিরাময়ের আগে কোনো না কোনোভাবে নিরাময়ের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। অতএব যেখানে ক্যান্সার রোগী রোগমুক্ত হয়ে উঠছেন সেখানে আপনিও রোগমুক্তির ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী হোন। মনে রাখবেন, চেতনা ওষুধের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সর্বত্রগামী।

হিলিং সেন্টার : নিজেকে নিরাময়ের জন্যে মেডিটেশন

রোগ নিরাময় ও সুস্বাস্থ্যের জন্যে মনছবির শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আপনাকে প্রথম মনের বাড়িতে হিলিং সেন্টার নির্মাণ করতে হবে। আপনি আপনার যে-কোনো রোগ নিরাময়ের জন্যে এই হিলিং সেন্টারকে ব্যবহার করতে পারবেন।
নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় শিথিলায়ন করে মনের বাড়িতে যান। মনের বাড়ির আশেপাশে সবকিছু দেখেশুনে ড্রইংরুমে আরাম করে বসুন।

ড্রইংরুম থেকে ডান দিকে বিশাল কক্ষে আপনার হিলিং সেন্টার। হিলিং সেন্টারে যাওয়ার সংকেত শব্দ হচ্ছে ৩-২-১-০। এই সংখ্যাগুলো গণনা করে ডান দিকের করিডোর দিয়ে আপনি হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করবেন। প্রবেশ করার পর কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

আবার ০-১-২-৩ গণনা করে কাজ শেষে হিলিং সেন্টার থেকে বের হয়ে আসবেন। প্রথমবার হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করার পর সেন্টারের সবকিছু নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে নিন। নিজের জন্যে সুন্দর চেয়ার, অটোমেটিক বেড, একটি সুন্দর বাথটাব স্থাপন করুন। একটি কমোড বা টয়লেট কক্ষও প্রয়োজনে স্থাপন করতে পারেন। নিজের শরীরের যে-কোনো অঙ্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে সামনে একটি মনিটরিং স্ক্রিন স্থাপন করুন। আর রুমের চারদিকের র‍্যাকে প্রয়োজনীয় ওষুধ, পথ্য, চুম্বক ও চিকিৎসার সকল ধরনের সামগ্রী স্থাপন করুন।

আপনার প্রিয় ডাক্তার, নার্স বা প্রিয়জনকে নিয়ে আসতে পারেন এই হিলিং সেন্টার বা নিরাময় কক্ষে। হিলিং

সেন্টার পুরোপুরি সাজিয়ে ফেলার পর আপনি আপনার চেয়ারে আরাম করে বসুন। এরপর সময় নিয়ে আপনার নির্দিষ্ট রোগ নিরাময়ের জন্যে যে ধরনের ছবি কল্পনা করা প্রয়োজন তা কল্পনা করতে থাকুন।

কল্পনায় অখণ্ড মনোযোগ দিলেই তা মনছবিতে রূপান্তরিত হবে। আপনার ব্রেন ছবির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ লাভ করবে। আপনার ভেতরে অবস্থিত ডাক্তার সক্রিয় হয়ে উঠবে, সাথে সাথে পুরোদমে চালু হবে দেহাভ্যন্তরের ওষুধ কারখানা। এভাবে নিরাময় ও আরোগ্য লাভের প্রক্রিয়া সূচিত হবে, আপনি রোগমুক্ত হবেন।

নিরাময়ের মেডিটেশনের সাতটি ধাপ

নিরাময়ের জন্যে মনছবির টেকনিক প্রয়োগকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি ধাপে বিভক্ত করতে পারি-

১. আরাম, আরাম, আরাম বলে ১৯ থেকে ০ গণনা করে মনের বাড়িতে যাওয়া।

২. মনের বাড়ির ড্রইং রুমে আরাম করে বসার পর ৩-২-১-০ গণনা করে ডান দিকের করিডোর দিয়ে হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করা।

৩. (প্রথমবার হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করার পর নিজের মনমতো করে সাজিয়ে নেয়া।) এরপর যখনই প্রয়োজন হিলিং চেয়ারে বসে প্রথমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ মনের চোখে অবলোকন করা।

৪. কোনো নির্দিষ্ট রোগ থাকলে সে রোগ নিরাময়ের জন্যে মনছবি নির্মাণ। (মনছবি নির্মাণে আপনি আপনার নিজস্ব কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা পুরোপুরি ব্যবহার করুন।) দীর্ঘক্ষণ যতদূর সম্ভব একাগ্র মনে মনছবি দেখতে থাকা।

৫. মনছবি দেখার পর ০-১-২-৩ গণনা করে হিলিং সেন্টার থেকে মনের বাড়ির ড্রইংরুমে প্রবেশ করা।

৬. আবার ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসা।

৭. বাস্তবে নিরাময় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন দুবার ২০-৩০ মিনিট করে হিলিং সেন্টারে মনছবি দেখা অব্যাহত রাখা।

এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে নিরাময় প্রক্রিয়ার অগ্রগতি দেখে আপনি নিজেই বিস্মিত হবেন।

হিলিং মেডিটেশন-১

রোগ নিরাময়ে মনছবি তৈরির অংশ হিসেবে আপনি নিম্নোক্ত কল্পচিত্র ব্যবহার করতে পারেন। আপনার অনুশীলনের জন্যে দুইটি হিলিং মেডিটেশন দেয়া হলো। মেডিটেশনের প্রতিটি ধাপ আগে ভালোভাবে পড়ে নিয়ে তারপর সেভাবে আপনার কল্পচিত্র তৈরি করুন।

দুটো মেডিটেশন আলাদা আলাদা বা এক মেডিটেশনের মধ্যেই সময় নিয়ে অনুশীলন করতে পারেন। প্রতিটি

ধাপে বিরতি আপনার কল্পচিত্রকে জোরদার করার জন্যে। সময় নিয়ে পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে মেডিটেশন করুন। কোনো অঙ্গ রোগগ্রস্ত হলে বা কোনো বিশেষ রোগ থাকলে সে ব্যাপারে বেশি সময় দিন।

নিয়মমাফিক মনের বাড়ি ও পরে হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করুন। প্রথমে চেয়ারে আরাম করে বসুন। তারপর আপনার বাথটাবে উষ্ণ বা ঠান্ডা স্ফটিক স্বচ্ছ পানিতে নিজের শরীর আস্তে আস্তে ডুবিয়ে গা এলিয়ে বসুন। পানিতে অনুভব করুন আপনার প্রিয় সুগন্ধি মিশ্রিত রয়েছে। গন্ধকে পুরোপুরি উপলব্ধি করুন। অনুভব করুন স্রোতের মতো পানি আপনার গা বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। অনুভব করুন ঠান্ডা বা উষ্ণ পানির পরশে চমৎকার এক আমেজ সৃষ্টি হয়েছে আপনার শরীরে।

আপনি একে একে সচেতন হয়ে উঠছেন নিজের শরীর সম্পর্কে। অনুভব করুন- কত দুর্লভ কারিগরি উৎকর্ষের প্রতীক আপনি। অনুভব করুন- কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে ১০ লক্ষ গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন এক কম্পিউটার অর্থাৎ ব্রেনের মালিক আপনি। ভিজুয়ালাইজ করুন প্রতি সেকেন্ডে ১ থেকে ১০ লক্ষ কেমিক্যাল রি-অ্যাকশনের মাধ্যমে ব্রেন আপনার মনোদৈহিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, আপনার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাচ্ছে। আপনার প্রতিটি কাজের সাফল্য ব্রেনের সূক্ষ্ম ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার ওপরই নির্ভর করছে।

অনুভব করুন, আপনার ব্রেন আপনার জন্যে কত মূল্যবান এক সম্পদ! এবার ভিজুয়ালাইজ করুন আপনার ব্রেনের দশ হাজার কোটি নিউরোন সেলসহ ব্রেনের সেরিব্রাম, সেরিবেলাম, ব্রেন স্টেম, মেডুলা, থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাসসহ সমগ্র ব্যবস্থা সুন্দর ও সুচারুরূপে কাজ করছে।

..... (বিরতি).....

এবার নিজের চোখের দিকে তাকান। চারদিকে প্রকৃতির যত রঙ রূপ আপনি দেখছেন, তা সবকিছুই সম্ভব হচ্ছে এই চোখের কারণে। এবার অনুভব করুন দৃষ্টিশক্তি না থাকলে আপনার কী অবস্থা হতো। অন্ধলোকের কষ্ট অনুভব করুন। দৃষ্টিশক্তি থাকায় আপনি কতখানি ভাগ্যবান তা নিজেকে বলুন।

এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করুন এই অমূল্য দুটি চোখের যত্ন কি পুরোপুরি নিচ্ছেন আপনি? যদি না নিয়ে থাকেন, তবে প্রতিজ্ঞা করুন এখন থেকে ঠিকভাবে যত্ন নেবেন। এবার দেখুন রেটিনা ও অপটিক নার্ভসহ চোখের সবকিছু ঠিকভাবে কাজ করছে, চোখের প্রেসার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে।

..... (বিরতি).....

এবার কানের প্রতি মনোযোগ দিন। কান কত গুরুত্বপূর্ণ অনুভব করুন। বিপদ সম্পর্কে কান কী কী ভাবে আপনাকে সতর্ক করে দেয়, তা ভাবুন। অনুভব করুন আপনার জন্যে কান কত মূল্যবান। কান না থাকলে প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর, সুমধুর গানসহ কোনো আওয়াজই শুনতে পেতেন না।

এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি কি কানের যত্ন ঠিকভাবে নিচ্ছেন? যত্ন ঠিকভাবে নিয়ে না থাকলে প্রতিজ্ঞা করুন এখন থেকে ঠিকভাবে যত্ন নেবেন।

এবার অবলোকন করুন কানের প্রতিটি অঙ্গ ঠিকভাবে কাজ করছে।

..... (বিরতি).....

এবার নাক ও ফুসফুসের দিকে তাকান। নাক দিয়ে দম নিয়ে ফুসফুসে পাঠাতে পারছেন বলেই আপনি বেঁচে আছেন। দম বন্ধ আপনিও শেষ। দেহের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাবার অক্সিজেন রক্তে যাচ্ছে ফুসফুসের মাধ্যমেই। আপনি এই ফুসফুসের ক্ষমতা কতটুকু ব্যবহার করছেন? ভালোভাবে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন। দিনে মাঝে মাঝেই কি আপনি লম্বা দম নিচ্ছেন? বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার যে পদ্ধতি আপনি শিখেছেন, তার কতটুকু আপনি চর্চা করছেন? ধূমপান বা নেশা করে কি আপনি ফুসফুসের বারোটা বাজাচ্ছেন? ভালোভাবে চিন্তা করুন।

এবার দেখুন সকল অনিয়ম বর্জন করেছেন। ভিজুয়ালাইজ করুন ব্রঙ্কিয়াল টিউব ও ফুসফুস যথাযথভাবে কাজ করছে।

..... (বিরতি).....

এবার চোয়াল, জিহ্বা ও দাঁতের প্রতি মনোযোগ দিন। মুখের সৌন্দর্য ও হজমের জন্যে এগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। সরেজমিনে এগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। ইতঃপূর্বে ঠিকমতো যত্ন না নিয়ে থাকলে এখন যথাযথ যত্ন নেয়ার প্রতিজ্ঞা করুন। দেখুন জিহ্বা ও মুখমণ্ডলের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থিগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে। দাঁতের মাড়ি ঠিকঠাক আছে।

..... (বিরতি).....

এবার মেরুদণ্ডের দিকে তাকান। কত দুর্লভ গুণের অধিকারী এই মেরুদণ্ড! আপনার মেরুদণ্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই আপনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন। আর কোনো প্রাণীই তা পারে না। অবলোকন করুন মেরুদণ্ড যথাযথভাবে কাজ করছে।

..... (বিরতি)....

এবার হার্ট, শিরা ও ধমনীর দিকে তাকান। অনুভব করুন হার্টের কার্যক্রম আপনার শরীরের জন্যে কত গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন হার্ট, শিরা, ধমনী সব যথাযথভাবে কাজ করছে।

..... (বিরতি).....

এবার লিভার, গলব্লাডার, প্যানক্রিয়াস ও পাকস্থলীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। অনুভব করুন আপনার পাকস্থলীতে তৈরি এসিড কত শক্তিশালী, যা খাবার তো খাবার, লোহার টুকরোকেও গলিয়ে হজম করে ফেলতে পারে। ভিজুয়ালাইজ করুন লিভার প্যানক্রিয়াস ও পাকস্থলী যথাযথভাবে কাজ করছে।

..... (বিরতি)....

এবার কিডনি, মূত্রাশয়, অন্ত্র, বৃহদান্ত্র, মলাশয়ের প্রতি মনোযোগ দিন। এগুলো ঠিকভাবে কাজ না করলে কী অবস্থা হতো তা একবার ভাবুন। আপনাকে পুরোপুরি সুস্থ রাখার প্রক্রিয়ায় এই অঙ্গগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। ভিজুয়ালাইজ করুন এই অঙ্গগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে।

..... (বিরতি).....

এবার হাতের প্রতি মনোযোগ দিন। হাতের প্রতিটি পেশি, হাতের তালু ও আঙুলের প্রতি মনোযোগ দিন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন। ত্বকের অবস্থা, নখের অবস্থা। তালুর রঙ দেখুন। অনুভব করুন হাত আপনার জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ। হাত ছাড়া মস্তিষ্কের প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবায়নে বা কোনো কাজ সুসম্পন্ন করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন হাত, নখ, ত্বকের যত্ন আপনি কি ঠিকভাবে নিচ্ছেন? না নিয়ে থাকলে নিজের কাছে ওয়াদা করুন এখন থেকে ঠিকভাবে যত্ন নেবেন।

..... (বিরতি).....

এবার নিজের পায়ের প্রতি নজর দিন। ভালো করে দেখুন, পা না থাকলে আপনি জীবনের গতি হারিয়ে ফেলতেন। ইচ্ছেমতো যাওয়া-আসা করতে পারতেন না। উরু, হাঁটু, পা, গোড়ালি, পায়ের পাতা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, পায়ের যত্ন কি আপনি পুরোপুরি নিয়েছেন? যদি না নিয়ে থাকেন তবে নিজের কাছে ওয়াদা করুন এখন থেকে ঠিকমতো যত্ন নেবেন।

..... (বিরতি).....

শরীরের কোনো অঙ্গ রোগগ্রস্ত হলে বা বিশেষ কোনো অসুখ থাকলে, সে অসুখের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কল্পচিত্র তৈরি করুন এবং সময় নিয়ে তাতে নিরাময়ের জন্যে মনোনিবেশ করুন। প্রয়োজনে হিলিং সেন্টারে অবস্থিত ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

..... (বিরতি).....

পুরো শরীর মিলিয়ে এবার অনুভব করুন শরীর কত জটিলভাবে নির্মিত কিন্তু কত সহজে ব্যবহারযোগ্য। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কত মূল্যবান। অনুভব করুন, আপনি দেহরূপী কত মূল্যবান সম্পদের অধিকারী। নিজের কাছে ওয়াদা করুন, মূল্যবান ধনরত্নের যেভাবে যত্ন নেয়া হয়, দেহের ব্যাপারেও সেভাবে আপনি যত্ন

নেবেন।

..... (বিরতি).....

এবার অনুভাব করুন পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া ও যত্ন নেয়ার আশ্বাস দেয়ার সাথে সাথে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং শরীরের মধ্যে অবস্থিত সকল রোগ-জীবাণুকে নির্মূল করে দিচ্ছে। দেখুন শরীরের জন্যে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর সবকিছুকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে।

আর কোনো রোগ না থাকলে দেখুন দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত সজাগ থেকে পাহারা দিচ্ছে এবং কোনো রোগ-ব্যাধি দেহে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে না। দেখুন আপনি পরিপূর্ণ সুস্থ। দেখুন আপনি যেমন চান তেমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেহ ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছেন।

..... (বিরতি).....

এরপর আপনি নিয়মমাফিক ০-১-২-৩ গুণে মনের বাড়ির ড্রইংরুমে গিয়ে বসুন। নিয়মমাফিক ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

হিলিং মেডিটেশন-২

হিলিং সেন্টারে আপনার দেহ অবলোকন প্রক্রিয়া শেষ করে অথবা হিলিং সেন্টার থেকে সরাসরি ডান দিকের বারান্দা দিয়ে বাইরে আসুন। সুন্দর দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকুন। নুড়ি বিছানো পথ। দুপাশে চমৎকার পলাশ, শিমুল, বকুল গাছের সারি। চমৎকার বসন্তের দখিনা হাওয়া ও হালকা সোনা রঙা রোদ। গাছের পাতার দুলুনিতে রোদ ছায়া চমৎকার খেলা করছে।

..... (বিরতি).....

পথ নানা দিকে গেলেও আপনি শুধু হাতের ডান দিকে যে রাস্তা গিয়েছে সেদিকেই যান। এবার আপনি প্রবেশ করছেন এক স্বর্গীয় বাগানে। ফুলের নানা রঙ ও গন্ধ উপভোগ করুন। একটা একটা করে পাপড়ি স্পর্শ করুন। প্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ করুন। পাখির কলতান শুনুন।

এবার একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে এর বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন। এর সাথে আপনার সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের কতটুকু মিল আছে দেখুন।

..... (বিরতি).....

এবার নিজেকে একটা বীজ হিসেবে কল্পনা করুন। দেখুন একজন চাষী আপনাকে চমৎকার মাটিতে এক ইঞ্চি নিচে বপন করেছে। আপনি অনুভব করুন মাটির আর্দ্রতা ও সূর্যের তাপ ও উষ্ণতা। আপনি বীজ থেকে

বেরিয়ে গাছে পরিণত হোন। দেখুন আপনি বীজ থেকে বেরিয়ে আসছেন। গাছে পরিণত হচ্ছেন। গাছ বড় হচ্ছে। আপনি পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হচ্ছেন।

..... (বিরতি).....

এবার সামনে দেখুন এক মনোরম দিগন্ত বিস্তৃত লেক। একটা সুন্দর নৌকা ঘাটে বাঁধা। উঠে বসুন নৌকায়। দখিনা বাতাসে নৌকা লেকে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাসতে ভাসতে মাঝ বরাবর চলে এসেছে। এবার দেখুন নৌকায় রয়েছে কাগজ ও পেন্সিল। কাগজ ও পেন্সিল হাতে নিন। লিখতে থাকুন আপনার সমস্যার কথা। আপনার জীবনে কী কী দ্বন্দ্ব রয়েছে, সংঘাত রয়েছে, দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কী কী অসুবিধা রয়েছে সব লিখুন।

..... (বিরতি).....

এবার লেখা কাগজগুলো দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিন লেকের পানিতে। দেখুন পানিতে কাগজ গলে যাচ্ছে। কাগজ গলে গিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। আপনার নৌকা সেখান থেকে সরে যাচ্ছে দূরে। অনুভব করুন সমস্যাগুলোকে নৌকা থেকে নামিয়ে ফেলে দেয়ার পর নৌকা ও আপনি কত হালকা হয়ে গেছেন। নৌকার গতিও কত বেড়ে গেছে। কত প্রশান্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন আপনি। মনের আনন্দে নৌকায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আস্তে আস্তে তীরের দিকে আসুন।

..... (বিরতি).....

নৌকা এসে ঘাটে লেগেছে। নৌকা থেকে নামুন। সমস্যার বোঝামুক্ত হয়ে আপনি অনেক হালকা এখন। এবার শান বাঁধানো ঘাটে বকুল তলায় বসুন। আরাম করে গা এলিয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে শুয়ে পড়ুন। প্রেমের বাঁশি বাজাতে বাজাতে নিজের দেহকে প্রেমে পরিপূর্ণ করুন। দেহের প্রতিটি কোষ খুলে তা প্রেম দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন।

..... (বিরতি).....

এবার নিজেকে ভালোভাবে দেখুন। আপনার যতটুকু প্রেম ও মমতা প্রয়োজন নিজেকে দিন। নিজের দেহের প্রতিটি অঙ্গে এক এক করে কান লাগান। শুনুন কোন অঙ্গ মমতা চাচ্ছে, স্নেহ চাচ্ছে, আদর চাচ্ছে। যে চাচ্ছে তাকে একটু অতিরিক্ত দিন। নিশ্চিত হোন প্রতিটি জীবকোষকেই আপনি পর্যাপ্ত প্রেম ও মমতা দিয়েছেন। অনুভব করুন সারা শরীরে নিরাময়ের একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে।

..... (বিরতি).....

আপনি অনুভব করছেন যে, আপনার শরীরে নিরাময়ের একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে। এবার মনে মনে তিনবার

কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করুন।

অনুভব করুন আপনার নিরাময় সম্পন্ন হচ্ছে।

..... (বিরতি).....

এবার প্রশান্ত মনে হাঁটতে হাঁটতে মনের বাড়ির দিকে আসুন। দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করুন। হিলিং চেয়ারে আরাম করে বসুন।

..... (বিরতি).....

০-১-২-৩ গুণে মনের বাড়ির ড্রইংরুমে প্রবেশ করুন। আরাম করে বসুন।

নিয়মমাফিক ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় চলে আসুন।

নিরাময়ের জন্যে নিয়মিত প্রার্থনা

নবীজী (স) বলেছেন, প্রতিটি রোগের নিরাময় রয়েছে। নিরাময়ের জন্যে ওষুধ ছাড়াও দোয়ার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই নিজের ও অন্যের সুস্বাস্থ্য ও নিরাময়ের জন্যে, জীবনদৃষ্টি ও জীবনধারা পরিবর্তনের জন্যে পরম করুণাময়ের কাছে নিয়মিত প্রার্থনা করুন।

দোয়া বা প্রার্থনার গুরুত্ব সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. ল্যারি ডসি বলেছেন যে, প্রার্থনা ও বিজ্ঞান আলাদা কিছু নয়। তার সাম্প্রতিক বই 'প্রেয়ার ইজ গুড মেডিসিনে' তিনি নিরাময়ে প্রার্থনা ও দোয়ার ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে পরিচালিত বহু গবেষণা রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

রিপোর্টে দেখা গেছে, যে হৃদরোগীদের জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে, তাদের গড়পড়তা নিরাময় প্রার্থনা ছাড়া রোগীদের চেয়ে অনেক ভালো। তিনি বলেন, 'প্রার্থনা হচ্ছে চেতনার শক্তিকে বহির্গামী করা। আমরা আগে স্বীকার করতাম না যে, আমাদের চিন্তা ও চেতনা আমাদের মস্তিষ্ক বা শরীরের বাইরে কাজ করতে পারে। কিন্তু অন্যের ব্যাপারে প্রার্থনার কার্যকারিতা এখন এক প্রমাণিত বিষয়। এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে এটি হচ্ছে এক যুগান্তকারী সংযোজন। ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল কলেজে নিরাময়ে আধ্যাত্মিকতা প্রয়োগের কোর্স চালু হয়েছে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আত্মিকায়ন সম্পন্ন হবে।'

তাই হিলিং সেন্টারে নিরাময়ের মনছবি দেখার পর দ্রুত নিরাময় লাভের জন্যে আপনি আপনার ধর্মবিশ্বাস অনুসারে প্রার্থনাও করতে পারেন।

অধ্যায়-১৯

মেদ-ভুঁড়ি : ওজন নিয়ন্ত্রণ

বাড়তি মেদ কি আপনার জন্যে সমস্যা? আপনার ওজন কি বেশি? আপনি কি দেখতে স্থূলকায়? বাড়তি ওজনের ফলে কি আপনার চলাফেরা ও কাজকর্মে অসুবিধা হচ্ছে? আপনি কি খুব ভোজনবিলাসী? উচিত নয় জেনেও কি আপনি মজাদার খাবারের লোভ সংবরণ করতে না পারায় দিন দিন মোটাই হয়ে চলছেন? আপনার ওজন বৃদ্ধির কারণ কি অতিরিক্ত পানাহার, না ঠিকমতো ব্যায়াম না করা? অথবা ব্যায়াম করার পরও কি আপনার ওজন কমছে না? ডায়েটিং ও ব্যায়াম করার পর ২/৩ কেজি ওজন কমার পরই কি কয়েকদিনে আপনার ৩/৪ কেজি ওজন বেড়ে যায়?

অবশ্য আপনার ওজন বাড়ার কারণ অতিভোজন না হয়ে ক্ষতিকর খাবার গ্রহণ করার প্রবণতাও হতে পারে। এজন্যে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন চমৎকার ফল নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু খাবার কমানো বা খ্যাদ্যাভাস পরিবর্তন নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। শুধুমাত্র ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করে এক্ষেত্রে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা খুব কম। তবে মনছবি প্রয়োগ করে আপনি এক্ষেত্রেও অসাধ্য সাধন করতে পারেন।

খাবারের ব্যাপারে আমাদের সাধারণ ধারণা একেবারে অবৈজ্ঞানিক। আমরা যাকে স্ট্যান্ডার্ড খাবার তালিকা বলি, তেমন স্ট্যান্ডার্ড খাবার বলে কিছু নেই। প্রত্যেক মানুষের খাবারের স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারিত হয় তার দেহ-মনের কোয়ান্টাম লেভেল থেকে।

যে কারণে একজন প্রচুর খেয়েও শরীরে মেদ জমাতে পারে না, আরেকজন পানি খেয়েও মেদ বাড়িয়ে ফেলে। অবচেতনে তথ্যের পুনর্বিন্যাস দ্বারা একজন মানুষ খুব কম খেয়েও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন। যেমন আমাদের দেশের সত্যিকারের দরবেশ-ঋষিরা করেছেন। আমাদের দেহ-মন প্রক্রিয়া আসলে পরিবেশ ও প্রয়োজনের সাথে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

মেক্সিকোর উত্তর সনোরায় বসবাসরত তারাহুমারা উপজাতির কথাই ধরা যাক না। সমুদ্র থেকে উঁচু পার্বত্য এলাকায় তাদের বাস। অনুর্বর জমিতে কিছুই চাষ করা যায় না ভুট্টা ছাড়া। এক বছরে তাদের খাবারের পরিমাণ হচ্ছে ১০০ কিলো কর্ন। সবজির পরিমাণ খুবই কম। গোশত খাওয়া হয় বছরে ২/১ দিন 'শিন্নির' মতো।

তারপরেও তারা ২৫ থেকে ৫০ মাইল দৌড়াতে পারে। প্রতি সপ্তাহে পুরো গোত্রকেই একবার ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিতে হয়। দৌড়ালে হার্ট রেট বাড়ে। কিন্তু এই ম্যারাথনে বিজয়ীর হার্ট রেট দৌড়ের ২ মিনিট পরে

পরীক্ষা করে দেখা গেল, হার্ট রেট কমে গেছে। তাদের সাধারণভাবে কোনো অসুখ-বিসুখ ছিল না। তাদের মন-দেহ প্রক্রিয়া চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল এই তথাকথিত 'সাব-স্ট্যান্ডার্ড ডায়েটে'র সাথে।

এরপর পাশ্চাত্যের সভ্য মানুষদের পাল্লায় পড়ার সাথে সাথে তাদেরকে দেয়া হলো ভিটামিন, মিনারেল ও প্রোটিন সমৃদ্ধ স্ট্যান্ডার্ড খাবার। এক বছরের মধ্যেই তাদের মধ্যে মহামারি আকারে হাইপারটেনশন, হৃদরোগ, চর্মরোগ, দন্তরোগ, এলার্জি ইত্যাদি দেখা দেয়। আর এ ব্যাধিগুলোর কোনোটিরই অস্তিত্ব তাদের মধ্যে ছিল না। তাই খাবারের যে-কোনো পরিবর্তনে অবচেতন মনে তথ্যের পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডা. দীপক চোপড়া তার 'কোয়ান্টাম হিলিং' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ওজন নিয়ন্ত্রণে খাবার ও অবচেতন মনে তথ্যের পুনর্বিন্যাস যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি খাবারের সময় নির্ধারণও জরুরি। কী খাবেন তা যেমন আপনি ঠিক করবেন, ঠিক তেমনি কখন খাবেন, তা-ও আপনাকে নির্দিষ্ট করতে হবে। একই পরিমাণ খাবার সকালে খেলে ওজন কমবে এবং সেই পরিমাণ খাবার রাতে খেলে ওজন বাড়বে। এর কারণ হচ্ছে, খাওয়ার পঞ্চম থেকে সপ্তম ঘণ্টায় হজম প্রক্রিয়া তুঙ্গে পৌঁছায়। রাতে ভুরিভোজ করলে খাবার হজম হয়ে উৎপাদিত শক্তি রক্তে এসে পৌঁছার সময় আপনি থাকেন ঘুমিয়ে। তখন সে শক্তি খরচ না হয়ে তা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে জমে থাকে শরীরে। তাই ডায়েট বিশেষজ্ঞ ডা. পল রোয়েন ৩০ বছর গবেষণার পর বলেছেন, 'রাতে ভুরিভোজ হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং হঠাৎ মৃত্যুর জন্যে এক আদর্শ ব্যবস্থা।'

ডা. পল রোয়েন খাবার নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তিনি সকালে ও রাতে খাবারের ফলাফলের বর্ণনায় একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে সাত জন স্বেচ্ছাসেবক সকালে নাস্তায় ২০০০ ক্যালোরি খাবার গ্রহণ করার পর দেখা যায় যে, তাদের ওজন কমে গেছে। আবার এই সাত জনই যখন রাতে ২০০০ ক্যালোরি খাবার গ্রহণ করে তখন দেখা যায় যে, তাদের ওজন কমার পরিবর্তে বেড়ে গেছে।

তাই কখন খাচ্ছেন, তা কী খাচ্ছেন-এর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে একটা চমৎকার প্রবাদ আছে-নাস্তা করো রাজার মতো, দুপুরে খাও রাজপুত্রের মতো আর রাতে খাও ভিখারীর মতো। ডা. পল রোয়েন তাই পরামর্শ দিয়েছেন-

১. সকালে ভরপেট নাস্তা করুন।

২. দুপুরে তৃপ্তির সাথে খান।

৩. রাতে হালকা খাবার গ্রহণ করুন।

এটাই হচ্ছে খাবার গ্রহণের স্বাস্থ্যসম্মত পন্থা। আর কী পরিমাণ খাবার খাবেন, তা নির্ধারণ করবে আপনার পাকস্থলীর আয়তন। আর পাকস্থলী কতটুকু খাবারে পূর্ণ করবেন, সে ব্যাপারে নবীজী (স)-এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, তুমি তোমার পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ খাবার এবং এক তৃতীয়াংশ পানিতে

পূর্ণ করো। আর বাকি এক তৃতীয়াংশ ফাঁকা রাখো।

খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম পালন করে মনের তথ্যভাণ্ডার পুনর্বিন্যাস করলে আপনি যেমন দেহ চান ঠিক তেমন দেহেরই অধিকারী হতে পারবেন।

অতিভোজন বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্যে আপনি প্রথম প্রত্যয়ন রচনা করুন। প্রথমে বর্তমান অবস্থার বিবরণ লিখুন। ওজন কত? কী কী খান? কী কী খাওয়া পছন্দ করেন তার তালিকা তৈরি করুন। কেন আপনি ওজন কমাতে চান বা কেন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে চান তার কারণগুলো এক এক করে বিস্তারিত লিখুন।

কত ওজন কমাতে চান তা লিখুন। মেদ আপনার স্বাস্থ্য হানির কতটা কারণ তা লিখুন। অথবা আপনি কি শুধুমাত্র আকর্ষণীয় হওয়ার জন্যে স্লিম হতে চাচ্ছেন? কী কারণে আপনি খাবার নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করুন। তাহলেই অবচেতনের তথ্যভাণ্ডারকে আপনি পুনর্বিন্যস্ত করতে পারবেন। আর মনকে বোঝাতে পারলেই আপনার খাবার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সফল হবে।

মেডিটেশন : খাবার নিয়ন্ত্রণ

১. নিয়মমাফিক 'আরাম প্রক্রিয়ায়' মনের বাড়ির ড্রইংরুমে বসুন।

২. ৩-২-১-০ গণনা করে হিলিং সেন্টারে যান।

৩. এবার ওজনের ব্যাপারে আপনার মনছবি মনিটরে দেখুন। আপনার ওজন কমিয়ে দেহকে যে অবস্থায় নিয়ে যেতে চান তার ছবি দেখুন। ওজন কমলে আপনাকে কেমন লাগবে তা ভিজুয়ালাইজ করুন, অনুভব করুন। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে নতুন যে খাবার খেতে চাচ্ছেন, সেগুলো খুব ভালোভাবে ভিজুয়ালাইজ করুন এবং নিজেকে বলুন এটুকু খেলেই আমার চলে যাবে। মনকে বলুন ও অনুভব করুন, নির্ধারিত খাবার খেলে আর আপনার ক্ষুধা লাগবে না। (যে খাবারগুলো আপনি বর্জন করতে চান, এক এক করে স্ক্রিনে এনে ক্রস চিহ্ন দিয়ে বাতিল করে দিন অথবা তা এমন আজেবাজে জিনিস হিসেবে কল্পনা করুন, যেন তা খেতে নিলেই আপনার বমি ভাব চলে আসে)। আপনার ওজন কমে গিয়ে নির্ধারিত ওজন এসে দাঁড়িয়েছে তা অবলোকন করুন। (বাস্তবে এরকম সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠলে আপনার মনে যে আনন্দানুভূতি হতো, তা সবগুলো ইন্দ্রিয় ও পূর্ণ আবেগ দিয়ে অনুভব করুন। পূর্ণ আবেগ দিয়ে আপনার সাফল্যের অনুভূতির সাথে সবকিছুকে সম্পৃক্ত করুন।) নিয়মমাফিক প্রথমে হিলিং সেন্টার এবং পরে মনের বাড়ি থেকে ফেরত আসুন।

৪. শরীরের ওজন কমানোর ক্ষেত্রে সবসময়ই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং ধাপে ধাপে লক্ষ্যপানে অগ্রসর হোন। এক নাগাড়ে ৪০ দিন অনুশীলনী অব্যাহত রাখুন। প্রয়োজনে সময় বাড়িয়ে দিন। আপনার ওজন সুনিশ্চিতভাবে হ্রাস পাবে। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে আপনি অবশ্যই সফল হবেন। আর ওজন বাড়াতে চাইলে ঠিক

এর উল্টোটা করুন।

অধ্যায়-২০

ধূমপান ও ড্রাগ বর্জন

পাশ্চাত্যের যে কয়েকটি বদভ্যাস প্রাচ্যকে আচ্ছন্ন করেছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে ধূমপান। ধূমপানকে একসময় মনে করা হতো স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে। অবশ্য ধূমপানের কুফল সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর পাশ্চাত্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমে এলেও প্রাচ্যে এখনো এই বদভ্যাস পুরোদস্তুর বিদ্যমান রয়েছে।

এমনকি অনেকে আছেন ধূমপানের অপকারিতা বা ধূমপান ত্যাগের পদ্ধতি সম্পর্কে লম্বা বক্তৃতা দেয়ার পরই পকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন ধরিয়ে সুখটান দিয়ে ঘরময় ধুঁয়ো ছড়িয়ে দেন।

অবশ্য বাংলাদেশে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে ধূমপান বিরোধী আন্দোলন 'আধূনিক' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এখন ধূমপানকে আর স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এখন ধূমপানকে সামাজিকভাবে একটা গর্হিত কাজ বলে বিবেচনা করা হয়।

আন্দোলন ও সচেতনতার ফলে এখন অনেক জনাকীর্ণ স্থানকে ধূমপানমুক্ত স্থান করা হয়েছে। ব্যক্তিগত বহু অফিসে এখন আর ধূমপান করা হয় না।

সচেতনতার ফলে অনেকে নিজে নিজেই ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। আবার অনেকে ছাড়তে চাচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না। হয়তো কয়েক ঘণ্টা ধূমপান বন্ধ রেখে আবার শুরু করে দেন বা কয়েকদিন পর আবার পুরনো অভ্যাসে প্রত্যাবর্তন করেন অনেকে।

মোট কথা হলো, ধূমাপায়ীদের একটা বড় অংশ ধূমপান ছাড়তে চান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেন না। অভ্যাসের কাছে তাদের ইচ্ছাশক্তি সবসময়ই পরাভূত হয়। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেও আপনি মনছবি ব্যবহার করতে পারেন।

ধূমপান ছাড়ার জন্যে প্রথমে প্রত্যয়ন রচনা করুন। প্রথমে ধূমপানের ব্যাপারে আপনার সামগ্রিক পরিস্থিতি বর্ণনা করুন। অর্থাৎ কোন ব্র্যান্ড সিগারেট খান, দিনে কতটা খান, কখন কখন খান তা লিখুন।

পরে কী কী কারণে আপনি ধূমপান ত্যাগ করতে চান তা লিখুন। ব্যক্তিগত, স্বাস্থ্যগত, সামাজিক প্রতিটি কারণই বিস্তারিতভাবে লিখুন।

তারপর প্রত্যয়ন লিখুন, 'আমি ধূমপান পুরোপুরি ছেড়ে দিতে চাই।' কারণ মনে রাখবেন, ধূমপান নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ দিনে চারটা বা পাঁচটা সিগারেট খাওয়ার মধ্যে ধূমপান নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভব নয়। আপনাকে তা পুরোপুরি

ছাড়তে হবে। কারণ ধূমপান ত্যাগ করা আর পুনরায় শুরু করার মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটা সিগারেট।

ধূমপান ত্যাগ : পদ্ধতি-১

১. নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ির ড্রইংরুমে বসুন।

২. ৩-২-১-০ গণনা করে হিলিং সেন্টারে যান। আরাম করে চেয়ারে বসুন।

৩. এবার আপনার ধূমপান সংক্রান্ত চিত্র পর্যালোচনা করুন। একে একে দেখুন ধূমপান করার ফলে আপনার শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। দৈহিক ও মানসিক ক্ষতিপূরণের জন্যে যা করতে হবে, তা নিজেকে বলুন।

ধূমপান কীভাবে ফুসফুসের ক্ষতি করছে তা অবলোকন করুন। দেখুন ধোঁয়ার সাথে সাথে একটা বিষাক্ত সাপ গিয়ে ফুসফুসে ছোবল মারছে, আর নিকোটিন নামক বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা শরীরে। ক্ষতিকর দিকগুলোকে খুব স্পষ্ট করে ভিজুয়ালাইজ করুন। (মনকে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো পুরোপুরি বোঝাতে যে ধরনের কল্পনা বা ছবি ব্যবহার করা প্রয়োজন মনে করেন, সেভাবে নিজের ইচ্ছেমতো ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করুন।)

তারপর দেখুন এ থেকে বাঁচার জন্যে আপনি ধূমপান ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। ছেড়ে দেয়ার ফলে আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় নি। বরং আপনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

নিকোটিনের প্রভাব কেটে যাওয়ায় আপনার প্রাণপ্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে, চেহারায় এসেছে একটা আলাদা ঔজ্জ্বল্য। সিগারেটের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করায় আপনি ফেলেছেন স্বস্তির নিঃশ্বাস।

বাস্তবে এ ঘটনা ঘটলে যে আনন্দানুভূতি হতো, তা সবগুলো ইন্দ্রিয় ও পূর্ণ আবেগ দিয়ে অনুভব করুন। পূর্ণ আবেগ দিয়ে আপনার ধূমপান মুক্ত সত্তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন।

৪. নিয়মমাফিক হিলিং সেন্টার ও মনের বাড়ি থেকে ফেরত আসুন।

৫. একনাগাড়ে ৪০ দিন এ অনুশীলন করে যান। আপনি ধূমপানের অভিশাপ থেকে নিঃসন্দেহে মুক্তি পাবেন। কয়েকজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট প্রথম মেডিটেশনেই এতে সফল হয়েছেন। আর বেশিরভাগেরই ধূমপানের প্রতি আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে কয়েকদিনের মধ্যে। প্রয়োজনে অনুশীলনীর সময় বৃদ্ধি করুন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে ধূমপান ত্যাগে আপনি সফল হবেনই।

[একই পদ্ধতিতে মনছবি প্রয়োগ করে ড্রাগ বা এলকোহলের নেশা থেকেও মুক্তি পেতে পারেন।]

ধূমপান ত্যাগ : পদ্ধতি-২

১. ধূমপান ছাড়ার জন্যে বাস্তবে সবসময়ই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশের প্রয়োজন নেই। এজন্যে ইচ্ছে করাটাই যথেষ্ট।

২. অনেকেই সিগারেট ছাড়ার কথা ভেবে পকেটে সিগারেট রাখেন না। ভাবেন যে, থাকলেই খেতে ইচ্ছে করবে। এরা শুধু বুঝতে পারেন না যে, সাথে না থাকলে খাবার ইচ্ছেটা বেশি হবে। এ ব্যাপারে বাংলায় একটি প্রবাদ আছে যে, ঘরে চাল না থাকলে সেদিন ক্ষুধা বেশি লাগে। পকেটে সিগারেট না রাখলে দেখা যাবে যে, আপনি অন্যের কাছ থেকে সিগারেট নিচ্ছেন। তাই সিগারেট ম্যাচ পকেটেই রাখুন।

৩. আপনি শুধু খেয়াল রাখুন কখন আপনি সিগারেট ধরান। ধূমপানের ইচ্ছে এক একজনের মধ্যে এক একসময়ে জাগে। কেউ টেলিফোনে আলাপ করতে করতে সিগারেট ধরান, কেউ কোনো আলোচনার সূত্রপাতে, কেউ টিভি অন করার সময়, কেউ খাবারের পর পর, কেউ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে। এ সময়গুলোতে তিনি নিজের অনেকটা অজান্তেই সিগারেট ধরিয়ে ফেলেন। আপনি শুধুমাত্র অন্য কাজ করার সময় ধূমপান করা থেকে বিরত থাকুন। যদি সিগারেট ধরিয়ে ফেলার পর খেয়াল হয় যে, আপনি সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছেন, তাহলে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আপনি এখন সত্যি সত্যি সিগারেট খেতে চান কিনা।

৪. যদি সত্যি সত্যিই সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে অন্য সব কাজ বাদ দিয়ে চুপচাপ আরাম করে বসুন। চুপচাপ বসে সিগারেট খান। মনোযোগ দিয়ে সিগারেট খান।

৫. সিগারেট খাওয়ার সময় শরীরের প্রতি মনোযোগ দিন। চোখ বন্ধ করে সিগারেটে টান দিয়ে অবলোকন করুন, সিগারেটের ধোঁয়া নাক দিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে তা একটা গোখরা সাপের আকার ধারণ করছে। ফুসফুসে গিয়েই ফণা তুলে ছোবল মারছে আর ঢেলে দিচ্ছে নিকোটিন নামের বিষ। একটা বিষাক্ত সাপ ছোবল মারলে আপনার দেহ-মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি হতো ক্ষণিকের জন্যে সে অনুভূতি সৃষ্টি করুন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অনুভূতি না এলে সে অনভূতির অভিনয় করুন। (মনে করুন মঞ্চে নাটক করছেন। সে নাটকে আপনাকে অভিনয় করতে হচ্ছে সাপে আক্রান্ত পথিকের ভূমিকায়। আন্তরিকতার সাথে অভিনয় করলে সাপে ছোবল মারলে আপনার মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া যেভাবে ব্যক্ত করতেন, তা-ই করুন।) মনের চোখে নাক, মুখ, গলা, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলীর প্রতিক্রিয়া ভিজুয়ালাইজ করুন।

৬. পুনরায় সিগারেটে টান দিন। অবলোকন করুন আরেকটা গোখরা সাপ ফুসফুসের দিকে যাচ্ছে। পূর্বের প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করুন।

৭. এই পদ্ধতিতে সিগারেট খান। একটি কাগজ বা ডায়েরিতে আপনার সিগারেট খাওয়ার অনুভূতি লিখে

রাখুন।

৮. শুধু মনে রাখুন অন্যের সামনে বা অন্য কোনো কাজ করতে করতে সিগারেট খাবেন না। যখন সিগারেট খেতে ইচ্ছে করবে অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে নিরিবিলি বসে সিগারেট খাবেন এবং পুরো প্রতিক্রিয়া ডায়েরিতে লিখে রাখুন। প্রতিটি সিগারেট খাওয়ার অনুভূতি লিখে রাখুন।

৯. অচিরেই দেখবেন আপনার মন ও দেহ নিজ থেকেই সিগারেট প্রত্যাখ্যান করছে।

[ধোঁয়াজাতীয় ড্রাগে যাদের আসক্তি তারাও এই একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন। কখনো কারো সামনে ড্রাগ নেবেন না। নেয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগলে একা নিরিবিলি বসে উপরোক্ত নিয়মে নেশা দ্রব্যে টান দিন। একই ছবি অবলোকন করুন। পুরো অনুভূতি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করুন। আপনার শরীরই ড্রাগ প্রত্যাখ্যান করবে।]

এলকোহল বর্জন

এলকোহল, তরল বা ট্যাবলেট জাতীয় মাদকদ্রব্য বর্জনের ক্ষেত্রেও এই একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করুন। কোনো কাজ করতে করতে, কথা বলতে বলতে বা অন্যের সামনে বা কারো সাথে একত্রিত হয়ে মদ পান করা থেকে বিরত থাকুন। যখনই খাওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগে একই নিয়মে একা নিরিবিলি বসুন।

গ্লাসে করে এক চুমুক পান করুন। শুধু মনছবিটি পাল্টে দিন। নিজের দেহকোষগুলোকে ছোট ছোট শিশু হিসেবে ভিজুয়ালাইজ করুন এবং দেখুন মাদকদ্রব্য এসিডের মতো গিয়ে এই সুন্দর সুন্দর শিশুর মুখ ও শরীরকে গলিয়ে বিকৃত কদাকার করে দিচ্ছে... যত স্পষ্টভাবে সম্ভব কল্পনা করুন যে, মাদকদ্রব্য গিয়ে স্পর্শ করার সাথে সাথে এই ছোট ছোট সুন্দর নিষ্পাপ শিশুদের চেহারা ও শরীর এসিডে গলে বীভৎস হয়ে যাচ্ছে... যতবার গ্লাসে চুমুক দেবেন ততবারই এই দৃশ্য দেখতে থাকুন।

আপনার অনুভূতি সামনে রাখা কাগজ বা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করুন। প্রতিবার এলকোহল গ্রহণের সময় এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করুন। অচিরেই আপনার দেহ মাদকদ্রব্য প্রত্যাখ্যান করবে।

অধ্যায়-২১

সুস্বাস্থ্যের কোয়ান্টাম ভিত্তি

নবীজী (স) বলেছেন, সুস্বাস্থ্য স্রষ্টার সবচেয়ে বড় নেয়ামত। আর কয়েকটি ছোট ছোট পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা অনায়াসে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারি। সুস্বাস্থ্যের কোয়ান্টাম ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি। এই পাঁচটি ভিত্তিকে ব্যবহার করে আমরা অনায়াসে জীবনকে সুস্বাস্থ্যের নতুন ছন্দে ছন্দায়িত করতে পারি।

১. দম। দম হচ্ছে জীবনের মূল ছন্দ। এই দমই শরীরের বাকি সকল ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। সঠিক ও পরিপূর্ণ দম প্রতিটি জীবকোষকে প্রকৃতির ছন্দে ছন্দায়িত করে। আর বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার মাধ্যমেই আমরা পরিপূর্ণ দম নিতে পারি। বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে দিনে ৫ দফা ১৯ বার করে দম নিন।

বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার ক্ষেত্রে দম নাক দিয়ে নেবেন, বুক ফুলবে, মুখ দিয়ে ছাড়বেন। প্রথমবার ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম নিয়ে বুক ফোলাতে থাকুন। বুক পুরো ফুলে গেলে ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম ছেড়ে মনে মনে গুণুন এক। আবার একইভাবে দম নিয়ে দম ছেড়ে গুণুন দুই। এভাবে ১৯ পর্যন্ত গুণে দম নেয়া শেষ করুন।

সারাদিনে এরকম পাঁচ দফা দমের চর্চা করলে আপনার দেহের প্রতিটি কোষ পর্যাপ্ত অক্সিজেন লাভ করবে। আপনি প্রাণবন্ত ও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠবেন। বহুক্ষণ একনাগাড়ে কাজ করতে পারবেন। সহজে ক্লান্ত ও অবসন্ন হবেন না।

২. আহার। দমের পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আহার। সবসময় সুপাচ্য সহজ খাবার গ্রহণ করবেন। অতিরিক্ত মশলা, তেল, ঝাল ও ভাজাপোড়া বর্জন করবেন। খাবারের ব্যাপারে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, কী খাবেন? দ্বিতীয়ত, কতটা খাবেন, তৃতীয়ত, কখন খাবেন?

কী খাবেন? সবকিছু খাবেন। যা কিছু আপনার ধর্মবিশ্বাস ও আপনার রুচি অনুমোদন করে, তা সবই খাবেন।

কোয়ান্টাম খাবার

প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারই কোয়ান্টাম খাবার। দৈনন্দিন খাবার তালিকায় মাছ, গোশতের পরিমাণ সীমিত, ডাল পরিমিত এবং শাক-সবজি পর্যাপ্ত থাকা উচিত। বাঁধাকপি, ডাঁটা, লালশাক, পুঁইশাক, সজনে ও আঁশজাতীয় সবজি বেশি থাকা উচিত।

শীতকালে নিয়মিত পালংশাক, ব্রোকোলি ও গাজর খান।

পুষ্টির জন্যে নিয়মিত এক চা চামচ মধু, এক গ্লাস দুধ, একটি ডিম খান।

শাক-সবজি অতিরিক্ত সিদ্ধ না করে আধা সিদ্ধ খান। প্রতিদিন খাবারে সালাদ খান। সালাদে লেটুস, টমেটো, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, গাজর, শশা, রেড ক্যাবেজ, ক্যাপসিকাম ব্যবহার করুন।

নিয়মিত দই খান। তবে মিষ্টি দই খাবেন না। সাধারণ চিনি ছাড়া দই (ইয়োগার্ট) খাবেন।

প্রতিদিন খাবারে ডাল রাখুন। মসুর, মুগ, মাষকলাই, বুট, মটর, অড়হর ডাল এক সাথে মিশিয়ে রান্না করুন।

প্রতিদিন সকালে উঠে এক মুঠি ভিজানো কাঁচা ছোলা, এক টুকরো আদা ও এক চিমটি বিট লবণসহ খাওয়ার অভ্যাস করুন।

প্রতিদিন কমপক্ষে দেড় লিটার বা ছয় গ্লাস পানি পান করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

মৌসুমী ফল সবসময় পর্যাপ্ত খাওয়া উচিত। যে মৌসুমে যে ফল হয়, তা সে মৌসুমের রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। আম, কাঁঠাল, কলা, কুল, পেয়ারা, আমড়া, আনারস, চালতা, জাম্বুরা, আমলকি অর্থাৎ দেশীয় ফল প্রচুর পরিমাণে খাবেন। ফ্লু বা ভাইরাস জ্বরের আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই বাজারে আনারস চলে আসে। তখন পরিমিত আনারস খেলে ফ্লু আক্রমণ করার সুযোগ পায় না।

সেজন্যেই বলা হয়, মৌসুমের ফলের মধ্যেই মৌসুমের রোগের দাওয়াই রয়েছে। যাদের ঠান্ডা লাগার প্রবণতা বেশি তারা শীত আসার একমাস আগে থেকে প্রতিদিন একটি মাঝারি সাইজের জাম্বুরার অর্ধেক খেলে ঠান্ডা-সর্দি থেকে অনায়াসে রেহাই পেতে পারেন।

খাবারের ব্যাপারে বিশ্বের সচেতন মানুষেরা এখন প্রাকৃতিক খাবারের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন। পাশ্চাত্যে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ এখন টিনজাত, প্রক্রিয়াজাত ও পরিশোধিত খাবারের বদলে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক খাবারের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, 'প্রক্রিয়াজাত খাবার বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হচ্ছে।

তাই ময়দার পরিবর্তে লাল আটা খাবেন। চিনির পরিবর্তে গুড় খাবেন। দুধ-চায়ের পরিবর্তে গুড় দিয়ে হালকা রঙ-চা খাবেন। টিনজাত খাবার পুরোপুরি বর্জন করবেন। ফলের রসের পরিবর্তে টাটকা ফল খাবেন।

গুঁড়ো দুধ পুরোপুরি বর্জন করবেন। গরুর খাঁটি দুধ প্রত্যেক দিন এক গ্লাস করে খাবেন। হরলিক্স, ওভালটিন ইত্যাদি তথাকথিত পুষ্টিকর খাবার পুরোপুরি বর্জন করে পুষ্টির জন্যে নিয়মিত দুধ, কলা, ডিম খাবেন। মিষ্টি খাবেন না। বিশেষত রঙিন মিষ্টি পুরোপুরি বর্জন করবেন। কারণ খাবারে যে রঙ ব্যবহার করা হয়, তা ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

তথাকথিত কোমল পানীয় পান করবেন না। কারণ এই পানীয়ের মধ্যে নেশা রয়েছে। আর এই তথাকথিত কোমল পানীয় ডায়াবেটিস এবং কিডনি ও মূত্র ব্যাধির কারণ। কোমল পানীয়ের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে

আমাদের দেশের বিশিষ্ট কিডনি ব্যাধি বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার সিরাজ জিন্নাত ১৯৯৪ সালের বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের আলোচনা সভায় সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কোমল পানীয় আপনার কিডনি ও মূত্রাশয়ের জন্যে অত্যন্ত 'কঠিন' প্রমাণিত হতে পারে। তাই কোমল পানীয়ের পরিবর্তে সবসময় ডাব খাবেন। ডাবের পানিতে ১৯টি প্রাকৃতিক খনিজ দ্রব্য রয়েছে যা স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত উপকারী। ডাব পাওয়া না গেলে লেবু পানি খান।

কতটুকু খাবেন? সবসময় পরিমিত খাবার খাবেন। বেশি খেলে আপনার রোগ-ব্যাধি বেশি হবে। এ ব্যাপারে নবীজীর (স) একটি হাদিস আমরা অনুসরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন, তুমি তোমার পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাবার ও এক-তৃতীয়াংশ পানীয় দ্বারা পূর্ণ করো। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ ফাঁকা রাখো। দীর্ঘ নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এভাবে খাবার গ্রহণ করলে পাকস্থলীর ব্যাধি থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকা যায় এবং শরীরের ওজন সবসময় নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কখন খাবেন? সকালবেলা ভরপেট নাশতা করুন, দুপুরে তৃপ্তির সাথে খান এবং রাতে খুব হালকা খাবার গ্রহণ করুন।

৩. ব্যায়াম। আহারের পর আসে ব্যায়াম বা শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা। ব্যায়ামের মধ্যে যোগব্যায়াম বা কোয়ান্টাম ব্যায়াম হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম। এরপরই হচ্ছে হাঁটা। প্রতিদিন ২৫/৩০ মিনিট ব্যায়াম করা বা হাঁটা প্রয়োজন। হাঁটলে ঘণ্টায় চার মাইল গতিতে হাঁটতে হবে।

৪. হজম। যা খেলেন তা হজম হওয়া প্রয়োজন। খাবার হজম না হলে খেয়ে লাভ কী! আর হজমের সমস্যায় যারা ভোগেন তাদের কারণটা শারীরিক নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানসিক। কারণ পাকস্থলীতে যে এসিড উৎপন্ন হয় তাতে লোহা দিয়ে দিলে লোহা গলে হজম হয়ে যাবে।

এই এসিড এত শক্তিশালী যে, পাকস্থলী যাতে নিজেই হজম না হয়ে যায়, সেজন্যে প্রতি পাঁচ দিনে পাকস্থলীর আবরণ বদলে যায়। তাই খাওয়ার আগে সবসময় বলবেন, 'যা খাবো মজা করে খাবো, যা খাবো সব হজম হবে।' তাহলেই দেখবেন হজম খুব ভালো হচ্ছে।

৫. রেচন। শরীরের বর্জ্য বস্তু শরীর থেকে সবসময় বের করে দিতে হবে। শারীরিক সুস্থতার এটা হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তাই যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তারা প্রচুর শাক ও আঁশযুক্ত সবজি খাবেন। এতে অন্ত্রের ক্যান্সার থেকেও আপনি রেহাই পাবেন। আর পর্যাপ্ত পানি পান করবেন।

সবসময় স্বাভাবিক ঠান্ডা পানিতে গোসল করবেন। গরম পানিতে কখনো গোসল করবেন না। এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন ডা. কাক্কার। তিনি ১৯ বছরের গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, গরম পানিতে গোসল

করলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, আর ঠান্ডা পানিতে গোসল দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। শীতকালেও স্বাভাবিক ঠান্ডা পানিতে গোসল করা উচিত। পানি বেশি ঠান্ডা হলে তাতে কিছু গরম পানি মিশিয়ে পানির ঠান্ডা ভাবটা কমানো যেতে পারে। কিন্তু তারপরও খেয়াল রাখতে হবে যেন পানির তাপমাত্রা শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে কম থাকে।

সুস্বাস্থ্যের জন্যে এ পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করুন। আপনি এক প্রাণবন্ত শরীরের অধিকারী হবেন।

অধ্যায়-২২

নতুন জীবনের পথে

এক নতুন জীবন হাতছানি দিচ্ছে আপনাকে। আগের ২১টি অধ্যায়ে মোটামুটি চোখ বুলিয়ে গেলেও আপনি বুঝতে পারছেন কত বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এই পৃথিবীতে আপনার আগমন ঘটেছে। আপনি বুঝতে পারছেন কিছু সহজ স্বতঃস্ফূর্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেই আপনি প্রশান্তি পেতে পারেন, হতে পারেন সুস্বাস্থ্য আর প্রাচুর্যের অধিকারী। তাই ধাপে ধাপে বাস্তব পদক্ষেপ নিন। নিম্নের ধারাক্রম অনুসরণ করলে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় ঝর্নার গতিময়তা নিয়েই আপনি লক্ষ্যপানে অগ্রসর হবেন।

১. শিথিলায়ন শুরু করুন। শিথিল প্রক্রিয়া অনুসারে দিনে দুই বার শিথিলায়ন করুন। আপনি আপনার সুবিধামতো সময় বেছে নিন। শিথিলায়ন হচ্ছে কী হচ্ছে না, এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শুধুমাত্র ধাপে ধাপে যা আপনাকে কল্পনা, অনুভব বা অবলোকন করতে বলা হয়েছে, তা করে যান। যদিও বিছানায় শুয়ে শিথিলায়ন করা যায়, তবুও চেয়ারে বা যে-কোনো আসনে বসে শিথিলায়ন অভ্যাস করাই বেশি কার্যকরী। (অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে আধা ঘন্টা এক নাগাড়ে বসে থাকা যাদের জন্যে কষ্টকর তারা শুয়ে শিথিলায়ন করতে পারেন।) শিথিলায়নকালে দেহকে অনড় অচল রাখতে চেষ্টা করুন। মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। ঝিমুনি বা তন্দ্রা যেন আপনাকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

শিথিলায়নকালে কোনো ধরনের বিরক্তিকে প্রশ্রয় দেবেন না। অবাঞ্ছিত ও আজেবাজে চিন্তা এলে বিরক্ত হবেন না। অবাঞ্ছিত আওয়াজ, কথা বা শব্দের প্রতি মনোযোগ গেলে বা চুলকানি বা মশার কামড় বা কোনো শারীরিক আবেগ আপনার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটালেও বিরক্ত হবেন না। কেউ ডাকলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে শব্দ করলেও বিরক্ত হবেন না। আপনার কাজ হবে এসব অবাঞ্ছিত শব্দ, আওয়াজ বা অনুভূতিকে পাত্তা না দিয়ে নিজের ভাবনা বা অনুভবের মাঝে আবার মনোযোগ নিবদ্ধ করা। মেডিটেশনের প্রথম শর্ত হচ্ছে, শিথিল দেহ-মনে চেতনার নির্লিপ্ত সজাগ অবস্থা।

৪০ দিন একটানা দিনে দুই বার শিথিল প্রক্রিয়ায় শিথিলায়ন করুন। এরপর আরাম প্রক্রিয়ায় অনায়াসে শিথিলায়ন করতে পারবেন। অস্থিরতার পরিবর্তে ধীরে ধীরে দেহ-মনে এক প্রশান্ত অবস্থা সৃষ্টি হবে।

২. নিজের ওপর আস্থা স্থাপন করুন। কোনো ধরনের নেতিবাচক চিন্তা ও হীনম্মন্যতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা থাকলে মনের বাড়ি যাওয়ার পথে আলফা স্টেশনে গিয়ে সময় নিয়ে মনের বিষ দূর করুন। কোনো ধরনের ভয় আপনার মধ্যে বাসা বেঁধে থাকলে আলফা স্টেশনে গিয়ে তা লিখে টুকরো টুকরো করে

ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলুন। সকল আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম দূর করার জন্যে যা যা করা প্রয়োজন তা করুন। সবসময় অনুভব করুন, সভ্যতার সবকিছু মানুষের সৃষ্টি আপনিও একজন মানুষ। মানুষ যা পেরেছে, মানুষ যা পারবে, আপনার পক্ষেও তা পারা সম্ভব। এজন্যে আপনার চেহারা, আকার, উচ্চতা, রঙ, বংশ পরিচয় কোনো কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। শুধু প্রয়োজন মস্তিষ্করূপী মহা জৈব কম্পিউটারকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো।

৩. লক্ষ্য স্থির করুন। জীবনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলেই আপনার মস্তিষ্করূপী সুপার কম্পিউটার আপনাকে সেখানে পৌঁছানোর জন্যে দিনরাত কাজ করবে। তাই খুব ঠান্ডা মাথায় আপনার জীবনছবি বা জীবনের মনছবি করুন। অর্থাৎ পরিণত বয়সে আপনি আপনার পেশাগত, পারিবারিক, সৃজনশীল, সামাজিক অবস্থান কোথায় কীভাবে দেখতে চান, সেই মনছবি করুন। আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের এই স্বপ্নকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করুন। প্রতিদিন মেডিটেশনে মনছবির মাঝে নিমগ্ন হোন। আপনি যা চান তাকে ঘিরেই আপনার চিন্তা ও কল্পনাকে আবর্তিত করুন। নিজেকে যেখানে দেখতে চান, সেভাবে দেখুন। আপনার চারপাশে যা দেখতে চান, তার মাঝে নিজেকে দেখুন। আপনি যা চান মনের বাড়িতে তা পাওয়ার পর অনুভূতি কেমন হচ্ছে? আনন্দ? উল্লাস? পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা? পাওয়ার আনন্দে আপনার চোখে কি পানি চলে আসছে? আবেগ যেভাবেই আসুক তাকে অবলীলায় প্রকাশ পেতে দিন। আপনার মনছবি পঞ্চইন্দ্রিয় যোগে বাস্তব বলে মনে করুন। বাস্তবে তা পেলে আপনার যে অনুভূতি হতো, তা নিজের মধ্যে প্রকাশ পেতে দিন। মনে করুন, আপনি যা চেয়েছিলেন, তা পেয়ে গেছেন। মনে করুন, আপনার কল্পনা, স্বপ্ন বা জীবনছবি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ বাস্তবতাকে সত্য বলে গ্রহণ করুন। আপনার এই স্বপ্নগুলো বাস্তবায়িত হলে আপনি যে আনন্দানুভূতি দ্বারা প্লাবিত হতেন, সে আনন্দানুভূতি দ্বারা নিজেকে প্লাবিত করুন।

মনের বাড়ি থেকে আসার পরও আপনি সবসময় মনে করুন, আপনার কাজ হয়ে গেছে, আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে, আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করেছেন। সারাদিনে কখনো নিজেকে প্রশ্ন করবেন না যে, কখন, কোথায় ও কীভাবে সবকিছু হবে। কোনো ধরনের সন্দেহকে প্রশ্রয় দেবেন না। পুরো বিষয়টিকেই সত্য বলে বিশ্বাস করুন। আপনার জীবনছবিকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেই আপনার মস্তিষ্কে নতুন ডেনড্রাইট সৃষ্টি হবে, মস্তিষ্কের কর্মকাঠামো বদলে যাবে। নতুন বাস্তবতা সৃষ্টির জন্যে নীরবে কাজ করার প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। প্রয়োজনে কর্মপন্থা বদলে যাবে। ঝর্নার মতো গতিময়তা নিয়ে এগিয়ে যাবেন নতুন বাস্তবতার পথে।

৪. স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। মেডিটেশন শুরুর প্রথম দিন থেকেই বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার অনুশীলন করুন। নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিন। দম নেয়ার সময় মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। দম নেয়ার সময় ধীরে ধীরে বুক ফোলান। এরপর ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দিনে ৫/৭ দফা এভাবে দম নিন। প্রতি দফায় ১০ থেকে ২০ বার এভাবে দম নিন। আপনার ক্লান্তি অবসাদ দূর হয়ে যেতে থাকবে।

দম নেয়ার উপকারিতা আপনি পাবেন একেবারে হাতে হাতে। ব্যায়ামের অভ্যাস না থাকলে হালকা ব্যায়াম শুরু করুন। প্রথম দিন দশ মিনিট। আস্তে আস্তে প্রতিদিন ১/২ মিনিট করে সময় বাড়িয়ে ৪০ দিন পর এটিকে ৩০ মিনিটে উন্নীত করুন। ধীরে ধীরে কোয়ান্টাম খাবার বিধি অনুসরণ করুন। এ খাবার বিধি সর্বাধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের আলোকে তৈরি। প্রাকৃতিক খাবার ও পানীয় খান। বর্জনীয় খাবার ও কৃত্রিম পানীয়সমূহ আস্তে আস্তে বর্জন করুন। তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। তাহলেই ধীরে ধীরে আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন। রোগ থাকলে প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। নিরাময়ের জন্যে যেভাবে হিলিং করা প্রয়োজন, সেভাবে হিলিং করুন। সবসময় মনে রাখুন, দেহ ও মন পরস্পরের পরিপূরক। তাই সবল মনের সাথে সাথে প্রয়োজন সুস্থ দেহ। তাহলেই নতুন গতিময়তা পাবে আপনার জীবন।

৫. প্রো-অ্যাকটিভ হোন। অর্থাৎ সবসময় ঠান্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত নিন। অন্যের কাজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বা শুধু অন্যের মনোরঞ্জনের জন্যে কোনো কাজ করবেন না। রাগের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না, কোনো আদেশ করবেন না, কোনো শাস্তি দেবেন না। প্ররোচিত হয়ে অন্যের ফাঁদে পা দেবেন না। নিজ বিশ্বাসে অটল থাকবেন, কিন্তু একগুয়েমিকে প্রশ্রয় দেবেন না। প্রয়োজনে শুভানুধ্যায়ী ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন। যে-কোনো যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গ্রহণ করতে বা নিজের ভুল স্বীকার করতে কখনো বিলম্ব করবেন না। সবার সাথে বিনয়ী আচরণ করুন। হাসিমুখে কথা বলুন। সবাইকে আগে সালাম দিন। কারো কাছ থেকে কোনোভাবে উপকৃত হলে (তা যত ছোটই হোক না কেন) তাকে সাথে সাথে ধন্যবাদ জানান, তার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

যে-কেউ কুশল জিজ্ঞেস করলে সবসময় বলুন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমি ভালো আছি! বা পরম করুণাময়ের কৃপায় আমি ভালো আছি। আপনার সমস্যার কথা শুধুমাত্র তাকেই বলবেন, যিনি তা সমাধানে সৎ পরামর্শ দিতে বা সহযোগিতা করতে পারেন। নিজেকে সবসময় প্রো-অ্যাকটিভ রাখার জন্যে প্রো-অ্যাকটিভ ও সফল লোকদের সাথে মিশুন।

রি-অ্যাকটিভ, হতাশ ও নেতিবাচক লোকজনের সংস্পর্শ কৌশলে এড়িয়ে চলুন। তাদের সাথে কোনো বিতর্ক বা বিরোধে জড়ানোর প্রয়োজন নেই। শুধু কৌশলে তাদের সাহচর্য এড়িয়ে নিজের সময়কে কাজে লাগান। প্রতিটি কাজ সময় ও রুটিন অনুসারে করুন। খেয়াল খুশিমতো কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। দৃঢ়ভাবে সময় ও নিয়মানুবর্তিতাকে অনুসরণ করুন। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে অপেক্ষা বা সবরকে নিজের অভ্যাসে রূপান্তরিত করুন।

সবসময় মনে রাখুন, সাফল্য বা প্রাচুর্যের পথ কখনো সরল পথ নয়। সমস্যা, প্রতিকূলতা, বাধা, প্রাথমিক ব্যর্থতা আসতেই পারে। প্রতিটি সমস্যারই দুটি দিক আছে। এক হচ্ছে সঙ্কট। দুই নতুন সম্ভাবনা। সবর

প্রতিটি সমস্যাকে নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করে। সবর হচ্ছে সমস্যা বা প্রতিকূলতার প্রেক্ষিতে ঠান্ডা মাথায় সর্বোত্তম বিকল্প পন্থায় কাজ করা। প্রাপ্ত সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। নিজের বিশ্বাসে অটল থাকা। নীরব বিকল্প পন্থাই সাফল্যের স্বতঃস্ফূর্ত পথ।

প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে ঝর্নার মতো গতিময় করে তোলে। ঝর্ণার লক্ষ্য সমুদ্র। কিন্তু এ পথ সরল পথ নয়। পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে নিচুতে পড়লেও ঝর্না কখনো একে পতন বা বিপর্যয় মনে করে না। নতুন প্রাণোচ্ছলতা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সামনে বাধা পেলে ডানে বাঁয়ে বেঁকে যায়। এঁকেবেঁকে শেষ পর্যন্ত সে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়। সবর বা প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি আপনার জীবনকে দান করবে ঝর্নার মতো গতিময়তা, সাফল্য।

তাহলে এবার অনুশীলন শুরু করুন। শিথিলায়নের মধ্য দিয়েই শুরু হোক আপনার নতুন জীবন।

কোয়ান্টাম মেথড বইটিকে হাতের কাছেই রাখুন। যখনই সময় পান চোখ বোলান। প্রতিবারেই নতুন প্রত্যয় ও নতুন উদ্যম পাবেন। প্রতিবারেই দেখবেন নতুন দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হবে এর শব্দমালা। আপনার জীবনের চাওয়া পাওয়া যদি রোগমুক্তি, সুস্বাস্থ্য, অর্থবিত্ত, খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থাৎ বৈষয়িক সাফল্যের মাঝেই সীমিত থাকে তাহলে ২১ অধ্যায় পর্যন্ত অনুশীলনই যথেষ্ট। এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলো পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

আর যদি আপনি নিজেকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করতে চান, তাহলে ২১ অধ্যায় পর্যন্ত অনুশীলনীগুলো যথাযথভাবে চর্চা করার পর শুরু করুন নতুন অভিযাত্রা, অতিচেতনার পথে।

অতিচেতনার পথে

সতর্কবাণী

প্রো-অ্যাকটিভ ও গতিশীল ব্যক্তিত্ব অর্জন করে আপনি এখন অনন্য মানুষে উত্তরণের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। অতিচেতনার পথে আপনাকে তাই সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত মেডিটেশন মনের গভীর স্তরের মেডিটেশন। পূর্বের ২১টি অধ্যায়ের অনুশীলনীর সফল অনুশীলন করে ইচ্ছেমতো একাগ্র ধ্যানমগ্ন হওয়া ও জেগে ওঠার নিজস্ব ক্ষমতা অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই এই মেডিটেশনের অনুশীলন শুরু করা উচিত। কারণ এই পর্যায়ে যে- কোনো ভ্রান্তি আপনার জন্যে মনোদৈহিক ভাবে ক্ষতিকর হতে পারে। নিজের ধ্যানাবস্থার ওপর স্বনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকলে সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত এই পর্বের মেডিটেশনের অনুশীলন থেকে বিরত থাকুন। অবশ্য একজন বিজ্ঞ গুরুর তত্ত্বাবধানে এই অতিচেতনা অর্জনের মেডিটেশন সবসময় সহজে ফলপ্রসূ হয়।

অধ্যায়-২৩

ডান ও বাম বলয়ের সমন্বয়

আমরা জানি, আমাদের ব্রেনে দুটি প্রধান বলয় রয়েছে। বাম বলয় ও ডান বলয়। বাম বলয় নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তি, অঙ্ক, হিসাব, কথা, শ্রুতি, ভাষা, ক্ষুধা, হজম ও সকল বৈষয়িক ভাবনা।

আর ডান বলয় নিয়ন্ত্রণ করে কল্পনা, সংগীত, সৃজনশীলতা, ঘুম, স্বপ্ন, অতিচেতনা, আবেগ, বিশ্বাস, সকল আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনা। বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই এই দুই বলয়ের সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারো মধ্যে দেখা যায় বাম বলয় সক্রিয় আর কারো মধ্যে ডান বলয়। তাই কেউ ব্যস্ত থাকে শুধু বৈষয়িক ভাবনায় আর কেউ ব্যস্ত থাকে কল্পনায়।

কিন্তু মানুষ হিসেবে সফল হতে হলে আপনার দুটো বলয়ের সমন্বিত সক্রিয়তা প্রয়োজন, আবেগের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বস্তুর। মানসিক উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন, আপনার তেমনি প্রয়োজন বৈষয়িক সাফল্য। তাই ব্রেনের ডান ও বাম বলয়ের তৎপরতার মধ্যে প্রয়োজন সুন্দর সমন্বয়। ডান ও বাম বলয়ের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এক ঐকতান সৃষ্টি করতে পারলে জীবনের সবকিছুর মাঝেই সৃষ্টি হবে প্রাকৃতিক ছন্দ। (প্রথমে পুরো মেডিটেশনটি ভালোভাবে পড়ে ধাপগুলো মুখস্থ করে নিন বা অডিও ব্যবহার করুন। তারপর অনুশীলন করুন।)

মেডিটেশন : ঐকতান-এক

১. নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ির ড্রইংরুমে বসুন।

২. এবার অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন ব্রেনের ডান বলয়ে... আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন ব্রেনের বাম বলয়ে... আবার ডান বলয়ে... আবার বাম বলয়ে... আবার ডান বলয়ে.... আবার বাম বলয়ে... দুই বলয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুভব করছেন কি? একটির চেয়ে অন্যটি বেশি পরিষ্কার মনে হচ্ছে কি?...

এবার আপনার ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ১

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ক

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ২

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন খ

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ৩

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন গ

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ৪

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ঙ

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ৫

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন চ

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ৬

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ছ

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ৭

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন জ

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ৮

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ত

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ৯

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন থ

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ১০

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন দ

এবার ভিজুয়ালাইজ করার প্রক্রিয়া পুরোপুরি উল্টে দিন।

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ১

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ক

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ২

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন খ

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ৩

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন গ

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ৪

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ঙ

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ৫

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন চ

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ৬

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ছ

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ৭

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন জ

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ৮

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন ত

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ৯

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন থ

ব্রেনের ডান দিকে কল্পনা করুন ১০

ব্রেনের বাম দিকে কল্পনা করুন দ

এবার কয়েক মুহূর্ত ভাবুন। কোন বলয়ে সংখ্যা ও হরফ বেশি পরিষ্কার এসেছে। (বিরতি)...

এবার বাইরের কিছু দৃশ্য কল্পনা করুন-

ব্রেনের বাম বলয়ে কল্পনা করুন সমুদ্রে সূর্যাস্তের দৃশ্য

ব্রেনের ডান বলয়ে কল্পনা করুন উৎসবমুখর বিয়ে বাড়ি

ব্রেনের বাম বলয়ে কল্পনা করুন ঘূর্ণিঝড়

ব্রেনের ডান বলয়ে কল্পনা করুন ফুলে ফুলে ভরা বাগান

ব্রেনের বাম বলয়ে কোমল বিছানায় গড়াগড়ির অনুভূতি কল্পনা করুন

ব্রেনের ডান বলয়ে ভেজা কদম ফুলের গন্ধ নিন

ব্রেনের বাম বলয়ে মুড়ি চিবানোর শব্দ কল্পনা করুন

ব্রেনের ডান বলয়ে চিংড়ির দোপেঁয়াজার স্বাদ নিন

ব্রেনের বাম বলয়ে কাগজি লেবুর ঘ্রাণ নিন

এবার কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে অনুভূতিগুলো পর্যালোচনা করুন। (বিরতি)....

এবার ব্রেনের বাম বলয়ে একটা আলোর বিন্দু কল্পনা করুন। কল্পনা করুন আলোর বিন্দুটি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।

এবার ব্রেনের ডান বলয়ে আরেকটি আলোর বিন্দু কল্পনা করুন। কল্পনা করুন আলোর বিন্দু আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।

এবার কল্পনা করুন বাম বলয়ের আলোর বিন্দু বড় হয়ে ব্রেনের পুরো বাম বলয় পূর্ণ করে ফেলেছে। বাম বলয় পুরোপুরি আলোয় পরিপূর্ণ হয়েছে।

এবার কল্পনা করুন ডান বলয়ে আলোর বিন্দু বড় হয়ে আস্তে আস্তে পুরো ডান বলয় পূর্ণ করে ফেলেছে। ডান বলয় পুরোপুরি আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এবার কল্পনা করুন বাম ও ডান বলয়ের আলো পরস্পরের সাথে মিশে আলোর একটা বলয়ে পরিণত হয়েছে। অনুভব করুন ব্রেনের ডান ও বাম বলয়ের মধ্যে যোগাযোগ সম্পন্ন হয়েছে।

শুধু বাম ও ডান বলয়ই নয় ব্রেনের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যেও পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুভব করুন এখন আপনি আগের চেয়ে আপনার ব্রেনকে অনেক বেশি পরিমাণে ও সমন্বিতভাবে ব্যবহার করতে পারছেন। আপনার সচেতনতা আপনার ব্রেনের সাথে আরো বেশি একাত্মতা অনুভব করছে।

এবার কল্পনা করুন ডান ও বাম বলয়কে পূর্ণ করে রয়েছে যে আলো তা আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছে। ছোট হতে হতে তা ব্রেনের মাঝখানে এসে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

এবার কল্পনা করুন আলোর বিন্দুটি সামনের দিকে এসে আপনার কপালে দুই ভ্রূর মাঝখানে অবস্থান নিয়েছে।

এবার কল্পনা করুন, অনুভব করুন আলোর বিন্দু থেকে এক শক্তিশালী চুম্বক তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে।

কল্পনা করুন, অনুভব করুন আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি করার ক্ষমতা, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। অনুভব করুন আপনার ভিজুয়ালাইজ করার ক্ষমতা, মনছবি দেখার ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। কল্পনা করুন, অনুভব করুন আপনি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক বেশি শুনতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন। আপনার ব্রেনকে আগের চেয়ে বেশি ব্যবহার করতে পারায় আপনার সামগ্রিক সচেতনতার ব্যাপ্তি ঘটেছে।

৩. কিছুক্ষণ কোনো ভাবনা ছাড়াই শুধুমাত্র দম খেয়াল করুন।

৪. এবার নিয়মমাফিক ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় পৌঁছে যান।

মেডিটেশন : ঐকতান-২

[ঐকতান-১ কমপক্ষে একমাস অনুশীলন করার পর ঐকতান-২ এর অনুশীলন করবেন।]

১. নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ির ড্রইং রুমে বসুন।

২. এবার অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন ব্রেনের ডান বলয়ে... আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন বাম বলয়ে... আবার ডান বলয়ে, আবার বাম বলয়ে... আবার ডান বলয়ে... আবার বাম বলয়ে...

৩. এবার সময় নিয়ে অবলোকন করুন-

ডান বলয়ে কল্পনা করুন একটি পরমাণু

বাম বলয়ে কল্পনা করুন ছায়াপথ গ্যালাক্সি

ডান বলয়ে কল্পনা করুন আমের মুকুলে ভরা আম গাছ

বাম বলয়ে কল্পনা করুন গাছ ভর্তি আম। পাকা আম-ডাঁসা আম। আমের ভারে গাছের ডাল নুয়ে পড়েছে...

আম গণনা করুন।

ডান বলয়ে অবলোকন করুন রাঙ্গামাটির মনোরম লেক

বাম বলয়ে অবলোকন করুন ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন নদীপথ

ডান বলয়ে কল্পনা করুন হিমালয়ের বরফাচ্ছন্ন শৃঙ্গ। নিজেকে দেখুন বরফ ভেদ করে পর্বতারোহীর পোশাক পরে ওপরে উঠছেন। বরফের ওপর সূর্যালোকের দৃশ্য উপভোগ করুন-ঠান্ডা বাতাসের ঘ্রাণ নিন-

বাম বলয়ে অনুভব করুন দুহাত দিয়ে গায়ে কাদামাটি মাখার অনুভূতি

ডান বলয়ে কল্পনা করুন শিশুর তুলতুলে হাতের স্পর্শ

বাম বলয়ে অবলোকন করুন গাড়ির ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ

ডান বলয়ে কল্পনা করুন অগ্নি নির্বাপক গাড়ির আওয়াজ

বাম বলয়ে কল্পনা করুন শিশুর কান্না

ডান বলয়ে কল্পনা করুন উচ্চাঙ্গ সংগীত

বাম বলয়ে কল্পনা করুন কনকনে শীতের রাতে আপনি চাদর মুড়ি দিয়ে বাড়ির পথে যাচ্ছেন। আপনার চাদরের নিচে দুই বগলে দুটি বিড়াল ছানা

ডান বলয়ে কল্পনা করুন আপনি ঝর্নার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন-ঝর্নার চমৎকার স্বচ্ছ ঠান্ডা পানি আপনার শরীরের ওপর পড়ছে-আপনি অবগাহন করছেন-

সকল অনুভূতিকে সময় নিয়ে আত্মস্থ করুন। (বিরতি ৩ মিনিট)

এবার কপালের ওপর একটা বৃত্ত কল্পনা করুন।

এবার কল্পনা করুন বৃত্ত আস্তে আস্তে ভেতরে প্রবেশ করছে... বৃত্ত আপনার মাথার ভেতরে প্রবেশ করছে...আর ছোট হচ্ছে-আস্তে আস্তে তা ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে-(বিরতি)

এবার ধীরে ধীরে দম নিন-ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন-(৫ বার)

দম স্বাভাবিক হতে দিন...

এবার একই সাথে ডান বলয়ে একটি সূর্যমুখী ফুল এবং বাম বলয়ে একটি পাতাবাহার গাছ অবলোকন করুন-

এবার কপালে একটি বেলী ফুল ফুটে আছে অবলোকন করুন-

কপালে একটি গাঁদা ফুলের গাছ অবলোকন করুন- (বিরতি)

এবার কপালে একটি আলোর বল কল্পনা করুন-অবলোকন করুন বলটি বামে যাচ্ছে- পেছনে যাচ্ছে- ডানে যাচ্ছে আবার কপালের সামনে এসেছে

আবার অবলোকন করুন এটি ডানে যাচ্ছে-পেছনে যাচ্ছে-বামে যাচ্ছে-কপালে ফিরে এসেছে

(৫ বার পুরো বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করুন)

এবার কল্পনা করুন একটা বৃত্ত থুতনিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠোঁটের ওপর, নাকের ওপর, চোখের ওপর, কপালের ওপর, তালুর ওপর ঘুরছে।

আবার তালু থেকে নেমে কপালে, কপাল থেকে নাকে, নাক থেকে ঠোঁটে, ঠোঁট থেকে থুতনিতে-

(৫ বার পুরো বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করুন)

এবার কল্পনা করুন, আপনার মুখ ও মাথার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে অসংখ্য বৃত্ত... ৩০ সেকেন্ড পর বৃত্তগুলো বিলীন হয়ে যেতে দিন।

এবার ব্রেনের বাম বলয়ে মনোযোগ দিন। অবলোকন করুন ব্রেনের বাম বলয়... থরে থরে মগজ সাজানো...

এবার অবলোকন করুন ব্রেনের ডান বলয়... থরে থরে মগজ সাজানো...

এবার অবলোকন করুন ব্রেনের বাম ও ডান বলয়ের সাথে সমন্বয় সাধনকারী কর্পাস কলোসামের তন্তুগুলো। দুই বলয়কে বেশ সুন্দরভাবে সংযুক্ত করে রেখেছে।

এবার ব্রেনের দুই বলয় একসাথে অবলোকন করুন। অনুভব করুন ব্রেনের সূক্ষ্মতা ও জটিলতা। দেখুন এর ১০০০০ কোটি নিউরোন সেল আলোর গতিতে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করছে...

অনুভব করুন ব্রেন নিজেই এক মহাবিশ্ব... যার অসীম সামর্থ্য, ক্ষমতা ও বহুমাত্রিকতা বা ডাইমেনশন সম্পর্কে আপনি শুধুমাত্র ভাবতে শুরু করেছেন... (বিরতি)

এবার ধীরে এবং গভীরভাবে দম নিন।

কল্পনা করুন দম নেয়া ও দম ছাড়ার সাথে সাথে আপনি আপনার ব্রেনকে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করতে পারেন।

এবার ধীরে ধীরে দম নিতে নিতে কল্পনা করুন আপনার ব্রেন প্রসারিত হচ্ছে।

আবার ধীরে ধীরে দম ছাড়তে ছাড়তে কল্পনা করুন আপনার ব্রেন সঙ্কুচিত হচ্ছে

(৫ বার ধীরে ধীরে দম নিন, ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন এবং একইভাবে কল্পনা করুন।)

আপনার দম স্বাভাবিক হতে দিন-ব্রেনকে এবার বিশ্রাম নিতে দিন।

ব্রেন নিজেই যে একটি মহাবিশ্ব– এই ছবি অবলোকন করতে করতে সরাসরি ব্রেনের সাথে কথা বলুন

বলুন "আমি ইচ্ছে করলেই ব্রেনের কার্যক্রম ভালো থেকে ভালো হতে পারে"

মনে মনে বলুন-এখন থেকে আরো বেশি সংখ্যক ব্রেন সেল আমার কাজে ব্যবহৃত হবে। আর সময় যাওয়ার সাথে সাথে ব্রেনের সকল প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম ক্রমাগত উন্নত ও বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হবে।

কল্পনা করুন ব্রেন সেল ও বিভিন্ন কেন্দ্রগুলো বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে-

মনে মনে অনুভব করুন ব্রেনের অনেক সুপ্ত সম্ভাবনা এখন বিকশিত হতে পারবে এবং আপনি ব্রেনের সাথে এক চমৎকার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোকে জীবনের উন্নয়নে ব্যয় করতে পারবেন...

এবার আপনার ব্রেন আপনাকে কিছু বলতে চাচ্ছে কিনা তা শুনুন ও অবলোকন করুন। ব্রেনের বক্তব্য কথা,

বাণী, অনুভূতি বা চিত্রের মাধ্যমে আসতে পারে... ব্রেনকে কিছুটা সময় দিন... আপনার কথায় সাড়া দেয়ার জন্যে... (বিরতি ৩ মিনিট)

নিজের পুরো ব্রেনের ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠুন। অনুভব করুন, ব্রেনের সাথে আপনার যোগাযোগ ও একাত্মতা পরিপূর্ণ হয়েছে। (বিরতি)

ব্রেনকে নিজের নতুন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন। এই নতুন বন্ধুত্বকে জীবনের এক নতুন সুন্দর সত্য হিসেবে গ্রহণ করুন। সময় যত পার হতে থাকবে আপনার চেতনা ও আপনার ব্রেনের মধ্যে এই বন্ধুত্ব তত জোরদার ও মজবুত ও ফলপ্রসূ হবে।

৪. এবার কিছুক্ষণ কোনো ভাবনা ছাড়াই ধীরে ধীরে দম নিন ও নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন।

৫. এবার নিয়মমাফিক ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় পৌঁছে যান।

অধ্যায়-২৪

প্রকৃতির সাথে একাত্ম হোন

মানুষ পৃথিবীতে কোনো বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়। আশরাফুল মাখলুকাত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতির বাইরে, প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে গিয়ে সে বাঁচতে পারে না। তাই প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে পারলেই আপনি আপনার চেতনাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে পারবেন। সহজে চেতনাকে সর্বত্রগামী করতে পারবেন।

(মেডিটেশনের ধাপগুলো ভালোভাবে পড়ে নিয়ে মুখস্থ করে তারপর অনুশীলন শুরু করুন বা অডিও ব্যবহার করুন।)

মেডিটেশন : প্রকৃতির সাথে একাত্মতা

১. নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ির ড্রইংরুমে বসুন।

২. ৩-২-১-০ গণনা করে হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করুন। এরপর হিলিং সেন্টারের ডানের বারান্দা দিয়ে বাইরে আসুন। এসে প্রথমেই দেখুন একটা এলুমিনিয়ামের দেয়াল। দেয়ালটি আপনার সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে দেয়ালের রঙ ভালোভাবে দেখুন। দেয়ালটি হাত দিয়ে স্পর্শ করুন।

এর আগে এলুমিনিয়াম স্পর্শ করে থাকলে সে অনুভূতির সাথে এখনকার অনুভূতির তুলনা করুন। এবার দেয়ালের ভেতর প্রবেশ করুন। দেয়ালের ভেতরের রঙ, উত্তাপ, আলোর পরিমাণ, ঘনত্ব ইত্যাদি সময় নিয়ে পরীক্ষা করুন। এবার নিজের চেতনাকে এলুমিনিয়ামের সাথে একাত্ম করুন। ৎঅনুভব করুন আপনিই এলুমিনিয়াম। এরপর এলুমিনিয়ামের দেয়াল ভেদ করে বাইরে আসুন।

৩. এবার সামনে দেখুন তামার দেয়াল। দেয়ালের রঙ ভালোভাবে দেখুন। দেয়ালটি হাত দিয়ে স্পর্শ করুন। এর আগে তামা স্পর্শ করার অনুভূতি স্মরণ করুন। তামার দেয়াল স্পর্শ করায় এখন যে অনুভূতি হলো তা আগের অনুভূতির সাথে তুলনা করুন।

এবার দেয়ালের ভেতরে প্রবেশ করুন। দেয়ালের ভেতর কেমন লাগছে, গরম না ঠান্ডা? তা অনুভব করুন। ভেতরের রঙ দেখুন। আলোর পরিমাণ কেমন দেখুন। ভেতরের গন্ধ নিন। টোকা দিয়ে দেখুন শব্দের ধরন। এর ঘনত্ব অনুভব করুন। নিজের চেতনাকে তামার সাথে একাত্ম করুন। অনুভব করুন আপনিই তামা। ... এবার তামার দেয়াল থেকে বাইরে আসুন।

৪. এবার সামনে দেখুন পিতলের দেয়াল। দেয়ালের রঙ ভালোভাবে দেখুন। দেয়ালটি হাত দিয়ে স্পর্শ করুন।

এর আগে পিতল স্পর্শ করার অনুভূতি স্মরণ করুন। পিতলের দেয়াল স্পর্শ করায় এখন যে অনুভূতি হলো তা আগের অনুভূতির সাথে তুলনা করুন। এবার দেয়ালের ভেতরে প্রবেশ করুন। দেয়ালের ভেতর কেমন লাগছে, গরম না ঠান্ডা, তা অনুভব করুন। ভেতরের রঙ দেখুন। আলোর পরিমাণ কেমন দেখুন। ভেতরের গন্ধ নিন। টোকা দিয়ে দেখুন শব্দের ধরন। এর ঘনত্ব অনুভব করুন। এবার নিজের চেতনাকে পিতলের সাথে একাত্ম করুন। অনুভব করুন আপনিই পিতল। ...এবার পিতলের দেয়াল থেকে বাইরে আসুন।

৫. এবার সামনে দেখুন ইস্পাতের দেয়াল। দেয়ালের রঙ ভালোভাবে দেখুন। দেয়ালটি হাত দিয়ে স্পর্শ করুন। এর আগে ইস্পাত স্পর্শ করার অনুভূতি স্মরণ করুন। ইস্পাতের দেয়াল স্পর্শ করায় এখন যে অনুভূতি হলো তা আগের অনুভূতির সাথে তুলনা করুন। এবার দেয়ালের ভেতরে প্রবেশ করুন। দেয়ালের ভেতর কেমন লাগছে, গরম না ঠান্ডা, তা অনুভব করুন। ভেতরের রঙ দেখুন। আলোর পরিমাণ কেমন দেখুন। ভেতরের গন্ধ নিন। টোকা দিয়ে দেখুন শব্দের ধরন। এর ঘনত্ব অনুভব করুন। এবার নিজের চেতনাকে ইস্পাতের সাথে একাত্ম করুন। অনুভব করুন আপনিই ইস্পাত। ... এবার ইস্পাতের দেয়াল থেকে বাইরে আসুন।

৬. এবার সামনে দেখুন চুম্বকের দেয়াল। দেয়ালের রঙ ভালোভাবে দেখুন। দেয়ালটি হাত দিয়ে স্পর্শ করুন। এর আগে চুম্বক স্পর্শ করার অনুভূতি স্মরণ করুন। চুম্বকের দেয়াল স্পর্শ করায় এখন যে অনুভূতি হলো তা আগের অনুভূতির সাথে তুলনা করুন। এবার দেয়ালের ভেতরে প্রবেশ করুন। দেয়ালের ভেতর কেমন লাগছে, গরম না ঠান্ডা, তা অনুভব করুন। ভেতরের রঙ দেখুন। আলোর পরিমাণ কেমন দেখুন। ভেতরের গন্ধ নিন। টোকা দিয়ে দেখুন শব্দের ধরন। এর ঘনত্ব অনুভব করুন। এবার নিজের চেতনাকে চুম্বকের সাথে একাত্ম করুন। অনুভব করুন আপনিই চুম্বক।.... এবার চুম্বকের দেয়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসুন।

৭. এবার সামনে দেখুন সীসার দেয়াল। দেয়ালের রঙ ভালোভাবে দেখুন। দেয়ালটি হাত দিয়ে স্পর্শ করুন। এর আগে সীসা স্পর্শ করার অনুভূতি স্মরণ করুন। সীসার দেয়াল স্পর্শ করায় এখন যে অনুভূতি হলো তা আগের অনুভূতির সাথে তুলনা করুন। এবার দেয়ালের ভেতরে প্রবেশ করুন। দেয়ালের ভেতর কেমন লাগছে, গরম না ঠান্ডা, তা অনুভব করুন। ভেতরের রঙ দেখুন। আলোর পরিমাণ কেমন দেখুন। ভেতরের গন্ধ নিন। টোকা দিয়ে দেখুন শব্দের ধরন। এর ঘনত্ব অনুভব করুন। এবার নিজের চেতনাকে সীসার সাথে একাত্ম করুন। অনুভব করুন আপনিই সীসা। ... এবার সীসার দেয়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসুন।

৮. এবার সামনে দেখুন রাবারের দেয়াল। দেয়ালের রঙ ভালোভাবে দেখুন। দেয়ালটি হাত দিয়ে স্পর্শ করুন। এর আগে রাবার স্পর্শ করার অনুভূতি স্মরণ করুন। রাবারের দেয়াল স্পর্শ করায় এখন যে অনুভূতি হলো তা আগের অনুভূতির সাথে তুলনা করুন। এবার দেয়ালের ভেতরে প্রবেশ করুন। দেয়ালের ভেতর কেমন লাগছে, গরম না ঠান্ডা, তা অনুভব করুন। ভেতরের রঙ দেখুন। আলোর পরিমাণ কেমন দেখুন। ভেতরের গন্ধ নিন।

টোকা দিয়ে দেখুন শব্দের ধরন। এর ঘনত্ব অনুভব করুন। এবার নিজের চেতনাকে রাবারের সাথে একাত্ম করুন। অনুভব করুন আপনিই রাবার। ... এবার রাবারের দেয়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসুন।

৯. এবার আপনার সামনে দেখুন এক নিমপাতা আস্তে আস্তে বিশাল হয়ে যাচ্ছে। পাতার রঙ ভালোভাবে দেখুন। পাতাটি স্পর্শ করুন। আগে যখন নিমপাতা স্পর্শ করেছিলেন তখনকার অনুভূতির সাথে এখনকার অনুভূতির তুলনা করুন। এবার নিমপাতার ভেতরে প্রবেশ করুন। পাতার ভেতর কেমন লাগছে, গরম না ঠান্ডা, আঠালো না ঝরঝরে তা খেয়াল করুন। ভেতরের রঙ দেখুন। আলোর পরিমাণ দেখুন। ভেতরের গন্ধ নিন। জিহ্বা স্পর্শ করে একটু স্বাদ নিন। টোকা দিয়ে দেখুন শব্দের ধরন। এর ঘনত্ব অনুভব করুন। এবার নিজের চেতনাকে নিমপাতার সাথে একাত্ম করুন। অনুভব করুন আপনিই নিমপাতা .... এবার পাতা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসুন। চেতনার এই স্তরে আপনি যে উপলব্ধিতে পৌঁছলেন তা অবচেতনে লিপিবদ্ধ হয়ে রইল। ভবিষ্যতে নিজের ও মানবতার কল্যাণে এই জ্ঞান পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবেন।

১০. এবার আপনার সামনে দেখুন একটি গোলাপ ফুল। দেখুন আস্তে আস্তে তা রীতিমতো টিলার আকার ধারণ করেছে। গোলাপের রঙ ভালোভাবে দেখুন। এবার গোলাপটিকে স্পর্শ করুন। আগে যখন গোলাপ স্পর্শ করেছিলেন তখনকার স্পর্শের সাথে এখনকার স্পর্শের অনুভূতির মিল/অমিল লক্ষ করুন। ভালোভাবে গন্ধ নিন। আগে যখন গোলাপের গন্ধ নিয়েছিলেন সে গন্ধের সাথে এখনকার গন্ধের তুলনা করে দেখুন। এবার গোলাপের ভেতরে প্রবেশ করুন। কেমন লাগছে, গরম না ঠান্ডা, স্যাঁতস্যাঁতে না ঝরঝরে অনুভব করুন। ভেতরের রঙ ও আলোর পরিমাণ দেখুন। গন্ধ নিন। এবার নিজের চেতনাকে গোলাপের সাথে একাত্ম করুন। অনুভব করুন আপনিই গোলাপ। .... এবার বাইরে বেরিয়ে আসুন।

১১. এবার সামনে দেখুন একটা কমলা। আস্তে আস্তে দেখুন কমলাটা বড় হয়ে যাচ্ছে। দেখুন তা বিশাল আকার লাভ করেছে। এবার কমলাটির খোসা স্পর্শ করুন, গন্ধ নিন। এর আগে কমলা স্পর্শ ও গন্ধ নেয়ার অনুভূতির সাথে বর্তমানের অনুভূতির তুলনা করুন।

এবার কমলার ভেতরে প্রবেশ করুন। দেখুন কমলার রসভর্তি কোষ এক একটা সুইমিং পুলের আকার ধারণ করেছে। আপনি কমলার রসভর্তি সুইমিং পুলে সাঁতার কাটুন। কমলার রস সারা শরীরে লাগার অনুভূতি পরখ করুন। এবার কমলার সাথে নিজের চেতনাকে পুরোপুরি একাত্ম করুন। অনুভব করুন আপনিই কমলা।

... এবার বাইরে আসুন। দেখুন কমলা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে স্বাভাবিক আকার ধারণ করেছে। এবার কমলার খোসা ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে পুরো কমলা খেয়ে ফেলুন। এর স্বাদ ও গন্ধ উপলব্ধি করুন।

এবার কমলার বিচিগুলোর মধ্য থেকে একটি বিচি বেছে নিয়ে মাটিতে যত্ন সহকারে বপন করুন। দেখুন আস্তে আস্তে মাটি ফুঁড়ে বিচি থেকে অঙ্কুর গজিয়েছে। দিন যাচ্ছে রাত যাচ্ছে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থীর চাঁদ আস্তে

আস্তে ১৬ কলায় পূর্ণ হয়ে পূর্ণিমা হচ্ছে, আবার কৃষ্ণপক্ষ। আস্তে আস্তে চাঁদ ক্ষয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে অমাবশ্যা। আবার দ্বিতীয়া, তৃতীয়া আবার পূর্ণিমা এভাবেই মাস পার হয়ে পার হচ্ছে ঋতু। গ্রীষ্ম পার হয়ে বর্ষা, বর্ষা পার হয়ে শরৎ। শরৎ পার হয়ে হেমন্ত। হেমন্ত পার হয়ে শীত। শীতের পর বসন্ত। সূর্যের চারদিকে একপাক ঘুরে এসেছে পৃথিবী। আবার গ্রীষ্মকাল।

একবছর পুরো হওয়ায় চারা গাছটা বেশ বড় হয়েছে। এভাবেই ঋতু পরিক্রমায় দ্বিতীয় বছরও পার হলো। পার হলো তৃতীয় বছর। দেখুন গাছ বেশ ডালপালা পাতায় পরিপূর্ণ হয়ে রীতিমতো ছোট একটা ঝাড়ে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থ বছরের শীতে দেখুন গাছ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে কমলায়। দেখুন কমলা পেকে ডাঁসা হয়ে উঠেছে। একটা কমলা ছিঁড়ে নিন। এবার খোসা ছাড়িয়ে খেতে থাকুন। এর স্বাদ গন্ধ পরখ করুন। এর আগে প্রথম কমলার যে স্বাদ পেয়েছিলেন, এবারের কমলার সাথে সে স্বাদ/গন্ধের তুলনা করুন।

১২. এবার সামনের দিকে এগিয়ে যান। আপনি লেকের ধারে চলে এসেছেন। সন্ধ্যা নেমেছে। আস্তে আস্তে সব অন্ধকার হচ্ছে। আপনি শান বাঁধানো ঘাটের ইজি চেয়ারে বসুন। দেখুন লেকের পানিতে নীলাকাশের অগণিত নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব। এবার মহাকাশের দিকে তাকান। মহাবিশ্বের কথা ভাবুন। সৌর জগতের কথা ভাবুন। ... সূর্যের নয়টি গ্রহের একটি গ্রহ এই পৃথিবী। পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের একটি এশিয়া। এশিয়ার একটা ছোট দেশ বাংলাদেশ। আর তার একটা ছোট এলাকায় আপনার বিচরণ।

আর আমাদের সূর্যের মতো ১০০ কোটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সি। আর মহাবিশ্বে এ ধরনের গ্যালাক্সিও রয়েছে শত কোটি। এবার অনুভব করুন মহাবিশ্বের বিশালত্বের তুলনায় আপনি কত ক্ষুদ্র! আপনি অনুভব করুন মহাবিশ্বের প্রেক্ষাপটে, মহাপ্রকৃতির প্রেক্ষাপটে আপনার ব্যক্তি অস্তিত্ব কত নগণ্য। কিন্তু আপনি যদি নিজেকে আলাদা না ভেবে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ভাবেন, তাহলে প্রকৃতির শক্তিই আপনার শক্তিতে পরিণত হবে।

১৩. প্রকৃতির সাথে গভীর প্রেম অনুভব করুন। অবলোকন করুন প্রকৃতির প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনি গাছ লাগাচ্ছেন ... হরেক রকম ফুল ও ফলের গাছ লাগাচ্ছেন ... পুকুর দীঘি খনন করছেন.... গাছগুলো প্রকৃতিকে সবুজ করে তুলেছে... পাখ-পাখালির কূজন এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ... আপনি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন ...

১৪. আপনি এবার পরিপূর্ণভাবে অনুভব করুন, আপনি যত ক্ষুদ্রই হোন, এখন প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছেন, আপনি প্রকৃতির শক্তির সাথে একীভূত হয়েছেন। আপনার চেতনা মিশেছে মহাচেতনার সাথে। তাই আপনার যে-কোনো সমস্যাই থাক না কেন, তা এখন আর আপনার সমস্যা নেই, পরিণত হয়েছে

প্রকৃতির সমস্যায়। আর তা সমাধানের দায়িত্ব শুধু আপনার চেতনার ওপরই বর্তায় না। বর্তায় মহাচেতনার ওপর। আপনি মহাচেতনার হাতে ফলাফলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে নিজে কাজ করে যান। কাজের ফলাফল ও সাফল্যে আপনি চমৎকৃত হবেন। উপলব্ধির এক নতুন স্তরে আপনি প্রবেশ করবেন।

১৫. এবার আস্তে আস্তে নতুন উপলব্ধিকে লালন করতে করতে হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করুন।

১৬. ০-১-২-৩ গণনা করে হিলিং সেন্টার থেকে ড্রইংরুমে প্রবেশ করুন।

১৭. ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় পৌঁছে যান।

মেডিটেশন : প্রকৃতির সাথে একাত্মতা-২

১. নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ির ড্রইংরুমে বসুন।

২. ৩-২-১-০ গণনা করে হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করুন।

৩. হিলিং সেন্টারের ডানের বারান্দা দিয়ে বাইরে এসে হাঁটতে থাকুন। সবুজ প্রকৃতি... পাখ-পাখালির কূজন মুখরিত পরিবেশে কিছুক্ষণ বিচরণ করুন...। (বিরতি)

৪. আপনি এবার হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যান সমুদ্রের বেলাভূমিতে। অনুভব করুন আপনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে। শুনুন সমুদ্রের পানির গর্জন।
আস্তে আস্তে পানিতে নামতে থাকুন। ডুব দিন সাগরের তলদেশে। অবলোকন করুন আপনার চারপাশে নানা রঙের মাছের ঝাঁক। কোটি কোটি মাছ আপনার চারপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আরো গভীরে নানা ধরনের শৈবাল। এগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে যান ভারত মহাসাগরে। (বিরতি)...

৫. ভারত মহাসাগরের গভীর থেকে আপনি সমুদ্রপৃষ্ঠে উঠুন। সামনে দেখুন এক বিরাট তিমি মাছ। মাছটি বিশাল হা করায় আপনি চলে গেছেন তার মুখের ভেতরে। আপনি তিমির শরীরের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়ান। তার প্রতিটি অঙ্গ পর্যবেক্ষণ করুন। (বিরতি)...

৬. এবার আপনি তিমির শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মহাসাগরের গভীরে ডুব দিন। (বিরতি)...

৭. আপনি এখন পৌঁছেছেন সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে। যেখানে আপনার আগে আর কেউ যায় নি। চমৎকার গাছপালা লতাগুল্ম ও হরেক রকম রঙিন মাছে ভরপুর। এ মনোরম স্থানে দেখুন অসংখ্য চমৎকার চমৎকার মুক্তো পড়ে আছে। আপনি সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় মুক্তোগুলো মুঠো ভরে নিজের পকেটে রাখুন। (বিরতি)...

৮. অপূর্ব সুন্দর এতগুলো মুক্তো পাওয়ার আনন্দের অনুভূতি নিয়ে ফেরত যাত্রা শুরু করুন। সাঁতার কেটে

এগুতে থাকুন। সামনের দেখুন একটি ডলফিন। ডলফিন হেসে আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাচ্ছে। আপনি ডলফিনের সাথে সাঁতার কাটতে কাটতে খেলতে খেলতে চলে আসুন কক্সবাজারের কাছে। (বিরতি)...

৯. আপনি এখনো সমুদ্রের পানিতে ভেসে আছেন। চারদিকে তাকান। অনুভব করুন সমুদ্রের বিশালত্ব। বিন্দু বিন্দু পানি একত্রে মিশে কি প্রচণ্ড শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে! আপনার দৃষ্টিতে নগণ্য পানির ফোঁটাই গর্জন করছে, বলছে-আমিই সমুদ্র। এবার আপনি অনুভব করুন, আপনি সমুদ্রের সাথে মিশে গেছেন। আপনার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনিই এখন সমুদ্র। (বিরতি)...

আপনি অনুভব করুন, পরিপূর্ণরূপে অনুভব করুন, আপনি যত ক্ষুদ্রই হোন-এখন মহাপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছেন। আপনি প্রকৃতির শক্তির সাথে একীভূত হয়েছেন। আপনার চেতনা মিশেছে মহাচেতনার সাথে। অনুভব করুন আপনি এখন মহাচেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ... (বিরতি)...

আপনার চেতনা মহাচেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আপনার যে-কোনো সমস্যাই থাক না কেন, তা এখন আর আপনার সমস্যা নেই, পরিণত হয়েছে প্রকৃতির সমস্যায়। আর তা সমাধানের দায়িত্ব শুধু আপনার ওপর বর্তায় না, বর্তায় মহাচেতনার ওপর। আপনি মহাচেতনার হাতে ফলাফলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে কাজ করে যান। কাজের ফলাফল ও সাফল্যে আপনি চমৎকৃত হবেন। (বিরতি...)

প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার ফলে উপলব্ধির এক নতুন স্তরে প্রবেশ করলেন আপনি। এই নতুন উপলব্ধি, জ্ঞান ও অনুভূতি আপনার অবচেতনে দৃঢ়মূল হয়ে রইল। নিজের ও মানবতার কল্যাণে এই জ্ঞান ও উপলব্ধিকে যখন ইচ্ছা কাজে লাগাতে পারবেন।

১০. এবার ফিরে আসুন মনের বাড়ির হিলিং সেন্টারে।

১১. ০-১-২-৩ গণনা করে ড্রইংরুমে প্রবেশ করুন। সাথে আনা সুন্দর মুক্তোগুলো ভালোভাবে সাজিয়ে রাখুন।

১২. ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

অধ্যায়-২৫

কমান্ড সেন্টার : কল্যাণ প্রক্রিয়া

অনন্য মানুষে উত্তরণের পথে আপনি অগ্রসর হচ্ছেন। আপনি এখন প্রো-অ্যাকটিভ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও সাহসী। ব্রেনের ডান ও বাম বলয়ের কার্যক্রমের সমন্বয়ের মাধ্যমে আপনার চেতনায় যেমন ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে আপনি অনুভব করেছেন নতুন শক্তি। আপনি এখন নিজের কল্যাণ ছাড়াও অতিচেতনাকে অন্যের কল্যাণেও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আর এজন্যে আপনি নির্মাণ করবেন মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টার।

কমান্ড সেন্টারকে এককথায় বলা যায়, মনের বাড়ির শক্তি ও কল্যাণকেন্দ্র। মানব অস্তিত্বের যে অংশ স্থান-কালে (Time and space) আবদ্ধ নয়, সে অংশ এই কমান্ড লেভেলে প্রকৃতির নেপথ্য স্পন্দন ও নিয়মের সাথে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করে। আর আপনি জানেন, দৃশ্যমান সবকিছুর পেছনেই সক্রিয় রয়েছে প্রকৃতির এই নেপথ্য স্পন্দন ও নিয়ম। স্থান-কালের সীমানা অতিক্রম করে যোগাযোগ, তথ্যানুসন্ধান এবং নিজের ও মানবতার কল্যাণের সকল প্রক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয় সব উপাদানই রয়েছে এখানে। আর সবকিছুই থাকে সদা প্রস্তুত অবস্থায়।

কমান্ড সেন্টার মনের বাড়ির মূল শক্তি কেন্দ্র। মনের বাড়ির ড্রইংরুমের বাম দিকের কোনায় অবস্থিত দরজা দিয়ে ১০ থেকে ০ গণনা করে অত্যন্ত সুরক্ষিত কমান্ড সেন্টারে প্রবেশ করতে হয়। কমান্ড সেন্টার আপনি মাটির গভীরে দশতলা নিচে বিশাল কক্ষে স্থাপন করতে পারেন। আবার ড্রইংরুমের বাম কোনার অদূরে স্থাপন করতে পারেন। যেখানেই স্থাপন করুন এটি অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থান। সবসময় ১০ থেকে ০ গণনা করে প্রবেশ করবেন। এটি একটি বিশাল হল কক্ষ। এখানে আপনার জন্যে একটি বিশেষ কমান্ড চেয়ার, অন্তর্গুরুর জন্যে বিশেষ চেয়ার, তিনটি মনিটরিং স্ক্রিন, ডান দিকের কোনায় ‘রহম বলয়’ বা আশীর্বাদ বলয় বা ‘প্লেস অব ব্লিস’, ডানে একটা সোনার বাথ টাব, একটি টাইম মেশিন, যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ, মনিটরিং, নিরাময় ও সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনীয় সবকিছুই আপনি প্রথমবার ঠিকঠাক করে নেবেন। অবশ্য এরপরও আপনি প্রয়োজনমতো যে-কোনো জিনিস সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারেন।

মেডিটেশন : কমান্ড সেন্টার

১. নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ির ড্রইং রুমে গিয়ে বসুন। প্রয়োজনীয় অটোসাজেশন, মনছবি ইত্যাদি দেখুন।

২. এবার কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিন। ১০ গণনার সাথে সাথে আপনি ড্রইংরুমের বাম দিকের কোনায় অবস্থিত দরজা দিয়ে একটি করিডোর বা লিফটে প্রবেশ করবেন। ৯-৮-৭-৬। অনুভব করুন আপনি প্রবেশ করছেন গভীর থেকে গভীরে। ৫-৪-৩-২-১-০। আপনি পৌঁছে গেছেন কমান্ড সেন্টারে।

৩. বিশাল রুমটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিন। কমান্ড চেয়ার মনের মতো করে বানান। চেয়ারের হাতলে বা চেয়ারের সামনে টেবিলে সব রিমোট কন্ট্রোল সুইচ। চেয়ারের সামনে তিনটি মনিটরিং স্ক্রিন। বামেরটি অতীতের সবকিছু দেখার জন্যে। মাঝেরটি বর্তমান আর ডানে ভবিষ্যৎ দেখার জন্যে। হাতের ডান দিকে বাথ টাব ও ডান কোনায় হচ্ছে 'রহম বলয়' বা আশীর্বাদ বলয়। বামে রয়েছে টাইম মেশিন। এছাড়া মানুষের নিরাময় ও সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যে যা যা উপকরণ প্রয়োজন তা সবই এখানে রয়েছে। এছাড়াও আপনি যা কিছু প্রয়োজন মনে করেন স্থাপন করুন। একবার নির্মাণ করার পর এ সেন্টার সবসময় প্রস্তুত অবস্থায় আপনার জন্যে থাকবে।

৪. কমান্ড সেন্টার সাজানোর পর আপনি আবার ০ থেকে ১০ গণনা করে মনের বাড়ির ড্রইংরুমে চলে আসবেন। ০। মনের গভীর থেকে উঠে আসছেন আপনি। ১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯-১০। মনের বাড়ির ড্রইংরুমে আরাম করে বসুন। [এরপর আপনি সবসময়ই ১০ থেকে ০ গুণে সদা প্রস্তুত কমান্ড সেন্টারে যেতে এবং কাজ শেষে সেখান থেকে ০ থেকে ১০ গণনা করে বেরিয়ে আসতে পারবেন।]

৫. নিয়মমাফিক ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

কমান্ড সেন্টারে অন্যের নিরাময় প্রণালী

প্রথমে নিয়মমাফিক কমান্ড সেন্টারে যান। আপনি যার নিরাময় ও কল্যাণ করতে চাচ্ছেন, ৩-২-১-০ গণনা করে তাকে প্রথমে মাঝের স্ক্রিনে নিয়ে আসুন। নিরীক্ষাধীন ব্যক্তির ছবি আপনার সামনে মনিটরিং স্ক্রিনে এসে গেছে। মনে করুন আপনি তাকে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন। তার চেহারা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার নাক, চোখ, কপাল, চুল, চোখ, ঠোঁট, মুখ, অবয়ব ও উচ্চতা আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

এবার অবলোকন করুন স্ক্রিন থেকে বের হয়ে সে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার আপনি সামনে থেকে তাকে ভালোভাবে দেখুন। কপাল, চোখ, নাক, ঠোঁট, হাত, বুক, পেট, উরু, পা পর্যন্ত পুরো অবয়ব আপনি বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন ... এবার আপনি তাকে ঘুরে দাঁড়াতে বলার সাথে সাথে সে ঘুরে

দাঁড়িয়েছে। আপনি দেখছেন তার বামপাশ। এবার আপনি তাকে আবার ঘুরতে বলুন... এখন আপনি দেখছেন তার পেছন...। আবার ঘুরতে বলুন... আপনি দেখছেন তার ডানপাশ। আবার ঘুরতে বলুন... আপনি দেখছেন তার সম্মুখভাগ... সামনাসামনি খুব স্পষ্ট দেখছেন তাকে...

এবার সার্চ লাইটের মতো তার শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে যান... দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে দেখুন কোথাও আপনার দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে কিনা... দেখুন কোথাও কোনো অসুবিধা বা অস্বাভাবিকতা দেখছেন কিনা... শরীরের যে অঙ্গগুলো সুস্থ সেখানে দৃষ্টিপাত করলে উজ্জ্বল মনে হবে, কোনো অঙ্গ দুর্বল হলে সেটা নিষ্প্রভ ঠেকবে... কোনো অঙ্গ অসুস্থ হলে সে জায়গাটা ধোঁয়াটে বা কালচে বর্ণ বা দাগ দাগ মনে হবে। সহজ ফর্মুলা হচ্ছে অঙ্গ সুস্থ থাকলে সে স্থান সাদা ও উজ্জ্বল মনে হবে।

অসুস্থ থাকলে সে স্থান বিবর্ণ, ছাই রঙ বা কালো কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হবে। কোনো অঙ্গের অপারেশন হয়ে থাকলে সেখানে লক্ষ্য করলেও কালো দাগ দৃষ্টিগোচর হবে। কোনো অঙ্গ কেটে বাদ দেয়া হলে সে জায়গাটা হালকা হালকা বা একটু আবছা আবছা মনে হবে। শরীরের অন্য স্থানের তুলনায় কেটে বাদ দেয়া স্থানটা মনে হবে হালকা-মনে হবে ঘনত্ব কম। এবার ত্বকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন... কোনো চর্মরোগ থাকলে সে জায়গায় ত্বক একটু এবড়োখেবড়ো থাকবে।

নিরীক্ষাধীন ব্যক্তির বর্তমান রোগ বা অসুবিধা সম্পর্কে হয়তো আপনি জানেন। কিন্তু আপনি জানেন না, তেমন অসুবিধা বা রোগও তার থাকতে পারে-তাই আপনি পূর্ব ধারণা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যান ... এমন সব তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে, যা শুধু আপনাকে নয়, সে ব্যক্তিকেও অবাক করে দিতে পারে।

এবার আপনি আপনার সামনে অবস্থিত ব্যক্তিকে আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্যে তার শরীরের ভেতরে প্রবেশ করবেন। আপনি তার কপালে দুই ভ্রূর সংযোগস্থল দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করুন... মাথার খুলি পর্যবেক্ষণ করুন... খুলিতে কোনো আঘাতের চিহ্ন থাকলে সেখানটায় কালো মনে হবে... এবার খুলির ভেতরে প্রবেশ করুন... ব্রেনে কোনো আঘাত-টিউমার বা কোনো গুরুতর সমস্যা থাকলে সেখানে কালো দাগ দেখা যাবে... আর যদি বিষণ্নতা-দুশ্চিন্তা-হতাশা বা কোনো দুঃখ থাকে তাহলে ব্রেন কেমন যেন নিষ্প্রাণ ও ধোঁয়াটে মনে হবে-নিষ্প্রাণ বা ধোঁয়াটে মনে হলে ধরে নিতে হবে দুশ্চিন্তা বা দুঃখবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে... আর ব্রেনে প্রবেশ করার পর যদি আপনার মাথায় মুহূর্তের জন্যে কোনো অস্বস্তি অনুভব করেন তাহলে তার মাথাব্যথা বা মাইগ্রেন থাকতে পারে। আর ব্রেন যদি খুব প্রাণবন্ত অবস্থায়- উজ্জ্বল অবস্থায় দেখেন, তাহলে তার মাথায় কোনো সমস্যা নেই... সে প্রাণবন্ত, প্রাণোচ্ছল।

এবার আপনি ব্রেনের সাথে জড়িত স্নায়ু দিয়ে মেরুদণ্ডের মধ্যে ঢুকে যান... দেখুন মেরুদণ্ডের মাঝে কোথাও

কালচে দাগ বা অন্ধকার দেখছেন কিনা... যদি ঘাড়ের কাছে, মেরুদণ্ডে এ ধরনের দাগ মনে হয় তাহলে তার স্পন্ডিলাইটিস থাকতে পারে, যদি নিচের দিকে হয় তবে ব্যাকপেইন থাকতে পারে... আর যদি পুরো পরিষ্কার দেখেন তাহলে মেরুদণ্ড চমৎকার অবস্থায় রয়েছে।

মেরুদণ্ড থেকে আপনি ফুসফুসে প্রবেশ করুন... রোগ বা অস্বাভাবিক কিছু থাকলে সেখানে আপনি কালো দাগ দেখতে পাবেন। তা না হলে স্বাভাবিক অনুভূতি আসবে... এবার আপনি হার্টে প্রবেশ করুন... কোনো অসুবিধা আছে কিনা দেখুন... তার রক্তচাপ স্বাভাবিক কিনা তা দেখার জন্যে ধমনী আপনার হাতের মনোমিটার দ্বারা স্পর্শ করুন... মিটার রিডিংয়ে সবুজ আলো দেখা দিলে রক্তচাপ স্বাভাবিক, হলুদ আলো দেখা দিলে একটু অস্বাভাবিক আর লাল আলো দেখা দিলে খুব অস্বাভাবিক রক্তচাপ নির্দেশ করবে।

শরীরের ভেতরে রক্ত, বাইলস, টি-সেল, শ্বেতকণিকা-হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বা যে সব গ্ল্যান্ড থেকে হরমোন নিঃসরণ হয়, সে হরমোনের অনুপাত বা ইনসুলিনের পরিমাণ ইত্যাদি নিরূপণের জন্যে আপনি এই মনোমিটার প্রয়োগ করতে পারেন।

মিটার রিডিংয়ে সবুজ আলো দেখা গেলে যা নিরীক্ষণ করছেন তা স্বাভাবিক ও সুস্থ মাত্রায় রয়েছে। আর যদি মিটার রিডিং-এ হলুদ আলো দেখা যায় তাহলে তা স্বাভাবিক নয়-কিছুটা অস্বাভাবিক বা রোগগ্রস্ত। আর রিডিংয়ে লাল আলো দেখা গেলে বুঝতে হবে সমস্যা একটু বেশি-এক্ষেত্রে আশু মনোযোগ দিতে হবে। আপনি এক এক করে তার রক্তের হিমোগ্লোবিন, টি-সেল, ব্লাড সুগার ইত্যাদি মাপুন। প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন উৎপাদনের পরিমাণ মাপুন... যা যা মাপার প্রয়োজন মনে করেন মাপুন...

আপনি এতক্ষণ যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেন, তা আপনার অবচেতনে দৃঢ়মূল হয়ে রইল। ভবিষ্যতে মানবতার কল্যাণে আপনি এই জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবেন।

আপনি এবার এক এক করে লিভার... গলব্লাডার... পাকস্থলী... ক্ষুদ্রান্ত্র... বৃহদান্ত্র... কিডনি... ব্লাডার... তলপেট... সব ঘুরে ঘুরে দেখুন। কোথাও কোনো অসুবিধা দেখছেন কিনা... কোথাও অসুবিধা থাকলে আপনি সেখানে কালো দাগ বা অন্ধকার দেখবেন। তাছাড়া আপনি আপনার হাতের মনোমিটার প্রয়োগ করেও রিডিং নিতে পারেন...

এবার আপনি হাত, পা, ঊরুসহ প্রতিটি পেশির ভেতর দিয়ে ঘুরে আসুন... দেখুন কিছু দেখতে পাচ্ছেন কিনা ... এবার হাত-পায়ের হাড়ের জয়েন্টে জয়েন্টে দেখুন ... ইউরিক এসিড জমে আছে কিনা... জমে থাকলে সেখানে গুঁড়োগুঁড়ো ছাই রঙের পাউডারের মতো দেখবেন... বাত, আর্থ্রাইটিস থাকলে হাড়ের জয়েন্টগুলো একটু মোটাসোটা লাগবে।

এবার আপনি তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসুন। কমান্ড চেয়ারে আরাম করে বসুন।

নিরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে আপনি মাঝের স্ক্রিনে পাঠিয়ে দিন। এবার তাকে বামের স্ক্রিনে নিয়ে যান... এক এক করে তার অতীতে চলে যান, দেখুন উল্লেখযোগ্য কিছু দেখছেন কি-না... যা দেখলেন বা শুনলেন বা অনুভব করলেন তা মনে রাখুন...

এবার নিরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে মাঝের স্ক্রিনে নিয়ে আসুন। তার বর্তমানকে ভালোভাবে অবলোকন করুন। দেখুন তার কোনো পারিবারিক, পেশাগত, শিক্ষাগত বা আর্থিক কোনো সমস্যা আছে কিনা।

এবার আপনি তাকে আপনার সামনে নিয়ে আসুন। তার যা যা রোগ আপনার কাছে ধরা পড়েছে তা নিরাময়ের জন্যে কমান্ড সেন্টারে যত রকম ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োগ করুন। ওষুধ, ইনজেকশন, চুম্বক তরঙ্গ, লেজার বীম... কোনো পাথর কোথাও দৃষ্টিগোচর হলে আল্ট্রাসাউন্ড ওয়েভ দিয়ে তা গুঁড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিন... আর্থ্রাইটিস বা বাতের ক্ষেত্রে জমে থাকা ইউরিক এসিড শক্তিশালী দ্রবণ দিয়ে গলিয়ে বের করে দিন ... কোনো অঙ্গে বেশি অসুবিধা মনে হয়ে থাকলে তা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে আবার জায়গামতো বসিয়ে দিন... ডানদিকে অবস্থিত বাথ টাবে সর্বরোগহর আরক দিয়ে তাকে গোসল করতে দিন... দেখুন এই সর্বরোগহর আরক শরীরের মধ্য থেকে সকল বিষাক্ত ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বের করে দিচ্ছে... যে-কোনো ব্যথা-বেদনা নাশে শক্তিশালী চুম্বক তরঙ্গ প্রয়োগ করুন... রোগ নিরাময়ের জন্যে আপনি যা যা প্রয়োগ করা প্রয়োজন মনে করেন আন্তরিকতার সাথে প্রয়োগ করুন... দরদ ও মমতা দিয়ে প্রয়োগ করুন...

অবলোকন করুন তার নিরাময় সম্পন্ন হচ্ছে...

এবার তাকে ডান কোনায় অবস্থিত রহম বলয়ে নিয়ে যান ... অবলোকন করুন তার ওপর রহমত-বরকত-আশীর্বাদ-ব্লিসিং বর্ষিত হচ্ছে... তার সকল সমস্যা দূর হয়ে যাচ্ছে....

এবার তাকে ডান দিকের স্ক্রিনে নিয়ে আসুন ... ভবিষ্যতের তাকে দেখুন... দেখুন তার নিরাময় সম্পন্ন হয়েছে... দেখুন সকল সমস্যা কাটিয়ে তিনি সুখ-সমৃদ্ধির পানে এগুচ্ছেন... তার এই রোগমুক্তি ও সাফল্যকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্যে এবার মনে মনে ৩ বার কোয়ান্টা স্পন্দন সঞ্চার করুন...

এরপর আবার ০-১-২-৩ গণনা করলে তার ছবি মনিটরিং স্ক্রিন থেকে ফেড আউট হয়ে যাবে।

এরপর আপনি নিয়মমাফিক কমান্ড সেন্টার থেকে মনের বাড়ির ড্রইংরুমে প্রবেশ করুন এবং পরে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় চলে আসুন।

কমান্ড সেন্টারের বহুমুখী ব্যবহার

পরিচিত অপরিচিত যে-কারো রোগ নিরাময় ও কল্যাণ কামনার পাশাপাশি নিজের ও অন্যের কল্যাণ কামনা, নিজের আত্মিক ও মানসিক উন্নতি, বৈষয়িক ও পেশাগত উন্নতি, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড, পারিবারিক ও

দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নয়নে কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। ভালো কাজে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার কাজেও কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটরা কমান্ড সেন্টার ব্যবহারে ইতোমধ্যেই ব্যাপক সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। আসলে কমান্ড সেন্টারে গভীর আন্তরিকতার সাথে আপনি কারো জন্যে কিছু কামনা করলে তা মূলত একাগ্র প্রার্থনার রূপ নেয়। আর আন্তরিক একাত্ম প্রার্থনা অধিকাংশ সময়েই বাস্তব রূপ লাভ করে।

মাদকাসক্তি দূরীকরণে

এক তরুণ গ্রাজুয়েট-তখন সে রংপুর মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার ছোট ভাই রংপুর মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বড় ভাই এটা জানার পর নিয়মিত দুই বেলা ছোট ভাইকে কমান্ড সেন্টারে এনে পাশে বসিয়ে মমতা দিয়ে বোঝাতে লাগল, ভাই! ড্রাগস খাওয়া ভালো নয়।

একমাস দুমাস করে ছয় মাস পার হয়ে গেল। কিন্তু কোনো ফল নেই। বড় ভাই ধৈর্য ও একাগ্রতার সাথে চর্চা চালিয়ে গেল। সাত মাস পার হওয়ার পর ফল ফলতে শুরু করল। ছোট ভাই যখনই ড্রাগ খেতে বসে তখনই তার মনে হয় কে যেন কানে কানে বলছে, ভাই ড্রাগস খাওয়া ভালো নয়। কিছুদিন এরকম মনে হওয়ার পর ছোট ভাই ড্রাগস খাওয়া ছেড়ে দিল। পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে আবার নিজেকে ভালো ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল।

টেন্ডার দাখিল

ব্যবসায়িক টেন্ডার দাখিলের জন্যেও কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যায়। আপনি টেন্ডারের সর্বনিম্ন দর কী হবে এটা জানার জন্যে মাঝের মনিটর (২ নম্বর মনিটর) বা টিভির ওপর বাম দিকে একটি লাল বাতি এবং ডান দিকে একটি সবুজ বাতি স্থাপন করুন।

ধরুন আপনি একটি জিনিসের দর দিতে চাচ্ছেন ৪৮০ টাকা। ৪৮০ টাকার কথা চিন্তা করে মনিটরের দিকে তাকান। লাল বাতি জ্বলে উঠলে বুঝবেন এই দর সর্বনিম্ন নয়। তাহলে আস্তে আস্তে দর নিচের দিকে নামাতে থাকুন।

৪৭০ টাকা- আবারো লাল বাতি জ্বলে উঠল। বোঝা গেল এতেও চলবে না। নামাতে নামাতে ৪৪৫ টাকায় যখন এলেন সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। অর্থাৎ ৪৪৫ টাকা সর্বনিম্ন দর হবে।

একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেয়ার পর ঠিকাদারি ব্যবসায় মনোনিবেশ করলেন। একটা বড় অঙ্কের টেন্ডার দাখিল করবেন। ইঞ্জিনিয়াররা বলল একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক। এতে কাজ পাওয়া যাবে

কিন্তু কোনো লাভ হবে না। তিনি মেডিটেশন করলেন এক ঘণ্টা।

এক ঘণ্টা পর মেডিটেশন থেকে উঠে বললেন দরপত্রের অঙ্ক আরো এক কোটি টাকা বাড়াতে। ইঞ্জিনিয়াররা হা হা করে উঠল, তাহলে আমরা টেন্ডার পাব না। তিনি বললেন, আমরাই পাব। ইঞ্জিনিয়াররা দরপত্র পুনর্বিন্যাস করল সেভাবে। তিনিই সর্বনিম্ন হয়ে টেন্ডার পেলেন। এক কোটি টাকাই লাভ।

ইন্টারভিউ/প্রমোশন

চাকরি বা প্রমোশনের জন্যে ইন্টারভিউ বোর্ডের সম্মুখীন হতে হবে। আগে থেকেই খোঁজ নিন কারা ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকবেন। পর পর কয়েকদিন পুরো বোর্ডকেই কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। যেভাবে একজন ইন্টারভিউ দেয় সেভাবে দিন। আপনার দক্ষতা, যোগ্যতা ও আনুগত্য সম্পর্কে বলুন। দেখুন আপনার উপস্থিতিই তাদেরকে ইমপ্রেস করছে। তারা আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আপনার যথাযথ মূল্যায়ন করে আপনার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করছেন।

প্রমোশনের ফাইল বসের কাছে আটকে আছে। বসকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। বসের রুমে ঢুকলে আপনি যেমন সুন্দর বিনয়ী আচরণ করতেন, এখানেও তেমনি সুন্দর ব্যবহার করুন।

আপনাকে প্রমোশন দিলে বসের কী লাভ, প্রতিষ্ঠানের কী লাভ তা সুন্দরভাবে তুলে ধরুন। অবলোকন করুন বস আপনার বক্তব্য উপলব্ধি করছেন। আপনাকে প্রমোশনের ফাইল সই করে যথাযথ নির্দেশ দিচ্ছেন। কয়েকদিন অনুশীলন করে বাস্তবে বসের সাথে দেখা করুন। বিল/বদলি বা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত ফাইলের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। তবে আপনার বিল যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে আটকে রাখা হয়ে থাকে তাহলে এ পদ্ধতি কখনো কার্যকর হবে না। শুধুমাত্র অযৌক্তিকভাবে বিল আটকে রাখা হয়ে থাকলেই এ পদ্ধতি কার্যকর হবে।

ভাইভা বোর্ড

ভাইভা পরীক্ষা দেয়ার আগেও কমান্ড সেন্টারে ভাইভা বোর্ডে যারা রয়েছেন তাদেরকে এনে সম্মানের সাথে বসিয়ে সেখানেই আপনি আপনার ভাইভা পরীক্ষা দিতে পারেন। সেখানে দেখুন সম্মানিত শিক্ষকরা আপনি যে বিষয়গুলো সবচেয়ে ভালোভাবে পড়েছেন সেখান থেকেই প্রশ্ন করছেন। আর আপনি চমৎকার উত্তর দিয়ে তাদেরকে মুগ্ধ করছেন। আপনি একাগ্রচিত্ত হতে পারলে বাস্তবে ভাইভা বোর্ডের সামনে যখন যাবেন, তখন দেখবেন আপনার সবচেয়ে ভালোভাবে পড়া বিষয়গুলো থেকেই তারা প্রশ্ন করছেন। আর আপনি চমৎকার জবাব দিচ্ছেন।

দেনাদারকে নিয়ে আসা

কয়েকদিনের মধ্যে ফেরত দিয়ে দেবে বলে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আর ফেরত দেয়ার নাম নেই। তাকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। আপনার যে টাকার প্রয়োজন এটা তাকে জানান। তার যে দেনা শোধ করে দায়মুক্ত হওয়া দরকার সেটাও তাকে বলুন। এক গ্রাজুয়েট দেনাদারের কাছ থেকে এই প্রক্রিয়ায় পাঁচ বছর পর পাওনা টাকা আদায় করেন। দেনাদার নিজেই তার খোঁজ নিয়ে টাকা দিয়ে যায়।

পারিবারিক মত বিরোধ দূর

স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ি, বন্ধু-বান্ধব কারো সাথে মতবিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্যে তাকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। আপনি যে তাকে কত ভালবাসেন তা বলুন। আপনাদের মাঝের আনন্দময় স্মৃতির কথা তাকে বলুন। তারপর আসল ঘটনা ব্যাখ্যা করুন। অবলোকন করুন তিনি তার ভুল বুঝতে পারছেন। মমতা ভালবাসায় আপনারা পারস্পরিক একাত্মতা অনুভব করছেন। ক্রমাগত কয়েকদিন এটির পুনরাবৃত্তি করুন। বাস্তবে আপনি তার সাথে প্রো-অ্যাকটিভ আচরণ করুন। দেখবেন চমৎকার ফল পাবেন। যে-কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে।

অস্ত্রোপচারের আগে

পিজির একজন পেডিয়াট্রিক সার্জন সার্জারির ক্ষেত্রে কমান্ড সেন্টারের চমৎকার ব্যবহার করেছেন। তিনি অপারেশনের আগে রোগীর সকল কাগজপত্র দেখে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে রোগীকে এনে অপারেশনের পুরো প্রক্রিয়া সম্পাদন করতেন। তারপর বাস্তবে ফিরে এসে অপারেশন থিয়েটারে রোগীকে অপারেশন করতেন। দেখা গেল, এর ফলে তিনি অপারেশন করার সময় প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। আগে যে অপারেশন করতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগত, সে অপারেশন তিনি ৪৫-৫০ মিনিটেই সম্পন্ন করতে পারছেন। আর আমরা জানি, রোগীর অপারেশনে সময় যত কম লাগে তত দ্রুত সে নিরাময় লাভ করে।

যান্ত্রিক ত্রুটি বা তথ্য বের করার জন্যে

কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি বের করার জন্যে কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। এক দুরন্ত কিশোর কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। কোনো যন্ত্রপাতি হাতের কাছে পেলে সে তা খুলে সবকিছু দেখতে চাইত। তার দুরন্তপনায় বাবা/মা সবসময় তটস্থ থাকতেন। একবার বাবার কম্পিউটার খারাপ হয়ে গেল। সে ভাবল বাবাকে সারপ্রাইজ দেবে। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে গিয়ে অন্তর্গুরুর কাছে জানতে চাইল কম্পিউটারের অসুবিধা কোথায়। অন্তর্গুরু তাকে বললেন, তেমন কিছু হয় নি। এত নম্বর এত নম্বর পার্টস খারাপ। পার্টস দুটো বদলে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। খরচ পড়বে চার/পাঁচশ টাকা।

বাবা বাসায় আসতেই সে বাবাকে বলল, কম্পিউটারের তেমন কিছু হয় নি। এত নম্বর এত নম্বর পার্টস খারাপ। বদলাতে চার/পাঁচশ টাকা লাগবে। কথা শুনে বাবা একেবারে গামা লেভেলে। বাবার ধারণা ছেলে কম্পিউটার খুলেছে। তা না হলে সে পার্টসের নম্বর জানল কীভাবে। ছেলের আর কোনো কথাই শুনতে চাইলেন না তিনি। খুব রাগ করলেন।

পরে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারকে যখন দেখানো হলো, ইঞ্জিনিয়ার সেই একই কথা বললেন। এবার বাবার বিস্ময়ের পালা। ছেলে না হয় কম্পিউটার খুলে পার্টসের নম্বর দেখেছিল, কিন্তু এই পার্টস দুটিই যে খারাপ তা তো তার বোঝার কোনো উপায় নেই। বাবা এরপর ছেলের কাছ থেকে সব শুনে কোর্সে অংশ নিয়ে নিজেই পুরো ঘটনা বলেছিলেন প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে।

কোথায় কী করছে!

ছেলে কলকাতায় গিয়েছে। যাওয়ার পরে দুই দিন কোনো খোঁজ নেই। ছেলে, বাবা ও মেয়ে পরিবারে তিনজনই কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। মেয়ে ডাক্তার। যাওয়ার পর দুদিন টেলিফোন না করায় বাবা উদ্বিগ্ন। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় মেয়ে বাবাকে দেখতে এসে বাবাকে উদ্বিগ্ন দেখে কারণ জিজ্ঞেস করল।

বাবা কারণ বললেন। মেয়ে বলল, টেলিফোন করে নি তাতে কী? আপনি কমান্ড সেন্টারে গিয়ে দেখেন, ও কোথায় আছে। বাবা মাগরিবের নামাজ পড়ে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে গিয়ে ছেলের বর্তমান অবস্থান দেখার চেষ্টা করতেই কলকাতার একটি সিনেমা হলের গেট ভেসে এলো। ছেলে সিনেমা হলে ঢুকছে। বাবা ছেলেকে তার উদ্বেগের কথা জানালেন। বললেন, শিগগিরই টেলিফোন করতে।

ওদিকে সিনেমা দেখতে দেখতেই ছেলের মনে পড়ল বাড়িতে টেলিফোন করা হয় নি। হল থেকে বেরিয়েই ছেলে বাবাকে টেলিফোন করল। বাবা টেলিফোন ধরে ছেলের কণ্ঠস্বর শুনেই জিজ্ঞেস করলেন, সন্ধ্যায় তুই সিনেমা হলে ছিলি। ছেলে তো বিস্মিত! বাবা জানল কীভাবে? বাবা তাকে বললেন, কমান্ড সেন্টারে তিনি তাকে সিনেমা হলে ঢুকতে দেখেছেন।

ভিসা লাভে

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা একটি পশ্চিমা দেশের ভিসা নিতে যাবেন। রাতে কমান্ড সেন্টারে দেখলেন, লাইনে দাঁড়িয়েছেন। কাউন্টারে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা। তাকে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই ভিসা দিয়ে দিচ্ছে। পরদিন সকালে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। কাউন্টারে দেখেন অন্য পুরুষ, অন্য মহিলা কাজ করছেন। তিনি একটু বিব্রতবোধ করলেন। লাইন এগুচ্ছে। শিক্ষিকার সামনে এখন মাত্র একজন।

এ সময় পালা বদল হলো। যারা কাজ করছিলেন তাদের বদলে অন্য ২ জন এসে কাউন্টারে বসলেন।

শিক্ষিকা বিস্মিত হয়ে দেখলেন কমান্ড সেন্টারে যাদের দেখেছিলেন, এরা তারাই। শিক্ষিকা কাউন্টারে পৌঁছার পর এরা শুধু পাসপোর্ট দেখলেন, মৃদু হাসলেন। পাসপোর্ট রেখে বললেন, বিকেলে ভিসা নিয়ে যাবেন।

একাত্ম সাধনায়

যারা আত্মিক-আধ্যাত্মিক উন্নতি চান, তাদের সাধনার এক চমৎকার জায়গা কমান্ড সেন্টার। কমান্ড সেন্টারে গিয়ে রহম বলয়ে বসে অন্তর্গুরুর সাথে একাত্ম হয়ে ইসমে আজম বা মহানাম জপ করুন, দোয়া দরুদ পড়ুন, বীজমন্ত্র বা হরিনাম জপ করুন, পরম প্রভুর আরাধনা করুন অর্থাৎ আপনি আপনার ধর্মবিশ্বাস অনুসারে স্রষ্টায় নিজেকে নিবেদিত করুন, প্রার্থনা করুন। এক আলাদা অনুভূতি আলাদা অনুভবের জগতে প্রবেশ করবেন আপনি। [তবে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হতে হলে একজন আলোকিত গুরু, মুর্শিদ বা গাইডের কাছে বায়াত বা দীক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন। বায়াত বা দীক্ষা গ্রহণ ছাড়া নিজে নিজে আধ্যাত্মিক সাধনা এক পিচ্ছিল পথ। যে-কোনো সময়ই পা পিছলে পাহাড় থেকে একেবারে গিরিখাদে পড়ে যেতে পারেন।]

কমান্ড সেন্টারের অভিজ্ঞতা

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের সবচেয়ে প্রিয় স্থান কমান্ড সেন্টার। কারণ এখানে পৌঁছে তারা সহজেই স্থান-কালের সীমানা অতিক্রম করতে পারেন এবং মন হয়ে যায় ত্রি-কালদর্শী। এটা এমন এক জায়গা যেখানে তারা সহজেই প্রকৃতির নেপথ্য স্পন্দনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন। যাকে তারা জীবনে দেখেন নি, যার কথা তারা জীবনে শোনেন নি, শুধু তার নাম, বয়স ও ঠিকানা বলার সাথে সাথে তার এমন হুবহু বর্ণনা দিতে থাকেন যে, প্রশ্নকর্তা নিজেই হতবাক হয়ে যান!

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আজিজ মেহের একটি কেস দিচ্ছিলেন পায়োনিয়ার ব্যাচের নায়লাকে। নায়লা ভদ্রলোকের বিবরণ ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যা বলল, তা জনাব আজিজ মেহেরকেও বিস্মিত করে দেয়।

সেই বৈঠকেই বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক ওবেইদ জাগীরদার তার বোনের নাম, বয়স ও ঠিকানা বলার পর তার বোন সম্পর্কে বলতে বলতে নায়লা বোনের ছেলে সম্পর্কে বলা শুরু করল। বোনের ছেলের চোখে গাড়ির কাচ ঢুকে যাওয়ার কথাও বলল। সে বলল, আমি দেখেছি গাড়ি একসিডেন্ট করে কাচ ঢুকছে তার চোখে। জনাব জাগীরদার মাথা নেড়ে জানালেন, বছরখানেক আগে এ ঘটনা ঘটেছে।

শুধু যারা অনেক দিন ধরে চর্চা করছেন তারাই নন, অন্যের সম্পর্কে এই বলার ক্ষমতা অনেক গ্রাজুয়েট প্রদর্শন করেন, ফাউন্ডেশন কোর্সের চতুর্থ দিনেই। প্রতিটি ব্যাচেই তারা চতুর্থ দিন বিকেলে ‘কোয়ান্টাম গেমে’ সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির চেহারা, ওজন, দৈহিক গঠনের বিবরণ এবং রোগ-ব্যাধি, বর্তমান অবস্থা ছেলেবেলার

ঘটনা এমনভাবে বলেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা শতকরা ৯৫ ভাগ নির্ভুল হয়ে দাঁড়ায়। আর এ ঘটনা চমৎকৃত করে অংশগ্রহণকারী সবাইকে।

সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা

মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে গিয়ে 'কোয়ান্টাম গেম' যে কত থ্রিলিং ও আকর্ষণীয় হয়, তা বোঝানোর জন্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব খায়রুল আনোয়ারের অভিজ্ঞতা হুবহু উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট হবে।

জনাব আনোয়ার বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্যে ফিলিপস পুরস্কারে ভূষিত এবং বর্তমানে এনটিভির বার্তা সম্পাদক। জনাব আনোয়ারের অভিজ্ঞতার বিবরণ :

'সিনেমার পর্দায় পৃথিবীর বিখ্যাত জাদুকর হুডিনীর জাদু দেখেছি। দেখেছি বাংলাদেশের জাদুশিল্পী জুয়েল আইচের জাদু। কিন্তু এই জাদুর চেয়েও বড় কিছু যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ১৯ ফেব্রুয়ারি বিকালের যে অভিজ্ঞতা, তাকে কী বলব, জাদু, নাকি অন্য কিছু।

বিস্ময়কর এই অভিজ্ঞতা আমার অর্জিত হয়েছে হোটেল অবকাশে, কোয়ান্টাম মেথডের দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণে। এ মেথড সম্পর্কে আমার কিছু জানা ছিল না। আমার একজন অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী এই কোর্স গ্রহণে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন।

কোর্সে অংশ নিয়ে জানতে পারি, কোয়ান্টাম মেথড হচ্ছে একটি মননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। আর এই মননিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টেনশনমুক্ত হওয়া, আত্মবিশ্বাসী হওয়া, জীবনের লক্ষ্য অর্জন করা ইত্যাদি সম্ভব। শ্রদ্ধেয় মহাজাতক যেভাবে কোর্স পরিচালনা করছিলেন তাকে এককথায় বলা চলে অপূর্ব।

কোর্সে অংশগ্রহণকারী কারো হাতে কাগজ কলম ছিল না। ছিল না টেপরেকর্ডার। অথচ সবাই সবকিছুই সুন্দরভাবে উপলব্ধি করছিলেন, আত্মস্থ করতে পারছিলেন।

সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা। দশ ঘণ্টার একটানা ক্লাস। মাঝে-মধ্যে ১০/১৫ মিনিটের বিরতি। দীর্ঘসময়ের এই ক্লাসে আমরা কেউ ক্লান্তি বোধ করি নি এক মুহূর্তের জন্যে।

বরং সন্ধ্যায় ক্লাস শেষে মনে হতো, যদি আরো কিছু সময় চলত। এসব সম্ভব হয়েছে মহাজাতকের চমৎকার উপস্থাপনার জন্যে।

'১৯ ফেব্রুয়ারি ছিল কোর্সের শেষ দিন। এদিন শেখানো হয় কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা অর্জন করা। চার দিনের কোর্স শেষে কে কতখানি এই ক্ষমতা অর্জন করেন তার পরীক্ষাও দিতে হলো সবাইকে। শুরুতে প্রথম এই পরীক্ষা দিলেন জেসমীন চৌধুরী, কোর্সের এক সহ শিক্ষার্থিনী। আর তা সবাইকে চমকে দিল। জীবনে যাকে কখনো দেখেন নি, কখনো যার সম্পর্কে কিছু শোনেন নি, এককথায় যার সম্পর্কে

কোনো কিছুই জানেন না-এমন একজন সম্পর্কে শুধু নাম আর বর্তমানে কোথায় থাকেন শুনে সবকিছুই বলে দিলেন মিস জেসমীন চৌধুরী।

একে একে তিনি বলে যেতে লাগলেন সেই অজ্ঞাত মানুষটি দেখতে কেমন, তার গায়ের রঙ কেমন, সাধারণত কোন রঙের জামা-প্যান্ট পরে থাকেন, তার কোনো রোগ আছে কিনা, থাকলে কী রোগ, মানুষ হিসেবে তার বৈশিষ্ট্য কী কী-এককথায় সবকিছু। আমার মনে হলো জাদু দেখছি।

শুরু থেকে বলি। অদেখা, অচেনা মানুষ সম্পর্কে বিবরণ দেয়ার জন্যে একজনকে 'সাইকি' হতে হয়। এসময় একজনকে গাইড, আর একজনকে রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি বিকেলে চার দিনব্যাপী কোর্সের শেষ পর্যায়ে মহাজাতকের আহবানে 'সাইকি' হয়ে মঞ্চে এলেন জেসমীন চৌধুরী। মঞ্চে এসে বসার সময় জেসমীনকে কিছুটা নার্ভাস মনে হচ্ছিল। বাকিরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন, জেসমীন কি অজানা-অচেনা মানুষ সম্পর্কে ঠিক ঠিক বলতে পারবেন? আমাকে নিতে হলো রিপোর্টারের দায়িত্ব। মহাজাতক হলেন 'গাইড'।

আমাকে বলা হলো আমার পরিচিত যে-কোনো লোক অথবা আত্মীয় বা বন্ধু সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিখে আনতে। আমি রুমের বাইরে গিয়ে একা বসে আমার বন্ধু সম্পর্কে বিবরণ লিখলাম। লেখা শেষে মঞ্চে এসে বসলাম।

কাগজটা আমার হাতেই রইল। শুধু বন্ধুটির নাম আর বর্তমানে কোথায় থাকেন; অন্য একটি কাগজে লিখে তা মহাজাতকের হাতে দিতে হলো।

জেসমীন চোখ বন্ধ করে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে চলে গেলেন। সেখানে পৌঁছে জেসমীন আমার বন্ধু সম্পর্কে একে একে সবকিছু বলে যেতে লাগলেন। যার সবই ঠিক ঠিকভাবে মিলে যাচ্ছিল। আমার বন্ধুর দেহের বর্ণনা, ভ্রূ চওড়া কিনা, সাধারণত কোন রঙের জামা-কাপড় পরেন, রোগের বিবরণ সবই বললেন।

জেসমীন বলার সময় আমি তা একটি কাগজে লিখে নিচ্ছিলাম। বলা শেষ হলো। এবার যাচাইয়ের পালা। আমি আগে আমার বন্ধু সম্পর্কে যে বিবরণ লিখে রেখেছিলাম তার সঙ্গে জেসমীনের বিবরণ মিলিয়ে দেখা শুরু করলাম। আর এটা মেলাতে গিয়ে আমি রীতিমতো বিস্মিত হলাম। সবকিছুই হুবহু মিলে যাচ্ছিল।

এমনকি যে দুয়েকটি বিষয় আমি আগে লিখি নি, যেমন আমার বন্ধুর গোঁফ সম্পর্কে কিছু লিখি নি। জেসমীন আমার বন্ধুর যে গোঁফ আছে তা-ও বলে দিলেন। রোগ সম্পর্কে বলেছিলেন, আমার বন্ধুর গ্যাস্ট্রিক আছে, আর পায়ে সমস্যা আছে। আমার বন্ধুর গ্যাস্ট্রিক সম্পর্কে আমার কিছু জানা ছিল না।

যা হোক, সব বিবরণ মিলে যাওয়ায় জেসমীনকে পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ১০০-ই দিতে হলো। আমার

জন্যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। শেষদিনের এই কোর্স শেষে বাংলা একাডেমীর বইমেলায় গেলাম। বইমেলার একটি স্টলে সেই বন্ধুসহ আমরা কয়েকজন মাঝে-মধ্যে আড্ডা দিতাম। আড্ডার এক পর্যায়ে আমি বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোর কি কখনো গ্যাস্ট্রিক ছিল?

বন্ধুটি আমাকে অনেকটা ধমকের সুরে বলল, তুই ব্যাটা আমার গ্যাস্ট্রিকের খবর জানিস না? বন্ধুর উত্তর শুনে আমি তো থ'। মনে মনে জিজ্ঞাসা করলাম, এ-ও কি সম্ভব?

জেসমীন চৌধুরীর অভিজ্ঞতা-

'মনের পর্দায় দেখছিলাম লোকটাকে। সংশয় ছিল, কী দেখছি? বাস্তব না অবাস্তব, সত্য না মিথ্যা? এমন সময় গুরু মহাজাতকের কণ্ঠস্বর আমাকে ধাক্কা দিল, 'আপনি এ লেভেলে যা দেখছেন সত্যি দেখছেন। আপনি নির্দ্বিধায় বলে যান।'

'কোয়ান্টাম মেথড ফাউন্ডেশন কোর্সের চার দিনের প্রশিক্ষণের শেষ দিনে কেস স্টাডি করছিলাম। কেস স্টাডিতে অংশগ্রহণের জন্যে আমাকে ডাকার পর প্রথমে আমি 'না' করি। কেন জানি সংকোচ বোধ হচ্ছিল। তবুও শেষ পর্যন্ত যেতে হলো।

গুরুর নির্দেশনায় মনের বাড়ি থেকে কমান্ড সেন্টারে প্রবেশ করলাম। আমাকে একটা অপরিচিত লোকের নাম এবং ঠিকানা বলে তার ছবি কোয়ান্টাম স্ক্রিনে দেখতে বললেন। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম একজন মানুষকে, জীবনে আর কখনো যাকে দেখি নি, যার সম্পর্কে কিছুই জানি না। গুরুর নির্দেশে তার সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম।

মহাজাতক আমাকে মঞ্চে তুলে প্রমাণ করলেন পীর আওলিয়া দরবেশ না হয়েও অপরিচিত যে-কোনো মানুষের শারীরিক অবয়ব বা রোগ-পীড়া সম্পর্কে বলা সম্ভব। মনিটরের সাহায্যে আমি অনর্গল অচেনা ব্যক্তিটি সম্পর্কে বলে যেতে থাকলাম। নিজের কথা শুনে নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, কী সব বলছি আমি।

'শেষে গুরু যখন ফিরে আসতে বলছিলেন বাস্তব পৃথিবীতে তখন কেন জানি আমার মনে হচ্ছিল ওখানে থেকে গেলেই বোধ হয় জীবন সার্থক হতো। কারণ ওখানে সবকিছুতে আমাকে সাহায্য করার জন্যে হাজার বছর বয়সের মহাজ্ঞানী গুরু আছেন। হাত বাড়ালেই সবকিছু এখানে পাচ্ছি। কোনো দুঃখ নেই, হতাশা নেই, যন্ত্রণা নেই। শুধুই আনন্দ। বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসার পর নিজের আশ্চর্য ক্ষমতা অনুভব করে কেবলই বিস্মিত হচ্ছিলাম।'

এসব কীভাবে সম্ভব

আপনার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে, এসব কীভাবে সম্ভব। সম্ভব হলে এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কি? পৃথিবীর বহু কিছুরই ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিয়েছে। আবার অনেক ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে নি।

কঠিন অবস্থায় সকল বস্তুর আয়তন কমে। কিন্তু পানি কঠিন হয়ে বরফ হলে আয়তন বাড়ে। বিজ্ঞানের সূত্র এর ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। বলেছে এটি ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানের জগতে এ ধরনের ব্যতিক্রম ও বিস্ময়ের কোনো শেষ নেই। আধুনিক বিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়েই মনের এই শক্তির ব্যাখ্যা দেয়া যায়।

১০০ বছর আগের কথা চিন্তা করুন। আপনাকে কেউ যদি বলত, ঘরের কোনায় আমার একটি বাক্স আছে। এখন এই মুহূর্তে ফ্রান্সে যে ফুটবল খেলা হচ্ছে এই বাক্সে আমি তা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আপনি তাকে কী বলতেন? বলতেন পাগল! আর এখন ঘরে বসে টেলিভিশনে আপনি ফুটবল খেলা দেখছেন। আপনার এ কথাকে যদি কেউ বিশ্বাস না করে তাকে আপনি কী বলবেন? বলবেন পাগল!

মস্তিষ্ক যে যন্ত্র তৈরি করেছে তা দিয়ে যদি বিশ্বের অপর প্রান্তের এই মুহূর্তের ঘটনা দেখা যায়, তাহলে এই মস্তিষ্ককে বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহার করেও তা দেখা যেতে পারে।

ঘটনাটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারেন, প্রতিটি মন হচ্ছে বিশ্বমন নামক এক সুপার সুপার সুপার কম্পিউটাররূপী মহাজাগতিক জ্ঞানভাণ্ডারের (Cosmic information super highway) এক একটি টার্মিনাল। সুপার কম্পিউটারের যতগুলো টার্মিনালই থাকুক না কেন, যে-কোনো টার্মিনাল থেকে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা সুপার কম্পিউটারের কেন্দ্রের সাথে যেমন যোগাযোগ করা যায়, তেমনি মন ধ্যানের স্তরে বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সি সৃষ্টি হলে বিশ্বমনরূপী মহাজাগতিক জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত তথ্য লাভ করে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগতে পারে, আমি আমার মস্তিষ্কে তথ্য প্রেরণের মাধ্যমে তথ্যমালাকে পরিবর্তিত করে রোগমুক্তি ও কল্যাণ সাধন করতে পারি এটা বৈজ্ঞানিকভাবেই সত্য। কিন্তু বহুদূরে অবস্থিত আরেকজনকে পাঠানো তথ্যমালা সে পাবে কীভাবে?

এর সহজ উত্তর হচ্ছে টেলিপ্যাথি। এই টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা আমাদের সাধকরা হাজার হাজার বছর ধরে প্রয়োগ করে আসছেন। এর এত অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, তা উল্লেখ করতে গেলে এটা একটা বিশ্বকোষ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন করবেন, আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ কি টেলিপ্যাথি বিশ্বাস করে? এই শতাব্দীতে টেলিপ্যাথি গবেষণার অগ্রপথিক হচ্ছেন ডিউক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেবি রাইন। স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পরিচালক

হিসেবে তিনি ইএসপি গবেষণায় নতুন যুগের সূচনা করেন।

অ্যাপোলো-১৪-এর নভোচারী এডগার মিচেল চন্দ্র পৃষ্ঠ থেকে ভূ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিউস্টনের সাথে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই যোগাযোগ এত সফল হয়েছিল যে, নভোচারী মিচেল ভূপৃষ্ঠে ফিরে এসে গড়ে তোলেন এক নতুন প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব নোয়েটিক সায়েন্সেস।

টেলিপ্যাথি নিয়ে দুই পরাশক্তির গবেষণার প্রতিযোগিতা বিজ্ঞানীমহল খুব ভালোভাবেই জানেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ৬০-এ দশকে এই গবেষণায় এত এগিয়ে গিয়েছিল যে, মস্কো থেকে কমান্ডার ব্ল্যাডিভস্টকে মোর্স কোডে কমান্ড পাঠাচ্ছেন আর ব্ল্যাডিভস্টকে কমান্ডার তা গ্রহণ করে আবার মোর্স কোডে জবাব পাঠাচ্ছেন।

বিজ্ঞানীরা টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন কিনা এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের পত্রিকা 'নিউ সায়েন্টিস্ট' এক জরিপ চালিয়েছিল। জরিপে দেখা গেল শতকরা ৭৫ জনই টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের জন্যে টেলিপ্যাথি হচ্ছে এক নতুন বাস্তবতা।

কমান্ড সেন্টারে আপনি আপনার মন ও মস্তিষ্ককে বিশেষ স্তরে নিয়ে গিয়ে সেই বাস্তবতাকেই কাজে লাগাচ্ছেন। আপনার কল্যাণ কামনার তথ্যমালা আপনার মন থেকে অপর ব্যক্তির মনে চলে যাচ্ছে। আর এরপর তা সেই ব্যক্তির মস্তিষ্কের তথ্যভাণ্ডারকে পুনর্বিন্যস্ত করছে। মস্তিষ্ক তার রোগমুক্তির প্রক্রিয়া সক্রিয় করছে, কল্যাণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করছে। তার জন্যে নতুন বাস্তবতা নির্মাণ করছে।

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, কমান্ড সেন্টারে আপনি টেলিপ্যাথির এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকেই কাজে লাগাচ্ছেন। আর প্রত্যেক মানুষের মাঝেই এই ক্ষমতা সুপ্ত রয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃত ডা. কার্ল গুস্তব ইয়াং খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন, মানব অস্তিত্বের মাঝে এমন একটি অংশ রয়েছে, যা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে চলে যেতে পারে।'

সতর্কবাণী

কমান্ড সেন্টারে আপনার অতিচেতনাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সবসময় স্মরণ রাখবেন, এটি শুধু নিজের কল্যাণে ও অন্যের কল্যাণে প্রয়োগ করা যাবে। কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজে লাভবান হওয়া বা কাউকে অপদস্থ বা জব্দ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই শক্তিকে ব্যবহার করতে গেলে আপনার ধ্যানের স্তরই নষ্ট হয়ে যাবে, আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

'দেখ আমি কত কিছু পারি' এই ধরনের মনোভাব নিয়ে কাউকে মোহিত করা, নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করা, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উদ্দেশ্য নিয়ে কখনোই কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করতে যাবেন না। শুধুমাত্র কল্যাণ করার আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়েই কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করবেন।

অধ্যায়-২৬

অন্তর্গুরু

অন্তর্গুরু হচ্ছেন আপনার অন্তরের পথ প্রদর্শক। তাকে কেউ গুরু বলেন, কেউ কামেল পীর, কেউ মুর্শিদ, কেউ ওস্তাদ বা কেউ বলেন গাইড। যে নামেই তাকে ডাকুন তিনি হচ্ছেন আপনার সকল ব্যাপারে সঠিক পরামর্শদাতা, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী। কমান্ড সেন্টার নির্মাণ করে সবকিছু ঠিকমতো সাজানোর পর ধ্যানের বিশেষ স্তরে অন্তর্গুরুর আগমন ঘটে। অন্তর্গুরু প্রথমে সকল অদৃশ্য অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তির জন্যে 'সাইকিক বর্ম' প্রদান করেন। এই সাইকিক বর্ম অতীতের সকল অশুভ প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং ভবিষ্যতের এ ধরনের প্রভাব থেকে তাকে পুরোপুরি নিরাপদ রাখে।

অন্তর্গুরু বা মুর্শিদ কে হতে পারেন? আপনি যাকে মনে করেন যে, তিনি আপনাকে জীবনের পথে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন, তাকেই আপনি অন্তর্গুরু হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। তবে যে ধ্যান বা মেডিটেশন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া আপনি অনুসরণ করবেন, সে প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক বা প্রশিক্ষককে অন্তর্গুরু হিসেবে গ্রহণ করা সবসময়ই বেশি কার্যকরী।

বাস্তব জীবনে আপনার বিষয় সম্পর্কে গুরুর কোনো জ্ঞান না-ও থাকতে পারে কিন্তু ঐ স্তরে তিনি সে বিষয়ে আপনার চেয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। অন্তর্গুরু সবসময়ই আপনার প্রতি বাবা/মায়ের মতো স্নেহশীল এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর চেয়েও ঘনিষ্ঠ।

অন্তর্গুরুকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যত তীব্র হবে তত সহজে আপনি তার দর্শন লাভ করবেন। কখনো কখনো এই দর্শন এত স্বতঃস্ফূর্ত হয় যে, তা আগে থেকে ধারণা করা যায় না।

আবার কখনো কখনো গুরুর স্পষ্ট দর্শন লাভে সময় লাগে। এমনও হয়েছে তিন বছর নিয়মিত মেডিটেশন করার পর গুরুর দর্শন লাভ হয়েছে। তবে গুরুকে অবলোকন করুন আর না-ই করুন, গুরুকে অনুভব করে নিলেই তা আপনার কাজ পরিচালনার জন্যে যথেষ্ট।

অন্তর্গুরুর সাক্ষাৎ পেতে দেরি হলেও কমান্ড সেন্টারে অন্যের নিরাময় ও কল্যাণ সাধনের কোনো কাজ পরিচালনায় আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আবার অনেক সময় যাকে গুরু হিসেবে কামনা করছেন তার পরিবর্তে অন্য কারো আগমন ঘটতে পারে গুরু হিসেবে। কিন্তু তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। তিনিও যথাযথ পথ প্রদর্শক হিসেবেই আপনার নিত্যদিনের সঙ্গী হবেন। এ ব্যাপারে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা রয়েছে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের।

শুধু এদেশেই নয় বিদেশেও যারা এই চর্চা করেন, তাদেরও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা বিচিত্র। প্রখ্যাত মার্কিন শল্য চিকিৎসক ডা. বার্নি সীগেলের ঘটনা তার নিজের মুখেই শুনুন, 'ডা. কার্ল সিমনটন মেডিটেশন শেখাচ্ছিলেন। একটা বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট মেডিটেশনে আমাদের অন্তর্গুরুর সাক্ষাৎ দানের জন্যে মনের বিশেষ স্তরে নিয়ে যান। একজন যুক্তিবাদী ডাক্তার হিসেবে এই অনুশীলন সম্পর্কে আমার সংশয় ছিল পুরো মাত্রায়। তারপরও আমি চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছিলাম, নির্দেশ পালন করে যাচ্ছিলাম।

আমি বিশ্বাস করি নি যে এতে কোনো কাজ হবে, তবুও প্রত্যাশা ছিল, যদি এতে কাজ হয় তাহলে হয়তো মোজেস বা জেসাসকে দেখতে পাব। কারণ এরা ছাড়া আর কে একজন শল্য চিকিৎসকের মাথার ভেতরে আসার সাহস পাবে!

এদের পরিবর্তে আমি সাক্ষাৎ পেলাম শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘ চুল বিশিষ্ট তরুণ জর্জের। আমার সমগ্র অস্তিত্ব জাগরিত হলো। কারণ এমন কিছু যে ঘটতে পারে তা আমার প্রত্যাশার বাইরে ছিল। সিমনটন আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, আমাদের অবচেতন থেকে যারই আগমন ঘটুক না কেন, আমরা যেন তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখি। আমি অনুভব করলাম জর্জের সাথে কথা বলা, নিজের সাথে নিজের দাবা খেলারই মতো। শুধু আমি জানি না আমার অপর সত্তা পরবর্তী চাল কী দেবে।

'জর্জ ছিলেন অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত, আমার অনুভূতির ব্যাপারে সচেতন এবং চমৎকার উপদেষ্টা। তিনি সব প্রশ্নের সততাপূর্ণ জবাব দিতেন, যার অনেকগুলোকেই আমি প্রথম পছন্দ করি নি... আমি মনে করি, আপনি হয়তো জর্জকে বলবেন, 'আমার অচেতন থেকে ধ্যানের মাধ্যমে প্রকাশিত অন্তর্দৃষ্টি'।

যা-ই আপনি বলুন না কেন, আমি শুধু বলব প্রথম দর্শন লাভের পর থেকে তিনি আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ও সঙ্গী। আমার জীবন এখন অনেক সহজ, কারণ আমার কঠিন কাজগুলো তিনিই করে দেন।'

একজন বিখ্যাত শল্য চিকিৎসকের জীবনে যখন অন্তর্গুরু এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, তখন আপনার জীবনেও তার প্রয়োজনীয়তা অসীম।

তবে গুরুর সাথে সাক্ষাৎ ঘটানোর ধ্যানের প্রক্রিয়া লিখে পুরোপুরি ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, এটি একটি সরাসরি অভিজ্ঞতার ব্যাপার। এ ব্যাপারে কোনো যোগ্য প্রশিক্ষকের সরাসরি সহযোগিতা লাভই বিষয়টিকে আপনার জন্যে সহজ করে দেবে। তবুও আপনার আন্তরিক আকুতি থাকলে অন্তর্গুরু চলেও আসতে পারেন কমান্ড সেন্টারে। তাই চেষ্টা করতে কোনো দোষ নেই।

মেডিটেশন : অন্তর্গুরু

১. নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ির ড্রইংরুমে গিয়ে বসুন। প্রয়োজনীয় অটোসাজেশন, মনছবি ইত্যাদি দেখুন।

২. ১০ থেকে ০ গণনা করে কমান্ড সেন্টারে প্রবেশ করুন। কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার আগে ড্রইংরুম থেকে সুন্দর মুক্তোটি সাথে নিন।

৩. কমান্ড সেন্টারে আপনার চেয়ারের সামনে বিনয়ের সাথে দাঁড়ান। আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন রহম বলয়ে। অবলোকন করুন সেখানে উজ্জ্বল আলো। ... আস্তে আস্তে আলোর মাঝে ভেসে আসছে একটি মুখাবয়ব... আলো আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে... অবলোকন করুন আপনার গুরুর চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে... এখন আপনি গুরুকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। অবলোকন করুন গুরুও আপনাকে দেখে মৃদু হেসে আপনার দিকে তাকিয়েছেন। আপনি এখন গুরুকে সালাম করুন। মুর্শিদ, গাইড বা গুরুকে পাওয়ায় আপনি আপনার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। সাথে আনা মুক্তোটি গুরুর হাতে বিনয়ের সাথে অর্পণ করুন। অনুভব করুন তিনিও আপনাকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। (বিরতি...)

এখন থেকে নিজের ও মানবতার জন্যে কল্যাণকর প্রতিটি কাজে আপনি গুরুর সহযোগিতা পাবেন। এরপর যখনই আপনি কমান্ড সেন্টারে আসবেন, তখনই গুরুকে তার আসনে উপবিষ্ট দেখতে পাবেন। ভবিষ্যতে সবসময় আপনি কমান্ড সেন্টারে এসে প্রথমে গুরুকে সালাম করবেন, তার সাথে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর আপনার কমান্ড চেয়ারে বসবেন। গুরু আপনার জন্যে কল্যাণকর প্রতিটি কাজে আপনাকে সহযোগিতা করবেন। আপনি আপনার মনোদৈহিক যে-কোনো প্রতিরক্ষা ও কল্যাণেও গুরুর সাহায্য নিতে পারেন।

আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার ওপর কোনো অশুভ প্রভাব রয়েছে, তাহলে গুরুর সহযোগিতায় আপনি আপনার সাইকিক ইমিউনিটি অর্থাৎ মনপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একবার গড়ে তুললে আপনার ওপর ভবিষ্যতে কখনোই কোনো অশুভ প্রভাব পড়বে না। অতীতের যে-কোনো অশুভ প্রভাব ক্রমান্বয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং এ কারণে আপনার কোনো রোগ হয়ে থাকলে দ্রুত তা নিরাময় হবে।

এখন আপনি আপনার সাইকিক ইমিউনিটি নির্মাণ করছেন। নির্মিত হওয়ার পর এই ইমিউনিটি আপনার আজীবন বহাল থাকবে।

আপনি এখন গুরুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গুরু আপনার এই প্রয়োজনের কথা অনুধাবন করছেন এবং এজন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নিচ্ছেন। এবার অনুভব ও অবলোকন করুন তিনি আপনার মাথার তালুতে হাত রেখেছেন। হাত রাখার সাথে সাথে একটা অতি সূক্ষ্ম আলোর বলয় আপনার চারদিকে ঘোরা শুরু করেছে।

মনে মনে ভাবুন এই দুর্ভেদ্য শক্তিবলয় অদৃশ্য রশ্মির মতো আপনার চারদিক ঘিরে ফেলেছে। অনুভব করুন একটা শক্তিতরঙ্গ ঘিরে আছে আপনাকে।

এই শক্তিতরঙ্গ এমন একটি বর্ম রচনা করেছে আপনাকে ঘিরে, যা ভেদ করে কোনো অশুভ প্রভাব আপনার মন বা শরীর পর্যন্ত আসতে পারবে না। এবার অনুভব করুন আপনার সাইকিক ইমিউনিটি পুরোপুরি গড়ে উঠেছে। (বিরতি...)

এই সাইকিক ইমিউনিটিকে বা মন প্রতিরক্ষা বর্মকে চিরস্থায়ী করার জন্যে মনে মনে ৩ বার কোয়ান্টা স্পন্দন সঞ্চার করুন.....
আপনার সাইকিক ইমিউনিটি এখন পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে। গুরুর মমতা ও সহযোগিতার ফলে আপনি এখন থেকে আজীবন সব ধরনের অশুভ প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকবেন। অনুভব করুন আপনি সব অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত।...
গুরুর এই মমতা ও সহানুভূতির জন্যে আপনি তার কাছে বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।...
এবার আপনি ফিরে আসবেন মনের বাড়ির ড্রইংরুমে। আপনি গুরুকে সালাম করুন। তার কাছ থেকে বিদায় নিন।...

৪. এবার ০ থেকে ১০ গণনা করে ড্রইংরুমে ফেরত আসুন।

৫. ০ থেকে ৭ গণনা করে পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় চলে আসুন।

অধ্যায়-২৭

প্রজ্ঞা

প্রজ্ঞা বা হিকমা হচ্ছে একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। জ্ঞানের সাথে অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি যুক্ত হলেই একজন মানুষ প্রজ্ঞাবান হন। তিনি তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় সাফল্য তার কাছে এসে ধরা দেয়। তিনি তখন শুধু নগদ লাভের চিন্তা করেন না।

তিনি সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে চিন্তা করেন এই সিদ্ধান্তের ফলাফল দূর ভবিষ্যতে কী হবে। তিনি কাজ করার পর ভাবেন না। কাজ করার আগেই সকল ভাবনার পাট সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন।

প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞাহীনতা একটি গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে। গল্পটি একটি প্রতিযোগিতার। দুইজন প্রতিযোগী। দুটি জিনিস রাখা আছে। এর যে-কোনো একটি নিতে হবে। একদিকে ১০ কেজি ওজনের রুই মাছ। অন্যদিকে মাছ ধরার যন্ত্রপাতি। একজন প্রতিযোগী শুধুমাত্র একটা জিনিস নিতে পারবে।

কোনো প্রতিযোগিতা হলো না। আহাম্মক ঝাঁপিয়ে পড়ল রুই মাছের ওপর। আর বুদ্ধিমান ঝাঁপিয়ে পড়ল মাছ ধরার যন্ত্রপাতির ওপর। কারণ স্পষ্ট। আহাম্মক বুঝল রুই মাছ এখুনি নিয়ে গিয়ে কেটে দোপেঁয়াজা করে খাওয়া যাবে। আর বুদ্ধিমান জানে রুই মাছ খেয়ে ফেললেই সব শেষ। তার চেয়ে মাছ ধরার যন্ত্রপাতি নিলে ভবিষ্যতে প্রতিদিন এই রকম ২/৩ টা রুই মাছও পাওয়া যেতে পারে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে প্রজ্ঞা-স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগবে, প্রজ্ঞার নিবাস কোথায়? কীভাবে প্রজ্ঞাবান হওয়া যায়? আমরা এককথায় বলতে পারি- প্রজ্ঞার নিবাস আপনারই অচেতন মনের গভীরে। আর অন্তর্গুরু হচ্ছে প্রজ্ঞাবান হওয়ার মাধ্যম। অন্তর্গুরুর মাধ্যমেই গুরুর অন্তর থেকে আপনার অন্তরে সঞ্চারিত হয় প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার মেডিটেশনে আপনি প্রথমবারের মতো প্রবেশ করবেন মনের অচেতন বলয়ে। প্রজ্ঞার সাথে সাথে আপনার মধ্যে সঞ্চারিত হবে প্রশান্তি, সৃজনশীলতা, সাহস, সহনশীলতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি। আর এরপর আপনি মনের অচেতন ও অবচেতন বলয়কে সচেতনভাবে পুরোপুরি কাজে লাগানোর ক্ষমতা অর্জন করবেন।

মেডিটেশন : প্রজ্ঞা

১. নিয়মমাফিক আরাম প্রক্রিয়ায় আলফা স্টেশনে যান। আলফা স্টেশনে ঝর্নার পানিতে আপনি তৃপ্তির সাথে গোসল করে নিন। অনুভব করুন চমৎকার স্বচ্ছ পানির ধারা গড়িয়ে পড়ছে আপনার মাথায় ও শরীরে। আর আপনার দেহ-মন থেকে সকল রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, ঈর্ষা, পাপবোধ ধুয়ে মুছে নিয়ে যাচ্ছে.... আপনি এখন সবাইকে ক্ষমা করে দিন... নিজেকেও ক্ষমা করুন। (বিরতি...)
এবার আপনার সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরে নিন। আপনার প্রিয় সুগন্ধি মেখে নিন। অনুভব করুন, আপনার প্রিয় সুগন্ধি একটা চমৎকার আমেজ সৃষ্টি করেছে আপনার মনে। অনুভব করুন আপনার হৃদয় প্রেম ও ক্ষমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অনুভব করুন ক্ষমা করা ও ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে আপনি নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছেন। (বিরতি...)

২. এরপর ১৯ থেকে ০ গণনা করে মনের বাড়িতে যান। ড্রইং রুমে আরাম করে বসুন।

৩. এবার ১০ থেকে শূন্য গণনা করে কমান্ড সেন্টারে যান। গুরুর সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

৪. গুরু এরপর আপনাকে নিয়ে যাবেন আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফরে। স্থানকালের সীমানা পুরোপুরি অতিক্রম করে গুরু আপনাকে নিয়ে যাবেন মনের গভীর অচেতন অংশে-মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় জ্ঞানভাণ্ডারে। আপনার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান দান করার সাথে সাথে গুরু গভীর মমতায় আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করবেন প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি ও প্রশান্তিসহ প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলি। ফলে আপনি মনের অবচেতন ও অচেতন বলয়কে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবেন। আপনার গুণাবলিকে সুন্দরভাবে বিকশিত করতে পারবেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি পরিণত হবেন এক সফল সার্থক মানুষে।

গুরুর সাথে এবার টাইম মেশিনে উঠুন। গুরু তার পাশে বসিয়ে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছেন অতীতে। ১-২-৩ এভাবে বছর পার হতে হতে আপনি চলে যাবেন ৪০০ বছর পেছনে। টাইম মেশিন এখন সোনারগাঁয়ের ওপর। গুরু এক এক করে বর্ণনা করছেন প্রিয় মাতৃভূমির ইতিহাসের অংশবিশেষ...
বাংলার বীর ঈসা খাঁ থেকে শুরু করে বর্ণনা করবেন আমাদের জাতিসত্তার বিবর্তন, বিপর্যয় ও উত্থানের ইতিহাস। (বিরতি ৫ মিনিট)

৫. এবার অবলোকন করুন টাইম মেশিন বর্তমানে চলে এসেছে। টাইম মেশিন এখন উঠছে ওপরের দিকে। দেখুন আস্তে আস্তে নিচের সবকিছু ছোট হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে মনে হচ্ছে পিঁপড়ের মতো। ঘরবাড়ি সব ছোট ছোট বাক্সের মতো মনে হচ্ছে। যত ওপরের দিকে উঠছেন ততই ছোট হয়ে যাচ্ছে সব। নদ-নদী সব চুলের

ফিতার মতো ছোট হয়ে যাচ্ছে। ওপর থেকে আপনার প্রিয় পৃথিবীকে পরিপূর্ণভাবে দেখছেন আপনি। দেখতে দেখতে আপনি পৌঁছে যাচ্ছেন মেঘের রাজ্যে, বাংলাদেশের মহাশূন্য স্টেশনে। টাইম মেশিন থেকে আপনি স্টেশনে নেমে আপনার জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত আলোর চেয়েও বহুগুণ বেশি গতিসম্পন্ন মহাশূন্যযানে গুরুসহ আরোহণ করুন। (বিরতি...)

আলোর চেয়েও বহুগুণ বেশি গতিসম্পন্ন মহাশূন্যযানে গুরুর পাশে আরাম করে বসেছেন আপনি। আপনি আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ শুরু করতে যাচ্ছেন। ১০ থেকে ০ কাউন্ট ডাউন করার সাথে সাথে মহাশূন্যযান যাত্রা শুরু করবে। আপনি গুরুর সাথে এক এক করে গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথ পার হয়ে পৌঁছে যাবেন মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় জ্ঞানভাণ্ডারে। সেখান থেকে প্রজ্ঞা ও অতিচেতনা লাভ করে আবার ফিরে আসবেন। কাউন্ট ডাউন শুরু হচ্ছে ১০-৯-৮-৭-৬-৫-৪-৩-২-১-০। মহাশূন্যযান যাত্রা শুরু করেছে। (বিরতি...)

পৃথিবী থেকে সোজা উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যযান। আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। আপনি অতিক্রম করছেন শূন্য মাধ্যাকর্ষণ বলয়। আপনি এখন যাচ্ছেন মঙ্গল গ্রহের পথে... মঙ্গল পার হয়ে সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির দিকে এগুচ্ছেন আপনি... বৃহস্পতি পার হয়ে আপনি এগুচ্ছেন শীতলতম গ্রহ নেপচুনের দিকে... অনুভব করুন কেমন যেন একটু শীত শীত লাগছে...

এবার নেপচুন পার হয়ে মহাশূন্যযান এখন সর্বোচ্চ গতিতে এগুচ্ছে অনন্ত শূন্যের দিকে। এক এক করে সব নক্ষত্র পার হয়ে মহাশূন্যযান এগিয়ে চলেছে। মহাবিশ্বের কেন্দ্রের দিকে আলোর চেয়েও বহুগুণ গতিতে...

মহাবিশ্বের কেন্দ্রের কাছাকাছি চলে এসেছেন... দূরে দেখা যাচ্ছে আলোর বিশাল টানেল বা সুড়ঙ্গপথ। টানেলে পৌঁছেই যানের গতি কমতে শুরু করেছে ... যান এসে থেমেছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত আলোর মহলে মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় জ্ঞানভাণ্ডারে। (বিরতি...)

এবার মহাশূন্যযান থেকে গুরুর পেছনে পেছনে নামুন... গুরু আপনার কাঁধে হাত রেখে আপনাকে এখন নিয়ে যাচ্ছেন মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় জ্ঞানভাণ্ডারে...

গুরুর সাথে আপনি প্রবেশ করছেন জ্ঞানভাণ্ডারের সুবিশাল হলরুমে... অবাক বিস্ময়ে আপনি দেখছেন হলরুমের আলমিরাগুলো সব কোটি কোটি বইয়ে ঠাসা... কোটি কোটি অডিও ভিডিও ক্যাসেট ও কম্পিউটার ডিস্কে ঠাসা সব আলমিরা। মহাবিশ্বের সকল জ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে এসব বই-কিতাব ক্যাসেট ও ডিস্কে... আপনার প্রিয় গুরু এক এক করে বিভিন্ন বিষয়ের বই ক্যাসেট ও ডিস্কের বিবরণ দিচ্ছেন... আপনি বেশ মনোযোগ ও সময় নিয়ে শুনছেন... (বিরতি...)

আপনি গুরুর সাথে মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় জ্ঞানভাণ্ডারে-ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের কেন্দ্রে আসায় গুরু খুব

খুশি হয়েছেন। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনায় তিনি আরো বেশি আনন্দিত হয়েছেন। আনন্দিতচিত্তে গুরু গভীর মমতায় স্নেহময় পিতার মতো আপনাকে এবার বুকে জড়িয়ে ধরেছেন... অনুভব করুন হৃদয়ে স্পন্দন, কম্পন, শিহরণ...

তিনি বুকে জড়িয়ে ধরার সাথে সাথে অনুভব করুন আপনার মধ্যে প্রজ্ঞা ও অতিচেতনা সঞ্চারিত হয়েছে...

প্রশান্তি, জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি সঞ্চারিত হয়েছে... অনুভব করুন সৃজনশীলতা, সাহস ও উদ্যম সঞ্চারিত হয়েছে আপনার মাঝে...
অনুভব করুন অনন্য মানবে উত্তরণের জন্যে আপনার যা যা গুণ প্রয়োজন আপনার প্রিয় গুরু তার সবই জানেন। তিনি প্রয়োজনীয় সব গুণাবলী আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করছেন...

অনুভব করুন আপনার গুরুর হৃদয়ের সাথে আপনার হৃদয় মিশে গেছে... অনুভব করুন তার হৃদয় থেকে আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি ও আনন্দ সঞ্চারিত হচ্ছে... আপনার সকল দুঃখ, কষ্ট ধুয়ে মুছে দূর হয়ে যাচ্ছে ... অনুভব করুন আপনার হৃদয় এক স্বর্গীয় প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে....

এবার ধীরে ধীরে গভীরভাবে দম নিন ... ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন... দম নিতে নিতে ভাবুন... হৃদয় আনন্দ ও প্রশান্তিতে ভরে যাচ্ছে। দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন... মনের সকল দুঃখ কষ্ট বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। (৫ বার)

এবার দম স্বাভাবিক হতে দিন।

অনুভব করুন প্রিয় গুরুর দোয়া ও আনুকূল্যের ফলে আপনি এখন পুরোপুরি হতাশামুক্ত, সৃজনশীল, প্রো-অ্যাকটিভ মানুষে পরিণত হয়েছেন। প্রজ্ঞা ও অতিচেতনার অধিকারী হওয়ায় এখন থেকে যে-কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত আপনার মনের অবচেতন থেকে দ্রুত সচেতন বলয়ে চলে আসবে। দৈনন্দিন জীবনে অতিচেতনা ও ইনটুইশনের প্রয়োগ হবে সহজ। আপনি মনের অবচেতন ও অচেতন বলয়কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। ... প্রজ্ঞা ও অতিচেতনা আপনাকে নিয়ে যাবে অসীম কল্যাণ ও সাফল্যের পথে...

আপনার প্রিয় গুরুর বাহুবন্ধন থেকে আপনি মুক্ত হলেও তিনি এখনো আপনার কাঁধে হাত রেখে আপনাকে আদর করছেন। (বিরতি)
এবার গুরুর সাথে হাঁটতে হাঁটতে মহাশূন্যযানের কাছে ফিরে আসুন.... মহাশূন্যযানে গুরুর পাশে আরাম করে বসুন...

আলোর মহল থেকে আলোর টানেল দিয়ে ০ থেকে ১০ গণনার পর মহাশূন্যযান এবার ফেরত যাত্রা শুরু করবে। ০-১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯-১০।

মহাশূন্যযান এখন ফেরত যাত্রা শুরু করেছে। আলোর টানেল বেয়ে যান এগুচ্ছে। ক্রমশ তাতে গতির সঞ্চার হচ্ছে। আলোর গতিতে যান বেরিয়ে আসছে আলোর টানেল থেকে। এবার যান আরো গতি লাভ করেছে... আলোর চেয়েও বহগুণ গতিতে বেরিয়ে আসছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে ... দ্রুতগতিতে যান ফেরত আসছে সৌরমণ্ডলের দিকে... (বিরতি)

যান প্রবেশ করেছে সৌরমণ্ডলের সীমানায়। নেপচুন পার হয়ে যান এগুচ্ছে বৃহস্পতির দিকে... চাঁদকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পুরোপুরি বেশ বড় আকারে ... এবার চাঁদকে বামে রেখে পৃথিবীতে ফেরত আসছেন... পৃথিবী আস্তে আস্তে বড় লাগছে আপনার কাছে... পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছেন আপনি... স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এশিয়া মহাদেশ... উপমহাদেশ ... বাংলাদেশ... আপনার মহাশূন্যযান এসে থেমেছে মেঘের রাজ্যে, বাংলাদেশের মহাশূন্য স্টেশনে। (বিরতি)

এবার মহাশূন্যযান থেকে প্রশান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে নেমে আসুন... গুরুর সাথে উঠে বসুন উড়ন্ত টাইম মেশিনে। টাইম মেশিনে উড়ে এসে নামুন মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে। (বিরতি...)

প্রজ্ঞা অতিচেতনা ও প্রশান্তিতে আপনার চেতনাকে সিক্ত করায় গুরুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করুন... গুরুকে বার বার ধন্যবাদ জানান। তার কাছ থেকে বিদায় নিন।

বিদায় নেয়ার সময় যদি আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন, যদি আপনার কান্না পায়, যদি চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে তবে নিঃসঙ্কোচে আপনার আবেগ প্রকাশ পেতে দিন... (বিরতি...)

গুরুর কাছ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় ও দোয়া নিয়েছেন আপনি।

০-১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯-১০। আপনি এখন প্রবেশ করেছেন মনের বাড়ির ড্রইংরুমে। আরাম করে বসুন।

অনুভব করুন কত ভাগ্যবান আপনি। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করে মনের বাড়িতে ফিরে এসেছেন আপনি। আপনি অর্জন করেছেন প্রজ্ঞা ও অতিচেতনা। অর্জন করেছেন সৃজনশীলতা, ধৈর্য, সাহস, উদ্যম, সময়ানুবর্তিতা ও কর্মস্পৃহা। যে-কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত এখন দ্রুত আপনার মনের অবচেতন থেকে সচেতন বলয়ে চলে আসবে। নিজের ও মানবতার কল্যাণে এখন আপনি মনের অবচেতন ও অচেতন বলয়কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। তাই মনে মনে প্রত্যয়ন করুন- আমি এখন থেকে সবসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেব। যে প্রশান্তিতে হৃদয় ভরে আছে তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবো।

আপনার এই প্রত্যয়ন ও অনুভবকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্যে মনে মনে তিনবার কোয়ান্টা স্পন্দন সঞ্চার করুন ও বাস্তবে হাত তুলে কোয়ান্টা সংকেত প্রেরণ করুন।

৬. এবার ০ থেকে ৭ গণনা করে স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

প্রজ্ঞা লাভের মাধ্যমে নিজেকে অনন্য মানুষে উত্তরণের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন আপনি। জৈবিক জীবনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অনন্য মানুষে পরিণত হওয়ার, ভ্রান্ত বিশ্বাসের শৃঙ্খল মুক্ত হওয়ার সোনালি তোরণ এখন আপনার সামনে। এগিয়ে যান নিশঙ্কচিত্তে।

হে অনন্য মানুষ! আপনাকে অভিনন্দন

উষ্ণ হৃদয় আর ঠান্ডা মস্তিষ্ক-এই দুইয়ের সম্মিলনেই মানুষ পরিণত হয় অনন্য মানুষে, ইনসানে কামেলে। হৃদয়ের উষ্ণতার পাশাপাশি আপনি মস্তিষ্ককে একেবারে ঠান্ডা রাখতে শিখেছেন। অনন্য মানুষে উত্তরণের স্বর্ণ তোরণ এখন আপনার সামনে। তোরণের সিঁড়িতে পা রেখেছেন আপনি। এখন শুধু পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া। যত এগিয়ে যাবেন, ততই আপনার অন্তর আলোকিত হবে। পরিষ্কার হয়ে আসবে সামনের পথ। নব নব অনুভবে উদ্ভাসিত হবেন আপনি। নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন, সবকিছুকে জয় করার শক্তি আপনার মধ্যেই রয়েছে। প্রশান্তি হবে আপনার জীবনের অঙ্গ। সাফল্য, প্রাচুর্য আর খ্যাতি আসবে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়।

হে অনন্য মানুষ! আপনি জানেন অনন্য মানুষ ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য। একজন অনন্য মানুষ সাধারণের মতো শুধু নিজের কথাই ভাবে না, ভাবে চারপাশের সবার কথা। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সে সম্মান করে অন্যের অধিকারকেও। নিজের সঙ্গী-সন্তানকে ভালবাসার পাশাপাশি সে ভালবাসে সবাইকে। তার ভালবাসা শুধু জৈবিক নয়, তার ভালবাসা আত্মিকও। বিশ্বজনীন মমতা রয়েছে তার মাঝে।

তাই জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার প্রতিই বাড়িয়ে দেয় মমতার হাত। হিংসা, হিংস্রতা তার স্বভাববিরুদ্ধ। সে সবসময় বিশ্বাস করে অহিংসা ও ক্ষমায়। আবেগ ও প্রবৃত্তি সবসময় তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। সে অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সে নিয়ন্ত্রিত হয় সত্য দ্বারা, বিবেক দ্বারা। সাধারণের মতো সে মৃত্যুকে ভয় পায় না। মৃত্যুকে জীবনের পরিসমাপ্তি মনে করে না বরং জৈবিক মৃত্যুকে নতুন জীবনের সূচনা মনে করে। তাই সে অকুতোভয়।

সে জানে সে কসমিক ট্রাভেলার, মহাজাগতিক মুসাফির। এই জৈবিক ভ্রমণ শেষ করে সে শুরু করবে আরেক ভ্রমণ। তাই সে হাসতে হাসতে মরতে পারে। তাই তাকে শৃঙ্খলিত করা যায় না, তাকে দাস বানানো যায় না। অপমানিত শৃঙ্খলিত জীবনের চেয়ে মুক্তির অন্বেষায় আত্মদানকে সে অনেক শ্রেয় মনে করে।

সে কখনো অন্যের কাছে করুণা ভিক্ষা করে না, আশ্রয় চায় না, বরং সে নিজেই হাজার মানুষের আত্মিক আশ্রয়ে পরিণত হয়। সে শুধু নিজের দুঃখকে জয় করে না, লাখো মানুষকে দুঃখ দুর্দশা জয়ের পথ দেখায়। সে

শুধু নিজে প্রাচুর্যের অধিকারী হয় না, অগণিত মানুষ তার সংস্পর্শে এসে প্রাচুর্যের সন্ধান পায়। সে কখনো শোষক হয় না, সে হয় নিপীড়িত ও শোষিতের বন্ধু, তাদের মুক্তির পথ প্রদর্শক।

সে ব্যতিক্রম ও অনন্যতাকে নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধা করে আর সেইসাথে জানে বিস্ময় সৃষ্টি করার শক্তি তার মাঝেই সুপ্ত রয়েছে। তাই সে সাধারণের মতো ব্যতিক্রম ও অনন্যতার দিকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে না, সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে নিজেই হয়ে ওঠে অনন্য।

অনন্য মানুষ হওয়ার অভিযাত্রায় অংশগ্রহণ করায় এখন নিঃসংশয়ে বলা যায়, প্রবৃত্তির শৃঙ্খল ছাড়া, দুঃখ ও বঞ্চনা ছাড়া আপনার আর হারানোর কিছু নেই। কিন্তু পাওয়ার জন্যে রয়েছে এক সুশোভিত নতুন বিশ্ব। তাই গভীর প্রত্যয়ে সবসময় মনে মনে বলুন, আমি এক অনন্য মানুষ! আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম। সারা পৃথিবী আমার। যেখানে দরকার সেখানে যাব। যা প্রয়োজন তা-ই নেব। যা চাই তা-ই পাব। আর মানুষের দুঃখকে আনন্দে, রোগকে সুস্থতায়, হতাশাকে প্রশান্তিতে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করব।

হে অনন্য মানুষ! নিজের অনন্যতায় বিশ্বাস করুন। বিশ্বাস করুন, জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যে, নিজের মেধাকে শতধারায় বিকশিত করার জন্যে, মহান কিছু করার জন্যে, অনন্য মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার জন্যেই আপনি পৃথিবীতে এসেছেন।

আর এ বিশ্বাস কঠিন কিছু বা অবাস্তব কিছু নয়। আপনি নিজের অস্তিত্বের একটু গভীরে গেলেই বুঝতে পারবেন, কত বড় সংগ্রামে জয়ী হয়ে আপনি পৃথিবীতে এসেছেন। অবলোকন করুন এমন একটি প্রতিযোগিতা যাতে ৪০ থেকে ৫০ কোটি প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে। লক্ষ্য একটি বৃত্তের মাঝে পৌঁছা।

সেখানে শুধু একজনের বেঁচে থাকার আশ্রয় রয়েছে। সেখানে যে পৌঁছতে পারবে, সে-ই বেঁচে থাকবে। আর বাকি সবাই মারা যাবে। প্রতিনিয়ত রাসায়নিক অস্ত্র বর্ষিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ প্রতিযোগী মুহূর্তে মারা যাচ্ছে।

কিন্তু একজন প্রতিযোগী সকল বিপদ অগ্রাহ্য করে সেই বৃত্তে প্রবেশ করল। আর সময়ের বিবর্তনে মানুষরূপে আবির্ভূত হলো এই পৃথিবীতে। মাতৃগর্ভে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে পিতার দেহ থেকে যে ৪০ থেকে ৫০ কোটি শুক্রাণু যাত্রা শুরু করেছিল, আপনি হচ্ছেন সেই শুক্রাণুর বিকশিত রূপ, যে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হতে পেরেছিল। ৪০/৫০ কোটির সাথে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন বলেই আপনি পৃথিবীতে আসতে পেরেছিলেন।

তাই কঠোর বাস্তবতার আলোকেই বলা যায়, আপনি এক বিজয়ী বীর। জীবনের প্রথম সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন- জীবনের প্রতিটি সংগ্রামে জয়ী হবেন, যদি আপনার প্রতিটি প্রত্যাশাকে, প্রতিটি অনুভবকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করেন। মহামানবরা, স্মরণীয়-বরণীয়রা বিশ্বাস নামক প্রোগ্রামিং দিয়েই মস্তিষ্করূপী মহা-জৈব-কম্পিউটারকে

ব্যবহার করেছেন।

বিশ্বাস একবার গেঁথে গেলে জৈব কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাফল্যের লক্ষ্যে আপনার সমগ্র অস্তিত্বকে কাজে নিয়োজিত করবে। সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় অনিবার্য জয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে আপনার সমগ্র কর্মকাণ্ড। কখনো প্রত্যাশিত পন্থায় আবার কখনো একেবারে অপ্রত্যাশিত পন্থায় বিজয় আপনার পদচুম্বন করবে। ইতিহাসের পাতায় লেখা হবে আপনার নাম এক কালজয়ী অনন্য মানুষ হিসেবে।

প্রিয় পাঠক,

এ বইয়ের কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

মহাজাতক

যোগ ফাউন্ডেশন

জিপিও বক্স নম্বর-১৫, ঢাকা-১০০০

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।

ফোন : +৮৮০-২-৯৩৪১৪৪১, +৮৮০-২-৮৩১৯৩৭৭, ++৮৮০-১৭১১৬৭১৮৫৮, +৮৮০-১৭১৪৯৭৪৩৩৩

e-mail : info@quantummethod.org.bd

website : www.quantummethod.org.bd

মহাজাতক

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন চর্চার পথিকৃৎ। জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্যে জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক ও সফল প্রশিক্ষক। ১৯৯৩ সাল থেকে বিরতিহীনভাবে দেশের সর্বত্র এখন পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০১৭) অনুষ্ঠিত এ কোর্সের ৪৩৭টি ব্যাচে তিনি একাই প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। বিশ্বের মেডিটেশন চর্চার ইতিহাসে যা এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

দুই যুগ ধরে বাংলাভাষায় সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ কোয়ান্টাম মেথড ছাড়াও তার রচিত আত্মনির্মাণ, চেতনা অতিচেতনা নিরাময় ও প্রশান্তি, জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন ও এর ইংরেজি সংস্করণ '1001 Autosuggestions to change your life', আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা এবং সর্বশেষ আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পাঠকের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

কোয়ান্টাম

কোয়ান্টাম এক গতিময় প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া জীবনকে স্বপ্নের রঙে রাঙানোর, শূন্য থেকে শুরু করার, সংকটকে সম্ভাবনায় রূপান্তরের, সাফল্যের সোনালি স্তরে উত্তরণের, সেবা আর মানবিকতায় চারপাশ আলোকিত করার। লাখো মানুষের মতো তাই আপনিও একাত্ম হোন জীবনের চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরের এই চিরায়ত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়। আপনিও বলুন, যা চাই তা-ই পাব। আমি পারি আমি করব।

www.quantummethod.org.bd